কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

স্টিফেন ডব্লু. হকিং

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১৯৮২ সালে হার্ভার্ডে লোয়েব (Loeb) বক্তৃতামালা দানের পর থেকেই আমি সিদ্ধান্ত করেছিলাম স্থান এবং কাল বিষয়ে সাধারণের জন্য একটি বই লেখার চেষ্টা করব। মহাবিশ্বের প্রথম অবস্থা এবং কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কে ইতিপূর্বে অনেকগুলি বই লেখা হয়েছিল। স্টিফেন উইনবার্গের অত্যন্ত ভাল বই **'প্রথম তিন মিনিট' (The First Three Minutes)** থেকে শুরু করে অত্যন্ত খারাপ বই পর্যন্ত (তবে অত্যন্ত খারাপ বইয়ের নামটা আমি করব না)। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে সমস্ত প্রশ্ন আমার সৃষ্টিতত্ত্ব (cosmology) এবং কোয়ান্টাম তত্ত্ব (কণাবাদী তত্ত্ব) নিয়ে গবেষণার পথিকৃৎ, কোনো বইয়েই সে প্রশ্নগুলি নিয়ে সঠিক আলোচনা হয়নি। প্রশ্নগুলি হল : মহাবিশ্ব কোত্থেকে এসেছে? কি ভাবে এর শুরু? কেনই বা এর শুরু হল? মহাবিশ্ব কি শেষ হয়ে যাবে? যদি হয় তবে কি ভাবে হবে? এ প্রশ্নগুলি সম্পর্কে আমাদের সবারই ঔৎসুক্য রয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এমন জটিল (technical) হয়ে উঠেছে যে শুধুমাত্র তার বিবরণের জন্য ব্যবহৃত গণিত আয়ত্ত করতে পেরেছেন খুব স্বল্পসংখ্যক বিশেষজ্ঞ। তবুও মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও নিয়তি (fate) সম্পর্কিত মূলগত ধারণাগুলি গণিত ছাড়াই বলা যায়। এবং এমনভাবে বলা যায় যে যাঁদের বিশেষ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা নেই, তাঁরাও সেটা বুঝতে পারবেন। এ বইয়ে আমি সেই চেষ্টাই করেছি। সফল হয়েছি কি না সে বিচার করবেন পাঠক।

আমাকে একজন বলেছিলেন : এক একটি সমীকরণ ব্যবহার করার অর্থ হবে পাঠকের সংখ্যা অর্ধেক করে কমে যাওয়া। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত করেছিলাম, কোনো সমীকরণই (equation) ব্যবহার করব না। শেষ পর্যন্ত আমি একটি সমীকরণ ব্যবহার করেছি—আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E = mc^2$। আমার আশা, এর ফলে আমার ভাবী পাঠকদের অর্ধেক ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবেন না।

এ. এল. এস (ALS) অথবা মোটর নিউরন (Motor Neuron) ব্যাধির মতো একটি দুর্ভাগ্য ছাড়া অন্য প্রায় সব ব্যাপারেই আমি ভাগ্যবান। আমার স্ত্রী জেন এবং আমার ছেলেমেয়ে রবার্ট, লুসি আর টিমির কাছে আমি যে সাহায্য পেয়েছি, তার ফলে আমার পক্ষে মোটামুটি স্বাভাবিক জীবন যাপন করা সম্ভব হয়েছে এবং সম্ভব হয়েছে কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করা।

তাছাড়া আছে আর একটি সৌভাগ্য— আমি বেছে নিয়েছিলাম তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা। তার সবটাই মনের ভিতরে কাজ। সুতরাং আমার অসুস্থতা একটা কঠিন প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি। আমার বৈজ্ঞানিক সহকর্মীদের প্রত্যেকেই যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন।

আমার কর্মজীবনের প্রথম ক্লাসিক্যাল পর্যায়ে আমার প্রধান সহচর এবং সহকর্মী ছিলেন রজার পেনরোজ (Roger Penrose), রবার্ট গেরক (Robert Geroch), ব্রাণ্ডন কার্টার (Brandon Carter) এবং জর্জ এলিস্ (George Ellis)। এঁরা আমাকে যা সাহায্য করেছেন এবং আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে যে কাজ করেছি, তার জন্য আমি এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

এই অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার রয়েছে **'বৃহৎ মানে স্থান-কালের গঠন' (The Large Scale Structure of Spacetime)** পুস্তকে। সে পুস্তকটি আমি আর এলিস্ লিখেছিলাম ১৯৭৩ সালে। আমার পাঠকদের প্রতি আমার উপদেশ আরো সংবাদ সংগ্রহের আশায় ও বইটা না পড়া। বইটা অত্যন্ত জটিল, বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলে পূর্ণ এবং বেশ অপাঠ্য। আমার আশা— কি করে সহজে বোধগম্য হওয়ার মতো লিখতে হয়, ঐ বইটা লেখার পর এত দিনে আমি সেটা শিখেছি।

১৯৭৪ সাল থেকে আমার কর্মজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ "কোয়ান্টাম (কণাবাদী)" পর্যায়ে আমার প্রধান সহযোগী ছিলেন গ্যারী গিবন্স্ (Gary Gibbons), ডন্ পেজ্ (Don Page) এবং জিম্ হার্টল (Jim Hartle)। তাঁদের কাছে এবং আমার গবেষণাকারী ছাত্রদের কাছে আমার অনেক ঋণ। তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয় অর্থেই তাঁরা আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছেন। ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করা আমাকে বিরাট ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমার আশা, আমি সে জন্যই কোনো কানা গলিতে ঢুকে পড়িনি।

এই বইটির ব্যাপারে আমার ছাত্র ব্রায়ান হুইটের (Brian Whitt) কাছ থেকে আমি প্রচুর সাহায্য পেয়েছি। বইটির প্রথম খসড়া করার পর ১৯৮৫ সালে আমার নিউমোনিয়া হয়। আমার ট্রাকিওষ্টমি (Tracheostomy– শ্বাসনালীর একটি অপারেশন) করতে হয়। ফলে আমার কথা বলার ক্ষমতা লোপ পায় এবং অন্যের সঙ্গে বাক্যালাপও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমি ভেবেছিলাম বইটি আমি শেষ করতে পারব না। কিন্তু ব্রায়ান শুধুমাত্র পুনর্বিচারের জন্য আবার পাঠ করতেই সাহায্য করেনি, উপরন্তু সে আমাকে লিভিং সেন্টার (Living Center) নামক যোগাযোগ পদ্ধতি (communication programme) ব্যবহার করায়। এটা আবার আমাকে দান করেছিল ক্যালিফোর্নিয়ার সানিভেলের ওয়ার্ডস প্লাস ইনকরপোরেটেড-এর (Words Plus Inc) ওয়াল্ট ওলটোজ (Walt Woitosz)। এর সাহায্যে আমি বই এবং গবেষণাপত্র লিখতে পারি। তাছাড়া স্পীচ্ প্লাস্ (Speech Plus) আমাকে যে স্পীচ্ সিনথেসাইজার (Speech Synthesizer) দান করেছেন তার সাহায্যে আমি লোকজনের সঙ্গে কথাও বলতে পারি। এঁরাও ক্যালিফোর্নিয়ার সানিভেলের। ডেভিড মেসন (David Mason) আমার হুইল চেয়ারে একটা সিনথেসাইজার এবং ছোট একটা ব্যক্তিগত কম্প্যুটার লাগিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে বিরাট একটা পার্থক্য হয়েছে : আসলে আমার কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগে যা পারতাম এখন তার চাইতে ভাল বাক্যালাপ করতে পারি।

যাঁরা প্রথম খসড়াটি দেখেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই বইটির উন্নতির জন্য উপদেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে উপদেশ দিয়েছেন ব্যান্টাম বুকস্ (Bantam Books)। আমার এ বইটির সম্পাদক পিটার গাজ্জার্ডি (Peter Guzzardi)। যে সব বিষয়ে ভাল করে ব্যাখ্যা করা হয়নি বলে তিনি ভেবেছিলেন: সেগুলি সম্পর্কে তিনি পাতার পর পাতা মন্তব্য আর প্রশ্ন পাঠিয়েছেন। যে সব জিনিষ পাল্টাতে হবে, তাঁর ঐ বিরাট তালিকা পেয়ে আমি রীতিমতো বিরক্ত হয়েছিলাম সন্দেহ নেই কিন্তু তিনি ঠিকই করেছিলেন। আমার নাকটা মাটিতে ঘষে দেওয়ার ফলে বইটা অনেক ভাল হয়েছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

আমার সহকারী কলিন উইলিয়াম্স্ (Colin Williams), ডেভিড্ টমাস্ (David Thomas) এবং রেমণ্ড লাফ্লাম (Raymond Laflamme), আমার সেক্রেটারী জুডি ফেলা (Judy Fella), অ্যান র‍্যালফ্ (Ann Ralph), চেরিল বিলিংটন (Cheryl Billington) এবং সু ম্যাসে (Sue Masey) এবং আমার নার্সদের দলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার গবেষণা এবং চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য গনভিল (Gonville) এবং কাইয়াস কলেজ (Caius College), দি সায়েন্স এ্যাণ্ড এন্জিনিয়ারীং রিসার্চ কাউন্সিল (The Science and Engineering Research Council) এবং লেভারহিউম্ (Leverhulme), ম্যাক্ আর্থার (Mc Arthur), নুফিল্ড (Nuffield) এবং র‍্যালফ স্মিথ ফাউণ্ডেশান (Ralph Smith Foundations)–এঁরা যদি আমায় অর্থ দান না করতেন, তা হলে এ সমস্ত কাজ সম্ভব হোত না। আমি সবার কাছেই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

স্টিফেন হকিং
২০ শে অক্টোবর, ১৯৮৭

এই লেখকের অন্য বই :

কৃষ্ণগহ্বর, শিশু মহাবিশ্ব ও অন্যান্য রচনা	৮০ টাকা	*স্টিফেন হকিং* *অনু: শক্রজিৎ দাশগুপ্ত*

ভূমিকা

বিশ্ব সম্পর্কে প্রায় কিছুমাত্রই না বুঝে আমরা দৈনন্দিন জীবন যাপন্ করি। যে যন্ত্র থেকে সূর্যালোক উৎপন্ন হচ্ছে এবং জীবন সম্ভব হচ্ছে, যে মহাকর্ষ আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে আটকে রাখে [তা না হলে পৃথিবী আমাদের লাট্টুর মতো ঘুরিয়ে মহাবিশ্বের স্থানে (space) নিক্ষেপ করত] কিম্বা যে পরমাণু দিয়ে আমরা তৈরী এবং যার স্থিরত্বের উপরে আমরা মূলগতভাবে নির্ভরশীল, সে সম্পর্কে আমরা কিছুই ভাবি না। প্রকৃতিকে আমরা যেমন দেখি, প্রকৃতি কেন তেমন হল, মহাবিশ্ব কোত্থেকে এল, কিম্বা মহাবিশ্ব কি সব সময় এখানে ছিল, কালস্রোত কি কখনো পশ্চাদ্গামী হবে এবং কার্যকারণের পূর্বগামী হবে কিম্বা মানুষের পক্ষে যা জানা সম্ভব তার কি একটা চরম সীমা আছে?– শিশুরা ছাড়া কেউই এ সমস্ত চিন্তায় বিশেষ কালক্ষেপ করেন না। (শিশুদের জ্ঞান এত অল্প যে তারা এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি না করে পারে না।) আবার এমন কিছু শিশুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, যারা প্রশ্ন করেছে কৃষ্ণগহ্বর দেখতে কেমন, পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ কি? আমরা কেন অতীতই মনে রাখি ভবিষ্যৎ কেন মনে রাখি না? আগে বিশৃঙ্খলা (chaos) ছিল, এখন মনে হয় শৃঙ্খলা রয়েছে– এ রকম কেন হল? একটা মহাবিশ্বের অস্তিত্ব কেন রয়েছে?

আমাদের সমাজে এখনো রীতি হল– বাবা মা কিম্বা শিক্ষকরা এ প্রশ্নের উত্তরে একটু ঘাড় বেঁকান। কিম্বা অস্পষ্ট ধর্মীয় ধারণার সাহায্য নেন। এ সমস্ত প্রশ্নে কেউ কেউ অস্বস্তি বোধ করেন। তার কারণ মানুষের বোধশক্তির সীমারেখা এই সব প্রশ্নগুলি বেশ স্পষ্টভাবে ধরিয়ে দেয়।

কিন্তু দর্শন এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির অনেকটাই হয়েছে এই সমস্ত প্রশ্ন দ্বারা তাড়িত হয়ে। বয়স্কদের ভিতরে যাঁরা এই সমস্ত প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক তাঁদের সংখ্যা বাড়ছে। অনেক সময় তাঁরা কিছু আশ্চর্যজনক উত্তর পান। পরমাণু এবং তারকা থেকে সমান দূরত্বে আমাদের অবস্থান। অতিক্ষুদ্র এবং অতিবৃহৎকে নিয়ে আমাদের অনুসন্ধানের সীমারেখা আমরা বাড়িয়ে চলেছি।

১৯৭৪ সালের বসন্ত কালে, ভাইকিং মহাকাশযান মঙ্গল গ্রহে অবতরণের প্রায় দু'বছর

আগে আমি ইংল্যাণ্ডে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির উদ্যোগে আহূত একটি সভায় উপস্থিত ছিলাম। সভার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবী বহির্ভূত জীব অনুসন্ধান কিভাবে করা যায় সে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা। কফি খাওয়ার ফাঁকে আমি দেখলাম, পাশের হলে আরো অনেক বড় একটা সভা হচ্ছে। কৌতূহলের বশে আমি সেখানে ঢুকলাম। অচিরে বুঝতে পারলাম আমি একটা প্রাচীনরীতি দেখছি। পৃথিবীর প্রাচীনতম বিদগ্ধ জনসংগঠনগুলির একটি হল রয়্যাল সোসাইটি (Royal Society)। সেখানে হচ্ছে নতুন ফেলোর অভিষেক। সামনের সারিতে হুইলচেয়ারে বসে একজন তরুণ খুব ধীরে একটি খাতায় নাম সই করছিলেন। সেই খাতার প্রথম দিকটায় ছিল আইজাক নিউটনের স্বাক্ষর। স্বাক্ষর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বিরাটভাবে অভিনন্দিত করা হল। এমন কি তখনও স্টিফেন হকিং (Stephen Hawking) ছিলেন একজন প্রবীণ পুরুষ।

হকিং এখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত শাস্ত্রের লুকেসিয়ান অধ্যাপক (Lucasian Professor)। এক সময় নিউটন ছিলেন এই পদের অধিকারী। এবং পরে ঐ পদে ছিলেন পি. এ. এম. ডিরাক (P.A.M. Dirac)। এঁরা দুজনে ছিলেন অতিবৃহৎ এবং অতিক্ষুদ্র নিয়ে বিখ্যাত গবেষক। হকিং তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরি। এঁর এই প্রথম বই থেকে সাধারণ পাঠক অনেক কিছুই পাবেন। এ বইয়ের বিরাট ব্যাপকত্ব যেমন আকর্ষণীয়, তেমন আকর্ষণীয় লেখকের মানসিক ক্রিয়া সম্পর্কীয় আভাস। পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, মহাবিশ্বতত্ত্ব (Cosmology) এবং সাহসের সীমান্ত এ বইয়ে সহজভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

এ বইটা ঈশ্বর সম্পর্কেও বটে। হয়তো ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্পর্কে। এর পাতায় পাতায় ঈশ্বর রয়েছেন। আইনস্টাইনের বিখ্যাত প্রশ্ন ছিল, মহাবিশ্ব সৃষ্টি করার সময় ঈশ্বরের কি অন্যরকম কিছু করার সম্ভাবনা ছিল? হকিং এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। হকিং স্পষ্টই বলছেন তিনি ঈশ্বরের মন বুঝতে চেষ্টা করছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় তিনি এ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, সে সিদ্ধান্ত অপ্রত্যাশিত: এই মহাবিশ্বের স্থানে কোনো কিনারা (edge) নেই, কালে কোনো শুরু কিম্বা শেষ নেই এবং স্রষ্টার করার মতো কিছু নেই।

কার্ল সাগান
কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়
ইথাকা, নিউইয়র্ক

অনুবাদকের নিবেদন

অধ্যাপক স্টিফেন হকিং-এর "A Brief History of Time"-এর বাংলা অনুবাদ "কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" প্রকাশিত হল। বাউলমন প্রকাশনের সাধারণের জন্য বাংলায় বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ প্রকল্পে এটা নবতম সংযোজন।

আমাদের আগেকার বিজ্ঞানের বইয়ের পরিকল্পনার সঙ্গে এ বইয়ের পরিকল্পনায় অনেকটা মিল রয়েছে— মিল রয়েছে সুবিধা অসুবিধায়ও।

আইনস্টাইন পরিভাষার বিবর্তন সম্পর্কে একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর মত: সাধারণ কথ্য ভাষা থেকে বিজ্ঞানের ভাষা গ্রহণ করা যায়। প্রথমে হয়তো একই শব্দের সাধারণ ব্যবহার এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবহারে কোনো পার্থক্য থাকে না। কিন্তু সে শব্দ পরিভাষায় রূপান্তরিত হলে তার একটি নির্দিষ্ট নিশ্চিত অর্থ এবং সংজ্ঞা স্থিতিলাভ করে। আইনস্টাইনের এই ইঙ্গিত অনুসরণ করায় আমাদের কিছু অসুবিধা আছে। ইংরাজী এবং অন্যান্য যে সমস্ত ভাষায় সৃজনশীল বিজ্ঞান লেখা হয়েছে সেই সমস্ত ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষার এই ধরনের স্বাভাবিক বিবর্তন হয়েছে। তাছাড়া পাশ্চাত্য দেশে গ্রীক, ল্যাটিন ভাষার সাহায্যও নেওয়া হয়েছে। তবে সে সমস্ত ক্ষেত্রে শুরুতেই পারিভাষিক শব্দের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে।

আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকরা বিজ্ঞান চর্চায় মাতৃভাষা ব্যবহার করেন না। যদিও আজকাল অনেক স্কুলে, কলেজে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে, তবুও সৃজনশীল বিজ্ঞান, গবেষণাপত্র ইত্যাদি মাতৃভাষায় হয় না বললেই চলে। তাছাড়া মাতৃভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রপত্রিকাও বিশেষ নেই। সেইজন্য আমাদের বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় ভাষাগত অসুবিধা খুবই বেশী। বাংলাভাষীদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা যতদিন না সুস্থিত হবে ততদিন এই অসুবিধা চলবে।

আমরা প্রধানত পরিচিত পরিভাষা কোষগুলির সাহায্য নিতে চেষ্টা করেছি। এগুলির ভিতর উল্লেখযোগ্য: শ্রদ্ধেয় দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর 'পদার্থবিদ্যার পরিভাষা', 'সংসদ অভিধান', 'চলন্তিকা', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কৃত 'পরিভাষা', দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'হিন্দী পরিভাষা কোষ'— ইত্যাদি।

কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুবাদককে পরিভাষা তৈরী করতে হয়েছে। অনুবাদকের করা পরিভাষা সবার বোধগম্য হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়, সেইজন্য বারবার বন্ধনীতে মূল ইংরাজী শব্দ দিতে হয়েছে। এখানে দু একটি উদাহরণ দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। Big Bang-এর বাংলা করা হয়েছে বৃহৎ বিস্ফোরণ। Big Crunch-এর বাংলা করা হয়েছে বৃহৎ সঙ্কোচন। কোনোটিই আক্ষরিক হয়নি। কিন্তু অনুবাদককে তার ক্ষমতা অনুসারে যতটা সম্ভব অর্থের কাছাকাছি যেতে হয়েছে। সম্প্রসারণের হার যেখানে অতিদ্রুত সেখানে অধ্যাপক হকিং ব্যবহার করেছেন Inflationary শব্দ। অনুবাদককে ব্যবহার করতে হয়েছে 'অতিস্ফীতি' শব্দ।

অবশ্য অনুবাদকের এক্ষেত্রে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর শরণ নেওয়া সম্ভব। তিনি বলেছিলেন লিখে যেতে– পরিভাষা সম্পর্কে চিন্তা না করতে।

বিজ্ঞান সম্পর্কিত কোনো বইই অধ্যাপক হকিং-এর এই বইটির মতো জনপ্রিয় হয়নি। আমরা আশা করি বাংলা ভাষাতেও সে জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার দুটি স্তম্ভ: অপেক্ষবাদ এবং কণাবাদী বলবিদ্যা। এর আগে আমরা আইনস্টাইনের "অপেক্ষবাদ: বিশিষ্ট ও ব্যাপকতত্ত্ব" এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেলের "অপেক্ষবাদের অ আ ক খ" বাংলায় প্রকাশ করেছি। এই দুটি বইয়েরই বিষয়বস্তু অপেক্ষবাদ। আমাদের প্রকাশিত আইনস্টাইন-ইনফেল্ডের "পদার্থবিদ্যার বিবর্তন"-এ কণাবাদী বলবিদ্যা নিয়ে আলোচনা খুবই কম।

আমাদের ইচ্ছা কণাবাদী বলবিদ্যা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের পাঠ্য একটি পুস্তক প্রকাশ করা। কিন্তু এখনো আমরা সে ব্যাপারে খুব বেশী এগোতে পারি নি।

অধ্যাপক হকিং-এর এই বইটিতে কণাবাদী বলবিদ্যা, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদ ইত্যাদি নিয়ে বেশ খানিকটা আলোচনা রয়েছে। আশা করি এ আলোচনা এক দিকে পাঠকদের কৌতূহল খানিকটা পরিতৃপ্ত করবে আবার অন্যদিকে বাড়িয়ে তুলবে তাদের অনুসন্ধিৎসা।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারিত এবং প্রসারিত হয়নি অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞানে জাতি হিসাবে অগ্রগতি হয়েছে এরকম কোনো দেশের অস্তিত্ব আমার জানা নেই। বাউলমন-এর বাংলাভাষায় বিজ্ঞান প্রচার প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য বাংলাভাষীদের ভিতর বৈজ্ঞানিক কৌতূহল সৃষ্টি করা। আমাদের আশা, এ প্রচেষ্টা জাতি হিসাবে আমাদের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে সাহায্য করবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার যে প্রচেষ্টা করছেন এই প্রসঙ্গে তার প্রশংসা করতেই হয়। তবে শুধুমাত্র সরকারী প্রচেষ্টা ছাড়াও বেসরকারী প্রচেষ্টারও যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পণ্ডিতেরা বলেন, একটি জঙ্গলকে চিনতে হলে যেমন গোটা জঙ্গলকে দেখতে হয় তেমনি দেখতে হয় এককভাবে গাছগুলিকেও। এই বইয়ে কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক হকিং এক দিকে যেমন বিজ্ঞানের গোটা জঙ্গলের আংশিক ছায়াপাত

করেছেন তেমনি বহুক্ষেত্রে অনেক একক গাছ অর্থাৎ জটিল তত্ত্বও তিনি বুঝিয়েছেন।

এই প্রকল্পে বাউলমন প্রকাশন সাধারণের উপযুক্ত সহজবোধ্য বিজ্ঞানের বই বেছে নিয়েছে। সেইজন্য সব সময়ই আমাদের চেষ্টা গাণিতিক জটিলতা এড়িয়ে যাওয়ার। এই বইটিও কোনো ব্যতিক্রম নয়। $E = mc^2$ ছাড়া কোনো সমীকরণ এই বইয়ে ব্যবহার করা হয়নি।

আইনস্টাইন বলেছেন, গণিত বিজ্ঞানীদের ভাষা হলেও সে ভাষাকে সাধারণের ভাষায় অনুবাদ করা অসম্ভব নয়। অধ্যাপক হকিং তাঁর পূর্বসূরি নির্দিষ্ট পন্থা পরিত্যাগ করেন নি। তিনি বোধ করেছেন বিজ্ঞান মানুষের জন্য– সাধারণ মানুষের ভাষায় বিজ্ঞান অনুবাদ প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রচার এবং প্রসারের স্বার্থেই। আমরা আশা করব অধ্যাপক হকিং বিজ্ঞানের সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের এই প্রচেষ্টাকে ভবিষ্যতে আরো বেশী এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

বইটি পড়তে পড়তে অনেক সময়, সন্দেহ হয় কোনো কোনো প্রসঙ্গে তিনি কি জটিলতা এড়ানোর চেষ্টায় গভীরতাকেও এড়িয়ে গিয়েছেন? কিন্তু পুরো বইটি পড়লে মনে হয় বিষয়টির উপর তাঁর অধিকার এত গভীর যে তিনি যে কোনো প্রসঙ্গকেই সাধারণ মানুষের বোধগম্য সরলতম ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন। আশা করি ভবিষ্যতে তিনি আরও বই লিখবেন এবং তখন তিনি জটিলতম প্রসঙ্গকে আমাদের মতো স্বল্পবুদ্ধিমানুষের জন্য সরলতম রূপ প্রকাশ করবেন। বইটি পড়লে যে কোনো পাঠকই বুঝতে পারবেন লেখকের ভাষাজ্ঞান এবং রসবোধ বহু পেশাদার সাহিত্যিকের চাইতে অনেক বেশী।

পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পশ্চাৎপটে রয়েছে ইহুদী, খ্রীশ্চান চিন্তাধারার প্রভাব। সেই চিন্তাধারা অনুসারে ঈশ্বর একদিন বিশ্বসৃষ্টি করতে শুরু করেন এবং ছ'দিনে সৃষ্টিকর্ম শেষ করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। আমাদের ভারতীয়দের বৈজ্ঞানিক দর্শন প্রধানত সাংখ্যভিত্তিক, সেই দর্শনে ঈশ্বরকে এরকম কোনো প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। সাংখ্যকাররা বলছেন, প্রমাণ না থাকার দরুন ঈশ্বরকল্পন অসিদ্ধ। সেজন্য সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্বে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই। অনেক পণ্ডিতের মতে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতত্ত্ব অর্থাৎ পুরুষ সম্পর্কীয় ধারণাও প্রক্ষিপ্ত কারণ সাংখ্যের মূল চিন্তাধারার সঙ্গে তার কোনো সঙ্গতি নেই।

সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব বিবর্তনবিত্তিক। এ দর্শনের মতে প্রকৃতির বিবর্তনের ফলেই মহাবিশ্ব এবং জীবজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। মহাবিশ্বের সৃষ্টি যেমন হয়েছে, স্থিতি যেমন চলছে প্রলয়ও তেমনি হবে। প্রলয়ের পর আবার সৃষ্টি হতে পারে। অধ্যাপক হকিং-এর মহাবিশ্বতত্ত্বে আমরা সাংখ্যের ছায়া বেশ স্পষ্টই দেখতে পাই।

সাংখ্যের মতে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের সার পদার্থ নিয়ে মন গঠিত। পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানের অধিকাংশ পণ্ডিতের মতো অধ্যাপক হকিংও মন সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেন নি। আসলে আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের অভিমুখ সম্পূর্ণ ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান আহরণ করা। এক্ষেত্রে ব্যক্তি শব্দের অর্থ ব্যক্তির মন।

জড়-বিজ্ঞানের এই আচরণে আমাদের অর্থাৎ মানসিক চিকিৎসকদের অনেক সময়ই নিজেদের বিজ্ঞান-জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি কি ইহুদী ক্রীশ্চান পশ্চাৎপটের ফল ?

আমাদের মনে হয় মনেরও আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E = mc^2$-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। যদি অন্তর্ভুক্ত হয় তা হলে স্বভাবতই মন এবং মানসিক ক্রিয়াগুলি শক্তি-বস্তু সাংততাকে (continuum) স্থান পাওয়ার যোগ্য। ভারতীয় বিজ্ঞানের দর্শন কিন্তু মনকে সে স্থান অনেক দিন আগেই দিয়েছে। বিশেষ করে সাংখ্যের তন্মাত্র সম্পর্কীয় চিন্তাধারা স্পষ্টতই জড় জগতের সঙ্গে অনুভূতির সেতু বন্ধন করেছে। আমরা জানি অনুভূতি একটি প্রধান মানসিক ক্রিয়া।

তবে সাংখ্য বিজ্ঞান নয়। শুধুমাত্র দর্শন। বিজ্ঞান সুষ্ঠু যুক্তি এবং বাস্তব জগৎ সম্পর্কীয় জ্ঞানের একটি সমন্বয় (? পরীক্ষামূলক)। এই অর্থে সাংখ্য বিজ্ঞান পর্যায়ে আসে না। তবে দর্শন পর্যায়ে নিশ্চয় আসে। আমরা জানি সমগ্র জ্ঞানের আদি জনক দর্শনশাস্ত্র।

বিজ্ঞানের আলোচনায় মনের অনস্তিত্ব কিছু সমস্যার সৃষ্টি করে। মানব জ্ঞানের প্রধান উৎস অনুভূতি। মন অংশ গ্রহণ না করলে অনুভূতি অসম্পূর্ণ থাকে। একটা উদাহরণ দিলে আমার বক্তব্য অনেক স্পষ্ট হবে।

আমাদের অক্ষিপটে আঘাত করে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। সেখান থেকে মস্তিষ্কে যা পৌঁছায় সেটা স্নায়ু স্পন্দন মাত্র। কিন্তু আমরা কখনো অনুভব করি বর্ণ, কখনো আকার আবার কখনো রূপ। আমার সামনে যদি কেউ দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে অক্ষিপটে তার ছায়া পড়ে উল্টো। অর্থাৎ ছায়ার মাথাটা থাকে নিচের দিকে কিন্তু পা-টা থাকে উপর দিকে। অথচ আমি অনুভব করি লোকটা সোজা দাঁড়িয়ে আছে। এই সংশোধনকে আমরা মানসিক ক্রিয়াই বলি। এই রকম অসংখ্য ক্রিয়াকে মানসিক ক্রিয়া বলা হয়। তার ভিতর কিছু চেতন, কিছু অচেতন, কিছু আংশিক চেতন। অনেকে মনে করেন, চেতনাই মনের মূলগত প্রকাশ। আসলে এই রকম অসংখ্য ক্রিয়ার পিণ্ডকৃত রূপের নাম মন। না, মন বলে দেহের কোনো বাস্তব অঙ্গ নেই। মানুষই এই জাতীয় বহুক্রিয়ার পিণ্ডকৃত ধারণার নাম দিয়েছে মন। বহুক্রিয়া আমরা দেখতে পাই সুতরাং প্রকল্প হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছে তার একটি (? একাধিক) কর্তাও আছে। সেই কর্তার নাম দেওয়া হয়েছে মন। সুতরাং শক্তি-বস্তু সাংততাকের (continuum) অন্তর্ভুক্ত, মন একক একটি শক্তি হতে পারে আবার হতে পারে বহু শক্তির বহু প্রকল্পের একটি পিণ্ডকৃত রূপ। এই মনপিণ্ডের অনেক উপাদান চেতনাকে যা দিতে পারে আবার অনেক উপাদান চেতনাকে স্পর্শমাত্র না করতে পারে।

এর সঙ্গে তুলনা করা যায় বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের। কোনো তরঙ্গ আমাদের দেহে তাপের অনুভূতি সৃষ্টি করে আবার কোনো তরঙ্গ আমাদের চেতনায় দৃষ্টির অনুভূতি সৃষ্টি করে। আবার তারই ভিতরে এক ধরনের তরঙ্গ এক এক ধরনের রঙের অনুভূতি সৃষ্টি করে। এমন অনেক বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ আছে যারা কোনো অনুভূতিই সৃষ্টি করে না।

কিন্তু আমাদের কল্পনে এদের পিণ্ডকৃত নাম বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ।

তেমনি হয়তো আমরা এক গোষ্ঠীর বহু শক্তির পিণ্ডকৃত কল্পনের নাম দিয়েছি মন।

মনের অবস্থার উপর আমাদের অনুভূতির রূপ অনেকটাই নির্ভর করে। মানসিক রোগ সম্পর্কীয় যে কোনো পাঠ্যপুস্তকেই এ ধরনের ভুরিভুরি উদাহরণ পাওয়া যাবে। উদাহরণ : এমন মানসিক অবস্থা হতে পারে যে অবস্থায় সাধারণ মানুষ যাকে দ্রষ্টব্য রঙ বলে অনুভব করে সে অবস্থায় বিশেষ মানুষটি তাকে শ্রোতব্য শব্দ বলে অনুভব করবে।

সুতরাং, মন সম্পর্কে সম্যক আলোচনা না থাকলে বহির্বিশ্ব তথা মহাবিশ্ব বুঝতে অসুবিধা হবে সন্দেহ নেই।

বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন শ্রেণী, বিভিন্ন যুগের মানুষেরও দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য হবে। তার কারণ তাদের পরিবেশে পার্থক্য থাকলে মনের গঠনেও পার্থক্য থাকবে। অথচ এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের হতে হবে বৈজ্ঞানিক সত্যের নিকটতম।

সেজন্য মন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি কোনো বিজ্ঞানকর্মীই অস্বীকার করতে পারে না।

অ্যারিস্টোটলের বিশ্বদৃষ্টি, গ্যালিলিও-নিউটনের বিশ্বদৃষ্টি এবং আইনস্টাইনের বিশ্বদৃষ্টিতে যে পার্থক্য তার কারণ কি শুধুমাত্র তাঁদের প্রতিভা ? তাঁদের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত এবং তার ফলস্বরূপ তাঁদের মানসিক গঠনের যে পার্থক্য তার সঙ্গে কি তাঁদের বিশ্বদৃষ্টির কোনো সম্পর্ক নেই ?

এক জায়গায় লেখক আধুনিক গাণিতিক পদার্থবিদ্যাভিত্তিক হিসাব করে দেখিয়েছেন : যে হেতু মহাবিশ্বের পরা এবং অপরা শক্তি প্রায় সমান সমান সুতরাং যোগ বিয়োগ করলে দেখা যাবে যোগফল শূন্য। ব্যাপারটা প্রায় মায়াবাদ কিম্বা শূন্যবাদের পর্যায়ে এসে পড়ে।

অধ্যাপক হকিংয়ের গণিতশাস্ত্রকে "দূর হইতে গড় করিবার" যুক্তি সহজবোধ্য। গাণিতিক সমীকরণ থাকলে অনেক পাঠকই পলায়ন করতেন সন্দেহ নেই। সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকলেও বাংলা ভাষার অনুবাদক যে পলায়মান পাঠকদের পথপ্রদর্শক হোত সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

বিজ্ঞানের ভিত্তি সুষ্ঠু যুক্তি এবং বিশ্ব সম্পর্কে সম্যক বাস্তব জ্ঞানের সমন্বয়। কিন্তু যুক্তি অর্থাৎ গণিত যদি বাস্তব মহাবিশ্বকেই অদৃশ্য করে দেয়, তাহলে সমাজ কি নিজেদের নিরাপদ বোধ করবে ?

তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ আর বৌদ্ধদের শূন্যবাদ সত্ত্বেও মানুষের জীবন ধারা তার নিজের ছন্দেই চলে এসেছে।

পদার্থবিদ্যার সার্বিক ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আবিষ্কার সম্পর্কে অধ্যাপক হকিং খুবই আশাবাদী।

সে তত্ত্বের আগমনী পদধ্বনি তিনি স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছেন। কিন্তু সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব সদা পরিবর্তনশীল। মহাবিশ্ব এক না একাধিক সে সম্পর্কেও বিজ্ঞান নিশ্চিত নয়। সুতরাং, মহাবিশ্ব সম্পর্কে স্থিরতত্ত্ব আবিষ্কার কি সম্ভব ?

যদি আমরা মনে রাখি জড় এবং জীবের সমন্বয়েই মহাবিশ্ব এবং মানসিক ক্রিয়াও মহাবিশ্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ তা হলে আমাদের মনে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়। বিশেষ করে প্রাণ এবং মন সম্পর্কেও বিজ্ঞান নিশ্চিত নয়। সুতরাং মহাবিশ্ব সম্পর্কে কোনো সঠিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অভাব মনে রাখলে সে সন্দেহ আরো বৃদ্ধি পায়।

অধ্যাপক হকিংয়ের মস্তিষ্কের সংবাদ সারা বিশ্বেরই জানা। কিন্তু হৃদয়ের সংবাদ কি সবাই জানে ? আমরা কিন্তু জানি। আমরা শব্দের অর্থ অনুবাদক আর বাউলমন প্রকাশন।

অধ্যাপক হকিং কেম্ব্রিজে লুকেসিয়ান অধ্যাপকের পদে রয়েছেন। এ পদে স্যার আইজাক নিউটনও ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে দুজনের পার্থক্য লক্ষণীয়। হৃদয়বান বলে কোনো খ্যাতি নিউটনের ছিল না।

কিন্তু অধ্যাপক হকিং ?

আমাদের এ অনুবাদ প্রায় দু বছর আগে প্রেসে দেওয়ার জন্য তৈরী ছিল। কিন্তু প্রকাশকদের অনুমতি নিতে হলে যে পরিমাণ ডলার দিতে হোত তাতে বইটা অনেকের নাগালের বাইরে চলে যেত।

তখন আমরা শরণাপন্ন হই এ্যানড্রু জন্‌স্‌ নামে একজন ইংরাজ বন্ধুর। পেশায় তিনি মানসিক রোগের চিকিৎসক। তিনিই যোগাযোগ করেন অধ্যাপক হকিংয়ের সঙ্গে। অধ্যাপক হকিং এই বাংলা সংস্করণে তাঁর অনুমোদনপত্র তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর প্রাপ্য রয়্যালটি সম্পর্কিত দাবীও সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন। তার ফলে এই বই বৃহত্তর পাঠক সমাজে আরো সহজপ্রাপ্য হবে বলে আমরা আশা করি।

এই সুযোগে আমরা ডাক্তার এ্যানড্রু জন্‌স্‌-এর কাছেও আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই— কৃতজ্ঞতা অনুবাদকের পক্ষ থেকে, বাউলমন প্রকাশনের পক্ষ থেকে— আর হয়তো বৃহত্তর বাঙালী সমাজের পক্ষ থেকেও।

আমরা জানি আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের জন্মদিন ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর— অর্থাৎ কলাম্বাসের বাহামা দ্বীপে অবতরণের তারিখ। না, কলাম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন নি। তিনি করেছিলেন আক্রমণ। কলাম্বাস আবিষ্কার করেছিলেন : আদিবাসীদের সম্পদ আছে, কিন্তু মারণ-প্রযুক্তিতে ওরা হীন। লুণ্ঠনের চাইতে লাভজনক কিছু নেই। লুণ্ঠন বজায় রাখতে হলে মারণ প্রযুক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রয়োজন।

কলাম্বাসের এই মহান আবিষ্কার আজও বিশ্বের লুণ্ঠনকারীদের জীবনদর্শন।

কলাম্বাসের বাহামা দ্বীপে অবতরণের সময় অর্থাৎ আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের জন্মলগ্নে আধুনিক বিজ্ঞান বিকাশ লাভ করতে শুরু করেছে মাত্র। তখনও প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে সম্পর্কও দৃঢ়তর হয়েছে। প্রযুক্তির প্রগতির মানদণ্ড একটিই : অপরকে বঞ্চনা করা এবং শোষণ করার ক্ষমতা। সুতরাং প্রযুক্তির সঙ্গে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের আত্মিক বন্ধন বিজ্ঞানের পক্ষে শুভ হয় নি। শুভ হয় নি মানুষের পক্ষেও। সে জন্যই আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের মানুষ অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন মানুষ কখনোই প্রযুক্তিবিদ্যা এবং তার পরম আত্মীয় তাত্ত্বিক বিজ্ঞানকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে পারে নি। গ্রহণ করতে অক্ষমতার জন্য শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন দেশের জনসাধারণই দায়ী নয়, সাম্রাজ্যবাদের জন্মলগ্ন থেকেই শোষক দেশগুলি কপিরাইট আইন এবং পেটেন্ট আইনের মতো কতগুলি দুর্ভেদ্য বর্মে তাদের বঞ্চনার নীতিকে সুরক্ষিত করেছিল। তাছাড়া ছিল ভাষার ব্যবধান। তাছাড়াও কি কারণ উল্লেখ করা যায় ? যেমন প্রথম বিশ্বের সচেতন অনীহা ? আমাদের সংগ্রাম জীবন সংগ্রাম, ওদের সংগ্রাম আমাদের শোষণ করার অধিকারের জন্য। সে সংগ্রামে মারণ প্রযুক্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের যেমন গুরুত্ব তেমনি গুরুত্ব শিকারকে যথাসম্ভব অজ্ঞ রাখার।

অনেকে মনে করেন প্রযুক্তিবিদ্যা এবং বিজ্ঞানের কোনো জাতি নেই, কোনো বন্ধু নেই, কোনো শত্রু নেই। এরা বারাঙ্গনার মতো। যথোচিত মূল্য পেলে এরা যে কোনো প্রেমিককে সেবা করতে পারে। এই ভরসায় পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মানুষ কাঁধে খুড়োর কল লাগিয়ে চণ্ডীদাসের খুড়োর মতো দৌড়েই চলেছে। কিন্তু সামনে ঝোলানো মিঠাইমণ্ডা খুব কম লোকের ভাগ্যেই জুটছে।

তবুও আমরা জানতে চাই। পরিবেশকে জানার চেষ্টা জীবের জন্মগত। কিন্তু বই, পত্রপত্রিকা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মূল্য এমন যে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের আর্থিক ক্ষমতা থেকে তার অবস্থান অনেক দূরে। সে দূরত্ব দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

প্রথম বিশ্বের নেতারা কি আমাদের অজ্ঞতার বন্ধন দৃঢ়তর হওয়াতে খুশী ?

আমি জানি না।

তবে অধ্যাপক হকিং কিন্তু এরকম প্রচেষ্টার অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি শুধু বাংলায় অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, নিজের প্রাপ্য দক্ষিণার দাবীও তিনি ত্যাগ করেছেন।

অর্থাৎ অসুস্থ বিকলাঙ্গ অধ্যাপকের রয়েছে আকাশের মতো উদার একটি হৃদয়।

সে হৃদয়কে আমি নমস্কার জানাই। সে হৃদয়ের কাছে আমি ঋণী, ঋণী বাউলমন প্রকাশন। ভবিষ্যতেও হয়তো ঋণী থাকবেন বাঙলা বিজ্ঞান সাহিত্যের পাঠকরা।

একটি দেশ কিম্বা সমাজের ব্যক্তি এবং সমষ্টিতে পার্থক্য থাকে। বিশেষ করে পার্থক্য থাকে সমষ্টির নেতা এবং ক্ষমতার অধিকারীদের সঙ্গে একক সাধারণ মানুষের। ক্ষমতার

অধিকারীরা অধিকার অর্জন করার জন্য এবং অধিকার রক্ষা করার জন্য—উপায়ের কোনো ভালমন্দ বিচার করেন না। অধিকার অর্জন এবং রক্ষার সংগ্রাম নির্মম। কিন্তু সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা থাকে ক্ষুদ্রতর। তারা চায়—আহার, আশ্রয় আর সুস্থ পরিবেশ। তারা ভালবাসতে চায়, ভালবাসা চায়, চায় পরিবেশ সম্পর্কে জানতে। তারা ভাবতে চায়— "আমরা কারা? আমরা কোথায় ছিলাম—কোথায় এলাম আর যাবই বা কোথায়?"

আমাদের অধ্যাপক হকিং তেমনই একজন সাধারণ মানুষ। তাঁর জীবনে বিফলতা এসেছে নিজের স্বাস্থ্যে, সাফল্য এসেছে কর্মে, ভালবাসায়। তিনি ভালবাসতে পেরেছেন—ভালবাসা পেয়েছেন।

আমরা কামনা করি সেই সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকুন। তাঁদের ভিতরে বেঁচে থাকুন অধ্যাপক হকিং—দূর হোক তাঁর অস্বাস্থ্য—শ্রীবৃদ্ধি পাক তাঁর কর্ম, তাঁর ভালবাসা—ভালবাসতে পারা—ভালবাসা পাওয়া। তবে আবার বলছি ডাঃ এ্যানড্রু জন্‌সের সহৃদয়তার কথাও আমরা ভুলব না।

আমি পদার্থবিদ নই। বিদ্যাবুদ্ধি আমার সীমিত। পরিবেশ জানার আন্তব প্রেরণায় আমি অনেক সময়ই হয়তো নিজের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করি। আইনস্টাইন কিম্বা হকিং-এর বইয়ের বাংলা অনুবাদের চেষ্টা তার একটা উদাহরণ মাত্র। এ প্রচেষ্টায় ভুলত্রুটি অনেক আছে—সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। যতবারই নতুন করে পড়ছি, ততবারই নতুন করে নজরে আসছে নতুন নতুন ত্রুটি। পাঠকরা যদি আমার এ ত্রুটি সংশোধন করে আমাকে সাহায্য করেন তা হলে এই প্রবীণ যুবক বাধিত বোধ করবে।

ইতি

শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত

বাউলমন

মহালয়া

১৩৯৯

১

মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের চিত্র

(Our Picture of the Universe)

একজন সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক (অনেকে বলেন, বার্ট্রাণ্ড রাসেল) একবার জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে জনসাধারণের কাছে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবী কি করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, আবার সূর্য কি করে আমাদের নীহারিকা (galaxy) অর্থাৎ বিরাট এক তারকা সংগ্রহের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে ঘোরে। বক্তৃতার শেষে ঘরের পিছন থেকে ছোটখাটো এক বৃদ্ধা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: "এতক্ষণ আপনি আমাদের যা বলেছেন— সব বাজে কথা। পৃথিবীটা আসলে চ্যাপ্টা, আর রয়েছে বিরাট এক কচ্ছপের পিঠের উপর।" বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন, "কচ্ছপটা কার উপর দাঁড়িয়ে আছে?" বৃদ্ধা বললেন , "ছোকরা, তুমি বেশ চালাক— খুব চলাক। তবে তলায় পরপর সবই কচ্ছপ রয়েছে।"

মহাবিশ্ব অসংখ্য কচ্ছপের স্তম্ভ— এ চিত্র অধিকাংশের কাছেই হাস্যকর মনে হবে। কিন্তু আমরা বেশী জানি এ কথা ভাবব কেন? মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমরা কি জানি এবং কিভাবে জানি? মহাবিশ্ব এসেছে কোত্থেকে এবং যাচ্ছেই বা কোথায়? মহাবিশ্বের কি কোনো শুরু ছিল? যদি থেকে থাকে তাহলে তার আগে কি হয়েছিল? কালের চরিত্র কি? কাল কি কখনো শেষ হবে? পদার্থবিদ্যার ইদানীং কালের আবিষ্কারের সাহায্যে (সে আবিষ্কারগুলি অংশত হয়েছে কিছু অকল্পনীয় প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে) এই সমস্ত বহু দিনের বহু প্রাচীন প্রশ্নগুলির কিছু কিছু উত্তরের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কোনো দিন হয়তো এই উত্তরগুলিকে পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার মতো স্বতঃপ্রতীয়মান মনে হবে। কিম্বা হয়তো মনে হবে কচ্ছপের স্তম্ভের মতো হাস্যকর। এ সম্পর্কে শুধুমাত্র কালই (সে যাই হোক) বলতে পারবে।

প্রাচীনকালে ৩৪০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টোটল তাঁর অন দি হেভেন্‌স

(ON THE HEAVENS- মহাকাশ সম্পর্কে) বইতে পৃথিবী যে একটি বৃত্তাকার গোলক এবং একটা চ্যাপ্টা থালা নয়—এ সম্পর্কে দুটি ভাল যুক্তি দেখাতে পেরেছিলেন। প্রথমত, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, চন্দ্রগ্রহণের কারণ সূর্য এবং চন্দ্রের মাঝখানে পৃথিবীর আসা। চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়া সব সময়েই গোলাকৃতি। পৃথিবী গোলাকৃতি বলেই এটা সম্ভব। পৃথিবী যদি চ্যাপ্টা থালার মতো হোত তা হলে সূর্য যখন থালার কেন্দ্রের ঠিক নিচে অবস্থান করছে— তখনই গ্রহণ না হলে ছায়াটি হোত লম্বাটে এবং উপবৃত্তাকার (elliptical)। দ্বিতীয়ত, গ্রীকরা তাঁদের ভ্রমণের ফলে জানতেন দক্ষিণ দিক থেকে দেখলে উত্তর দিক থেকে দেখার তুলনায় ধ্রুবতারাকে (North Star) আকাশের অনেক নিচুতে দেখা যায়। (যেহেতু ধ্রুবতারা উত্তর মেরুর উপরে অবস্থিত, সেজন্য উত্তর মেরুর একজন পর্যবেক্ষকের মনে হয় তারাটি ঠিক তার মাথার উপরে। কিন্তু বিষুবরেখা থেকে দেখলে মনে হয় তারাটির অবস্থান দিক্‌চক্রবালে)। মিশর এবং গ্রীস থেকে ধ্রুবতারার আপাতদৃষ্ট অবস্থানের পার্থক্য পর্যালোচনা করে অ্যারিস্টোটল পৃথিবীর পরিধির একটা অনুমান করেছিলেন: চার লক্ষ স্ট্যাডিয়া (stadia)। স্ট্যাডিয়ামের (Stadium) দৈর্ঘ্য ঠিক কতটা সেটা জানা যায় না। তবে প্রায় ২০০ গজ হয়তো ছিল। তা হলে ইদানীং কালের স্বীকৃত মাপের তুলনায় অ্যারিস্টোটলের অনুমান প্রায় দ্বিগুণ। পৃথিবী বৃত্তাকার এ তথ্যের সপক্ষে গ্রীকদের আরো একটি যুক্তি ছিল। তা না হলে দিক্‌চক্রবাল থেকে জাহাজ আসবার সময় প্রথম কেন পাল দেখা যাবে এবং তারপরে কেন দেখা যাবে জাহাজের কাঠামোটা ?

অ্যারিস্টোটল ভাবতেন পৃথিবীটা স্থির এবং সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও তারকারা পৃথিবীর চারদিকে বৃত্তাকার কক্ষে চলমান। তিনি এটা বিশ্বাস করতেন তার কারণ অতীন্দ্রিয়বাদী (mystical) যুক্তিতে তিনি বিশ্বাস করতেন, পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র এবং বৃত্তাকার গতি সবচাইতে নিখুঁত। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টোলেমী (Ptolemy) এই ধারণা বিস্তার করে ব্রহ্মাণ্ডের একটি সম্পূর্ণ প্রতিরূপ (cosmological model) তৈরী করেছিলেন। পৃথিবী ছিল কেন্দ্রে এবং তাকে ঘিরে ছিল আটটি গোলক। এই গোলকগুলি বহন করত চন্দ্র, সূর্য, তারক এবং সেই যুগে জানিত পাঁচটি গ্রহ— বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি (চিত্র ১.১)। গ্রহগুলি নিজেরা তাদের নিজ নিজ গোলকের সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্রতর বৃত্তে ভ্রমণ করে। এই বিবরণ ব্যাখ্যা করত তাদের আকাশে পর্যবেক্ষণ করা পথের জটিলতা। সবচাইতে বাইরের গোলকে থাকে তথাকথিত স্থির তারকাগুলি, এই তারকাগুলি পরস্পর সাপেক্ষ সব সময়ই একই অবস্থানে থাকে কিন্তু তারা একত্রে আকাশের এপার থেকে ওপারে ঘোরে। শেষ গোলকের বাইরে কি থাকত সেটা কখনোই স্পষ্ট ছিল না। তবে সেটা নিশ্চিত ভাবেই মানুষের পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের অংশ ছিল না।

টোলেমীর (Ptolemy) প্রতিরূপ থেকে মহাকাশের বস্তুপিণ্ডগুলির আকাশে অবস্থান সম্পর্কে মোটামুটি নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব ছিল। সে জন্য টোলেমীকে একটা অনুমান করতে হয়েছিল: চন্দ্র এমন একটি পথ পরিভ্রমণ করে, যে পথে অনেক সময় অন্যান্য সময়ের তুলনায় পৃথিবীর সঙ্গে চাঁদের নৈকট্য দ্বিগুণ হয়। এর অর্থ চন্দ্রের আকার অনেক সময় অন্যান্য সময়ের তুলনায় দ্বিগুণ দেখানো উচিত। এই ত্রুটি টোলেমী বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তবুও এই প্রতিরূপটি সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছিল। অবশ্য সবাই মেনে নেন নি। খ্রীষ্টীয়

চার্চ এই প্রতিরূপ গ্রহণ করেছিল। তার কারণ তাদের ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে এই প্রতিরূপের মিল

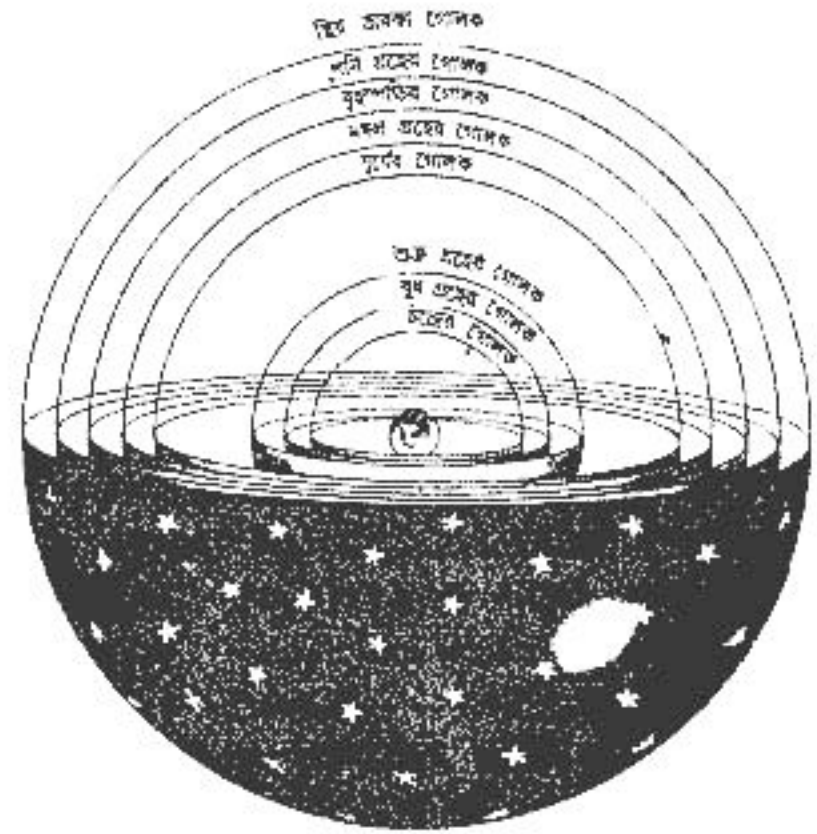

চিত্র - ১.১

ছিল। এই প্রতিরূপের সুবিধা হল, স্থির তারকাগুলির গোলকের বাইরে স্বর্গ এবং নরকের জন্য অনেকখানি জায়গা পাওয়া যায়।

নিকোলাস কোপারনিকাস (Nicholas Copernicus) নামক একজন পোলিশ পুরোহিত ১৫১৪ সালে একটি সরলতর প্রতিরূপ উপস্থাপন করেন (প্রথমে হয়তো নিজেদের চার্চ ধর্মবিরোধী বলবে এই ভয়ে কোপারনিকাস নিজের প্রতিরূপটি নিজের নাম না দিয়ে প্রচার করেন)। তাঁর ধারণা ছিল সূর্য কেন্দ্রে স্থিরভাবে অবস্থান করে এবং পৃথিবী আর অন্যান্য গ্রহ বৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই চিন্তাধারাকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে প্রায় এক শতাব্দী লাগে। তারপর জার্মান জোহান কেপলার এবং ইতালীয়ান গ্যালিলিও গ্যালিলি এই দুজন জ্যোতির্বিদ প্রকাশ্য ভাবে কোপারনিকাসের তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করতে শুরু

করেন। অথচ, এই তত্ত্ব যে রকম কক্ষের পূর্বাভাস দিয়েছিল তার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা কক্ষের সম্পূর্ণ মিল ছিল না। অ্যারিস্টোটলীয়-টোলেমীয় তত্ত্বের উপর মরণ আঘাত আসে ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে। সে বছর গ্যালিলিও সদ্য আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে রাত্রির আকাশ পর্যবেক্ষণ করা শুরু করেন। বৃহস্পতি গ্রহকে দেখবার সময় তিনি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রহ অর্থাৎ চন্দ্র দেখতে পান। সেগুলি বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করছে। এর নিহিত অর্থ হল, অ্যারিস্টোটল এবং টোলেমী যা ভাবতেন সেই মতানুসারে যদিও সবারই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করা উচিত, তবুও সব জিনিসই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না (অবশ্য তখনও বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল: পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে স্থির ভাবে অবস্থান করছে এবং বৃহস্পতির চন্দ্রগুলি অত্যন্ত জটিল পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। পথটা এমন যে, মনে হয় তারা বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু কোপারনিকাসের তত্ত্ব ছিল অনেক সরল)। একই সময় জোহান কেপলার কোপারনিকাসের তত্ত্বের পরিবর্তন করেন। তাঁর মতে গ্রহগুলি বৃত্তাকারে চলমান নয়, চলমান উপবৃত্তাকারে (ellipse: উপবৃত্ত লম্বাটে একটা বৃত্ত)। শেষ পর্যন্ত পূর্বাভাস এবং পর্যবেক্ষণে মিল হল।

কেপলারের কাছে কিন্তু উপবৃত্তাকার কক্ষ ছিল একটি অস্থায়ী প্রকল্প মাত্র কারণ এ প্রকল্প ছিল প্রতিকূল। কারণ উপবৃত্ত স্পষ্টতই বৃত্তের চাইতে কম নিখুঁত। কেপলার আকস্মিক ভাবে আবিষ্কার করেন: পর্যবেক্ষণের সঙ্গে উপবৃত্ত ভাল মেলে। তাঁর ধারণা ছিল, গ্রহগুলিকে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে বাধ্য করে চৌম্বক বল। এই ধারণার সঙ্গে এই আকস্মিক আবিষ্কারকে তিনি মেলাতে পারছিলেন না। এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় অনেক পরে ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। স্যার আইজাক নিউটন তাঁর **ফিলোজফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা** (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica) গ্রন্থটি প্রকাশ করার পর। এটা বোধ হয়, ভৌত বিজ্ঞান বিষয়ে প্রকাশিত বইগুলির ভিতরে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এ বইটাতে নিউটন শুধুমাত্র স্থান-কালে বস্তুপিণ্ডগুলি কি করে চলাচল করে সে সম্পর্কে তত্ত্বকথাই দেন নি, তিনি এই গতিগুলি বিশ্লেষণ করার জন্য যে জটিল গণিত প্রয়োজন সেটাও সৃষ্টি করেছিলেন। এ ছাড়া নিউটন একটি প্রকল্পিত সর্বব্যাপী মহাকর্ষীয় বিধি উপস্থাপন করেন। এই বিধি অনুসারে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুপিণ্ডই পরস্পরের প্রতি একটি বল দ্বারা আকৃষ্ট হয়, বস্তুপিণ্ডগুলি পরস্পরের যত নিকটতর হবে, এই বল ততই শক্তিশালী হবে। তাছাড়া সে বলের শক্তি বৃদ্ধি হবে বস্তুপিণ্ডের ভর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। এই বলই বস্তুপিণ্ডগুলির মাটিতে পড়ে যাওয়ার কারণ। (প্রচলিত কাহিনী হল: নিউটনের মাথায় একটা আপেল পড়াতে নিউটন অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এ কাহিনী প্রায় নিশ্চিতভাবে অপ্রমাণিত। নিউটন নিজে যা বলেছেন, তা হল, তিনি 'চিন্তা করার মেজাজে' বসেছিলেন, 'তখন' একটা আপেল পড়তে দেখে তাঁর মাথায় মহাকর্ষ সম্পর্কে ধারণা এসেছে)। নিউটন আরো দেখিয়েছিলেন, তাঁর বিধি অনুসারে মহাকর্ষ চন্দ্রকে উপবৃত্তাকার কক্ষে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করায় এবং সূর্যের চারপাশে গ্রহগুলির উপবৃত্তাকার পথে ভ্রমণের কারণও এই মহাকর্ষ।

কোপারনিকাসের প্রতিরূপ টোলেমীর মহাকাশের নানা গোলক (celestical spheres) সম্পর্কে ধারণা দূরীভূত করে এবং তার সঙ্গে দূরীভূত হয় মহাকাশের একটি স্বাভাবিক সীমানা

রয়েছে সেই ধারণা। পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তনের দরুন স্থির তারকাগুলির আকাশে আড়াআড়ি ঘূর্ণন (accross the sky) ছাড়া 'সেগুলির' অবস্থানের কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। এইজন্য স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা হয়েছিল যে ওগুলি আমাদের সূর্যের মতোই বস্তু, তবে তাদের অবস্থান আরো দূরে।

নিউটন বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মহাকর্ষীয় তত্ত্ব অনুসারে তারকাগুলির পরস্পরকে আকর্ষণ করা উচিত। সুতরাং মনে হয়েছিল তারা মূলত গতিহীন থাকতে পারে না। কোনো একটি বিন্দুতে কি তাদের একসঙ্গে পতন হবে না? সে যুগের আর একজন চিন্তানায়ক রিচার্ড বেন্টলীকে (Richard Bentley) ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে একটি পত্রে নিউটন যুক্তি দেখিয়েছিলেন, এ রকম হতে পারত শুধুমাত্র যদি তারকাগুলির সংখ্যা সীমিত হোত এবং তারা যদি স্থানের একটি সীমিত অঞ্চলে বিতরিত (distributed) থাকত। কিন্তু তাঁর যুক্তি ছিল: অন্য দিক থেকে বলা যায়– যদি তারকার সংখ্যা অসীম হয়, তারা যদি সীমাহীন স্থানে কমবেশী সমরূপে বিতরিত (distributed) থাকে, তা হলে এ রকম হবে না। কারণ, পতিত হওয়ার মতো কোনো কেন্দ্রবিন্দু থাকবে না।

অসীমত্ব নিয়ে বলতে গেলে কি রকম ভুল হতে পারে এই যুক্তি তার একটা দৃষ্টান্ত। একটি অসীম মহাবিশ্বে প্রতিটি বিন্দুকেই একটি কেন্দ্র বলা যেতে পারে। তার কারণ প্রতিটি বিন্দুরই সর্বদিকে অসীম সংখ্যক তারকা থাকবে। অনেক পরে বোঝা গিয়েছিল নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গি হবে শুধু সীমিত পরিস্থিতির বিচার করা। সেই পরিস্থিতিতে তারকাগুলি পরস্পরের উপর পতিত হবে। তারপর প্রশ্ন করা উচিত এই অঞ্চলের বাইরে যদি মোটামুটি সমরূপে বিতরিত আরো অনেক তারকাকে যোগ করা যায়, তা হলে কি পরিবর্তন হতে পারে। নিউটনের বিধি অনুসারে বাড়তি তারকাগুলি মূল তারকাগুলির ব্যাপারে গড়ে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করবে না। সুতরাং তারকাগুলি একই দ্রুতিতে পতিত হবে। আমরা যত খুশী তারকা যোগ করতে পারি। তবুও তারা সর্বদা নিজেদের উপরে (but they will always collapse in on themselves) পতিত হয়ে চুপসে যাবে। এখন আমরা জানি মহাবিশ্বের এমন একটি স্থির প্রতিরূপ অসম্ভব যে প্রতিরূপে মহাকর্ষ সব সময়ই আকর্ষণ করে।

বিংশ শতাব্দীর আগেকার চিন্তা জগতের আবহাওয়া সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় ব্যাপার হল কেউই মহাবিশ্ব বিস্তৃত হচ্ছে কিম্বা সঙ্কুচিত হচ্ছে এ রকম প্রস্তাব উত্থাপন করেন নি। সাধারণত মেনে নেওয়া হয়েছিল, হয় মহাবিশ্ব চিরকালই অপরিবর্তিত অবস্থায় বর্তমান ছিল, নয়তো কোনো এক সীমিত কালে আমরা মহাবিশ্বকে যে রূপে দেখছি, মোটামুটি সেরূপেই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল। অংশতঃ এর কারণ, লোকে চিরন্তন সত্য বিশ্বাস করতে চাইত, তাছাড়া নিজেরা বৃদ্ধ হয়ে মরে গেলেও মহাবিশ্ব চিরন্তন ও অপরিবর্তনশীল– এই চিন্তায় তাঁরা সান্ত্বনা পেতেন।

এমন কি যাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে নিউটনের মহাকর্ষীয় তত্ত্ব থেকে বোঝা যায় মহাবিশ্ব স্থিতাবস্থায় থাকতে পারে না, তাঁরাও মহাবিশ্ব প্রসারমান এ রকম প্রস্তাবনা করেন নি। বরং তাঁরা মহাকর্ষীয় তত্ত্বের পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন, অত্যন্ত বেশী দূরত্বে মহাকর্ষ বিকর্ষণ করে। এর ফলে গ্রহগতি সম্পর্কে তাঁদের পূর্বাভাসে

বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি। বরং অসীমভাবে বিতরিত তারকাগুলির ভারসাম্যের অবস্থা অনুমোদন করেছেন। এর কারণ, নিকটতর তারকাগুলির আকর্ষণবল এবং দূরতর তারকাগুলির বিকর্ষণবল ভারসাম্য রক্ষা করে। কিন্তু এখন আমরা বিশ্বাস করি এ রকম ভারসাম্য হবে অস্থির। কোনো একটি অঞ্চলে তারকাগুলি যদি পরস্পরের সামান্য নিকটতর হয় তা হলে তাদের অন্তর্বর্তী আকর্ষণী বলগুলি শক্তিশালী হবে এবং বিকর্ষণী বলের উপর প্রভুত্ব করবে। সুতরাং তারকাগুলি পরস্পরের প্রতি পড়তেই থাকবে। আবার অন্যদিকে তারকাগুলি যদি সামান্য দূরতর হয় তা হলে বিকর্ষণবল প্রভুত্ব করবে এবং তারা পরস্পর থেকে দূরতর হতেই থাকবে।

অসীম স্থির মহাবিশ্ব সম্পর্কে আর একটি আপত্তি সাধারণত আরোপ করা হয় জার্মান দার্শনিক হাইনরিখ ওলবারসের (Heinrich Olbers) উপরে। তিনি এই তত্ত্ব সম্পর্কে লিখেছিলেন ১৮২৩ সালে। আসলে নিউটনের সমসাময়িক অনেকেই এই সমস্যা উত্থাপন করেছিলেন। এমন কি ওলবারসের প্রবন্ধটি এর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুক্তিপূর্ণ প্রথম প্রবন্ধ নয় কিন্তু এটাই প্রথমে বহুলোকের নজরে এসেছিল। মুশকিল হল, একটি অসীম স্থির মহাবিশ্বে দৃষ্টির প্রতিটি রেখাই একটি তারকার পৃষ্ঠে গিয়ে শেষ হবে। সুতরাং আশা করা যাবে রাত্রিতেও সমস্ত আকাশ সূর্যের মতো উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এর বিরুদ্ধে ওলবারসের যুক্তি ছিল দূরতর তারকা থেকে নির্গত আলোক অন্তর্বর্তী পদার্থের শোষণের ফলে ক্ষীণতর হবে। কিন্তু এরকম যদি ঘটে তা হলে শেষ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী পদার্থও এমন উত্তপ্ত হবে যে সেগুলি তারকার মতো তাপোদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে। সে ক্ষেত্রে রাতের আকাশের সম্পূর্ণটাই সূর্যপৃষ্ঠের মতো উজ্জ্বল হবে। এই সিদ্ধান্ত এড়াবার একমাত্র উপায় এই অনুমান করা যে তারকাগুলি চিরকালই ভাস্বর নয়, তার ভাস্বরতা অতীতের কোনো সীমিত কালে শুরু হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিশোষণকারী পদার্থ হয়তো এখনো উত্তপ্ত হয়ে ওঠেনি, কিম্বা হয়তো সুদূরের তারকাগুলি থেকে আলোক এখনো আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় নি। এর ফলে আর একটি প্রশ্ন আমাদের কাছে উপস্থিত হয়, সেটা হল তারাগুলি প্রথম জ্বলল কি করে?

অবশ্য এর অনেক আগেই মহাবিশ্বের শুরু নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কয়েকটি আদিম সৃষ্টিতত্ত্ব এবং ইহুদী/খ্রীশ্চান/মুসলিম ঐতিহ্য অনুসারে মহাবিশ্বের শুরু একটি সীমিত অতীত কালে এবং সে কাল খুব সুদূর অতীতে নয়। এই রকম একটা শুরুর সপক্ষে ছিল এই বোধ যে মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য একটি "প্রথম কারণ (first cause)" প্রয়োজন। (মহাবিশ্বের ভিতরে আপনি সব সময়ই একটি ঘটনার ব্যাখ্যা হিসাবে অন্য একটি পূর্বতন ঘটনাকে কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন। কিন্তু মহাবিশ্বের নিজের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করার একমাত্র উপায় হল তারও একটা শুরু আছে এই অনুমান)। সেন্ট অগাস্টিন তাঁর বই দি সিটি অব গড্ (The City of God– ঈশ্বরের নগর) -এ আর একটি যুক্তি উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখালেন, সভ্যতার প্রগতি হচ্ছে এবং কোন কাজ কে করেছিলেন এবং কোন প্রযুক্তি কার দ্বারা বিকাশ লাভ করেছিল সেটা আমাদের মনে থাকে। সুতরাং মানুষ এবং হয়তো মহাবিশ্বেরও অস্তিত্ব খুব বেশী দিনের নয়। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কীয় পুস্তক (Book of Genesis) অনুসারে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগে। সেন্ট অগাস্টিন (St. Augustine) এ তথ্য

মেনে নিয়েছেন। (আকর্ষণীয় ব্যাপার হল এই তারিখ এবং দশ হাজার বছর আগেকার শেষ তুষার যুগের সমাপ্তি খুব বেশী দূরবর্তী নয়। প্রত্নতত্ত্ববিদরা বলেন, সভ্যতার সত্যিকারের শুরু সে সময় থেকেই।)

অন্যদিকে অ্যারিস্টোটল এবং গ্রীক দার্শনিকদের অধিকাংশই সৃষ্টি সম্পর্কীয় ধারণা পছন্দ করতেন না। কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাগবত হস্তক্ষেপ বড় বেশী রয়েছে। সেইজন্য তাঁরা বিশ্বাস করতেন, মানবজাতি এবং তার চারপাশের বিশ্ব চিরকাল ছিল এবং থাকবে। প্রাচীনরা প্রগতি সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত যুক্তিগুলি আগেই বিচার করেছেন। তাঁদের উত্তর ছিল মাঝে মাঝেই বন্যা কি ঐ রকম কোনো বিপর্যয় ঘটেছে এবং মানবজাতিকে বারবার পিছনে ঠেলে সভ্যতার একেবারে শুরুতে নিয়ে গিয়েছে।

কালে মহাবিশ্বের কোনো শুরু ছিল কিনা এবং মহাবিশ্ব স্থানে সীমিত কিনা এ বিষয়ে পরবর্তীকালে দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট ১৭৮১ সালে প্রকাশিত তাঁর মহান (এবং অতি দুর্বোধ্য) গ্রন্থ ক্রিটিক অব্ পিওর রিজন্-এ (Critique of Pure Reason) বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। প্রশ্নগুলিকে তিনি বিশুদ্ধযুক্তির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ (অর্থাৎ বিরোধাভাস) বলেছেন। তার কারণ মহাবিশ্বের একটা আরম্ভ রয়েছে এ তত্ত্ব বিশ্বাস করার সপক্ষে যেমন দৃঢ় যুক্তি রয়েছে তেমন দৃঢ় যুক্তি রয়েছে মহাবিশ্ব চিরকালই ছিল এই তত্ত্বের সপক্ষে। তত্ত্বের সপক্ষে তাঁর যুক্তি ছিল মহাবিশ্বের যদি কোনো আরম্ভ না থেকে থাকে, তা হলে যে কোনো ঘটনার পূর্বেই একটা অসীম কাল থাকা উচিত। তাঁর মতে এটা অসম্ভব। বিরোধী যুক্তির সপক্ষে যুক্তি; মহাবিশ্বের যদি শুরু থেকে থাকে, তাহলে তার পূর্বে একটা অসীম কাল ছিল। তাই যদি হয়, তাহলে একটি বিশেষ সময়ে মহাবিশ্বের আরম্ভ কেন হবে? তত্ত্বের সপক্ষে এবং তার বিরোধী তত্ত্বের সপক্ষে যুক্তিগুলি আসলে একই। দুটোরই ভিত্তি তার অব্যক্ত অনুমান: মহাবিশ্ব চিরকাল থাকুক কিম্বা না থাকুক কাল চিরন্তন ভাবে অতীতে রয়েছে। এরপর আমরা দেখব, মহাবিশ্বের আরম্ভের আগে কাল সম্পর্কীয় কল্পন অর্থহীন। এটা প্রথম দেখিয়েছিলেন সেন্ট অগাস্টিন। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে ঈশ্বর কি করছিলেন, অগাস্টিন তখন উত্তর দেন নি: এই ধরনের প্রশ্ন যাঁরা করেন তিনি তাঁদের জন্য তৈরী করছিলেন নরক। তার বদলে তাঁর উত্তর ছিল মহাবিশ্বের কাল ঈশ্বরসৃষ্ট। মহাবিশ্বের আরম্ভের আগে কালের অস্তিত্ব ছিল না।

যখন অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস ছিল মহাবিশ্ব মূলত স্থির এবং অপরিবর্তনশীল তখন মহাবিশ্বের আরম্ভ ছিল কি ছিল না– এ প্রশ্ন আসলে ছিল অধিবিদ্যা (metaphysics) এবং ধর্মতত্ত্বের (theology)। যা পর্যবেক্ষণ করা হয় তার দুরকম ব্যাখ্যাই অতি সুষ্ঠুভাবে দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ মহাবিশ্বের অস্তিত্ব চিরকালই ছিল– এই তত্ত্বের ভিত্তিতে; কিম্বা একটি সীমিতকালে মহাবিশ্বকে এমনভাবে চালু করা হয়েছে যার ফলে মনে হয় মহাবিশ্বের অস্তিত্ব চিরকালই ছিল– এই তত্ত্বের ভিত্তিতে। কিন্তু ১৯২৯ সালে এডুইন হাবল (Edwin Hubble) একটি যুগনির্দেশক (land mark) পর্যবেক্ষণ করেন। সেটা হল, যে দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করবেন, সে দিকেই দেখা যাবে সুদূরের নীহারিকাগুলি আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অন্য ভাষায় বলা চলে মহাবিশ্ব প্রসারমান। এর অর্থ হল অতীতযুগে বস্তুপিণ্ডগুলি পরস্পরের নিকটতর

ছিল। আসলে মনে হয়েছিল দশ কিম্বা কুড়ি হাজার মিলিয়ান (১০,০০,০০০) বছর আগে সবগুলি নীহারিকা একই জায়গায় ছিল সুতরাং সে সময় মহাবিশ্বের ঘনত্ব ছিল অসীম। এই আবিষ্কার শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বের আরম্ভের প্রশ্নকে বিজ্ঞানের এলাকায় নিয়ে আসে।

হাবলের পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হয় একটা কাল ছিল যার নাম দেওয়া হয়েছে বৃহৎ বিস্ফোরণ (big bang)। তখন ছিল অসীমক্ষুদ্র মহাবিশ্ব (infinitesimally) এবং তার ঘনত্বও ছিল অসীম। এই রকম অবস্থায় বিজ্ঞানের সব বিধিই ভেঙে পড়ে। সুতরাং ভেঙে পড়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা। এর পূর্বকালে যদি কোনো ঘটনা ঘটে থাকে, তা হলে বর্তমান কালে যে ঘটনাগুলি ঘটেছে, সে ঘটনাগুলিকে তারা প্রভাবিত করতে পারে না। তাদের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করা যেতে পারে, কারণ পর্যবেক্ষণের উপর তার কোনো প্রভাব থাকবে না। বলা যেতে পারে বৃহৎ বিস্ফোরণের সময় (big bang) কালের শুরু। অর্থাৎ পূর্বতন কালের কোনো সংজ্ঞা দেওয়া যাবে না। বেশ দৃঢ়ভাবে এ কথা বলা উচিত যে, কালের আরম্ভ সম্পর্কে আগে যা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য। পরিবর্তনহীন মহাবিশ্বে আরম্ভ এমন একটা জিনিষ যা মহাবিশ্ব বহির্ভূত কোনো সত্তা আরোপ করেছে। এই আরম্ভের কোনো ভৌত প্রয়োজনীয়তা নেই। কল্পনা করা যেতে পারে আক্ষরিক অর্থে অতীতের যে কোনো কালে ঈশ্বর মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। অন্যদিকে, মহাবিশ্ব যদি বিস্তারমান হয় তা হলে আরম্ভ কেন থাকবে তার একটা ভৌত কারণ থাকতে পারে। তবুও কল্পনা করা যেতে পারে বৃহৎ বিস্ফোরণের মুহূর্তে ঈশ্বর মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। কিম্বা সৃষ্টি করেছেন বৃহৎ বিস্ফোরণের পরে। কিন্তু এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যেন মনে হয় একটা বৃহৎ বিস্ফোরণ হয়েছিল। তবে বৃহৎ বিস্ফোরণের আগে সৃষ্টি হয়েছিল এ রকম অনুমান করা হবে অর্থহীন। প্রসারমান মহাবিশ্ব স্রষ্টাকে অস্বীকার করে না। কিন্তু সম্ভবত করে তিনি কাজটি করেছেন তার উপর একটা সময়সীমা আরোপ করে।

মহাবিশ্বের চরিত্র সম্পর্কে বলতে হলে এবং মহাবিশ্বের শুরু কিম্বা শেষ আছে কিনা এই সমস্ত প্রশ্ন আলোচনা করতে হলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কাকে বলে সে সম্পর্কে আপনার একটা স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। সাধারণ সরল মানুষ যা মনে করেন সেটা হল— তত্ত্ব মহাবিশ্বের একটা প্রতিরূপ (model), কিম্বা প্রতিরূপ মহাবিশ্বের একটা সীমিত অংশের এবং আমরা যা পর্যবেক্ষণ করছি, তার সঙ্গে প্রতিরূপের পরিমাণগুলিকে সম্পর্কযুক্ত করে এ রকম কতগুলি নিয়ম। আমি এই দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিচ্ছি। এর অস্তিত্ব শুধুমাত্র আমাদের মনে। তার অন্য কোনো বাস্তবতা নেই (এর অর্থ যাই হোক না কেন)। একটা তত্ত্বকে ভাল তত্ত্ব বলা যেতে পারে যদি সে তত্ত্ব দুটি প্রয়োজন সিদ্ধ করে: যে প্রতিরূপে কয়েকটি মাত্র যাদৃচ্ছিক (arbitrary) উপাদান রয়েছে তার ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণের একটা বিরাট শ্রেণীকে নির্ভুলভাবে অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ পর্যবেক্ষণফল সম্পর্কেও তাকে নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই করতে হবে। উদাহরণ— অ্যারিস্টোটলের তত্ত্ব: সব জিনিষই ক্ষিতি (earth), মরুৎ (air), অগ্নি (fire) এবং অপ্ (water)-- এই কটি উপাদান দিয়ে গঠিত। এ তত্ত্বের সারল্য অনুমোদনের উপযুক্ত ছিল। কিন্তু এ তত্ত্ব কোনো নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেনি। অন্যদিকে নিউটনের মহাকর্ষীয় তত্ত্বের ভিত্তি ছিল সরলতর। এ তত্ত্ব অনুসারে বস্তুপিণ্ডগুলি পরস্পরকে

একটি বল দ্বারা আকর্ষণ করে। সে বল তাদের ভর (mass) নামক একটি পরিমাণের আনুপাতিক (proportional) এবং তাদের পারস্পরিক দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত আনুপাতিক (inversely proportional)। কিন্তু তবুও এ তত্ত্ব চন্দ্র, সূর্য এবং গ্রহগুলির গতি সম্পর্কে অতি উচ্চমানের নির্ভুলতা সম্পন্ন ভবিষ্যদ্বাণী করে।

যে কোনো ভৌততত্ত্ব সব সময়ই সাময়িক (provisional)। এর অর্থ হল, এটা একটি প্রকল্প মাত্র। আপনি কখনোই একে প্রমাণ করতে পারেন না। একটি তত্ত্বকে পরীক্ষার ফল যতবারই সত্য প্রমাণিত করুক না কেন পরের পরীক্ষার ফল যে তত্ত্বকে সত্য প্রমাণিত করবে, তত্ত্বের বিরুদ্ধে যাবে না— এ সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন না। অন্য দিকে, তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীর বিরোধী একটি মাত্র পর্যবেক্ষণও তত্ত্বকে অপ্রমাণ করতে পারে। বিজ্ঞানের দর্শনের দার্শনিক কার্ল পপার (Karl Popper) জোরের সঙ্গেই বলেছেন, একটি ভাল তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হল যে, সে তত্ত্ব এমন কতগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করবে যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি নীতিগতভাবে অপ্রমাণ কিম্বা মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব হবে। যতবারই নতুন পরীক্ষায় দেখা যায় পর্যবেক্ষণ মূলক ফলের সঙ্গে তত্ত্বের মতৈক্য রয়েছে, তত্ত্ব ততবারই বেঁচে থাকে এবং তত্ত্বে আমাদের বিশ্বাসও বাড়ে। কিন্তু যদি কখনো কোনো নতুন পর্যবেক্ষণে দেখা যায়— এ মতৈক্য নেই, তা হলে তত্ত্বটিকে হয় পরিত্যাগ করতে হবে নয়তো তার পরিবর্তন করতে হবে। অন্তত পক্ষে এই রকমই হবে বলে অনুমান করা যায়। কিন্তু যিনি পর্যবেক্ষণ করছেন তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে আপনি সব সময়ই প্রশ্ন করতে পারেন।

কার্যক্ষেত্রে যা ঘটে তা হল: যে নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করা হয় সেটা আসলে পুরাতন তত্ত্বেরই বিকৃতি। উদাহরণ: বুধগ্রহ নিয়ে অত্যন্ত নির্ভুল পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেল নিউটনের মহাকর্ষীয় তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে বুধগ্রহের গতির সামান্য পার্থক্য রয়েছে। আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদ গতি সম্পর্কে নিউটনের তত্ত্বের চাইতে সামান্য পৃথক একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। আইনস্টাইন যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার সঙ্গে পর্যবেক্ষণলব্ধ ফল মিলে গেল। কিন্তু নিউটনের তত্ত্বের সঙ্গে মিলল না। এটাই ছিল নতুন তত্ত্ব মেনে নেওয়ার একটা প্রামাণ্য কারণ। আমরা কিন্তু ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে নিউটনের তত্ত্ব এখনো প্রয়োগ করি। তার কারণ, সাধারণত আমরা যে সব ক্ষেত্রে কাজ করি সে সমস্ত ক্ষেত্রে নিউটনীয় তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী এবং ব্যাপক অপেক্ষবাদের ভবিষ্যদ্বাণীর ভিতরে পার্থক্য সামান্যই (নিউটনের তত্ত্বের আর একটি বিরাট সুবিধা হল আইনস্টাইনের তত্ত্ব নিয়ে কাজ করার চাইতে নিউটনের তত্ত্ব নিয়ে কাজ করা অনেক সহজ)।

বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য হল এমন একটি তত্ত্ব দান করা যে তত্ত্ব সম্পূর্ণ মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকরা যে পথ গ্রহণ করেন সেটা হল সমস্যাকে দুটো ভাগে ভাগ করা। প্রথমত, কালের সঙ্গে মহাবিশ্বের কি রকম পরিবর্তন হয় সে সম্পর্কে একাধিক বিধি (law) রয়েছে (আমরা যদি জানি একটি বিশেষ কালে মহাবিশ্ব কি রকম দেখায়, তা হলে পরবর্তী যে কোনো কালে মহাবিশ্ব কি রকম দেখাবে সেটাও ঐ ভৌত বিধিগুলি আমাদের বলে দেবে)। দ্বিতীয়ত, রয়েছে মহাবিশ্বের প্রারম্ভিক অবস্থার প্রশ্ন। অনেকে মনে করেন, বিজ্ঞানের শুধু প্রথম অংশটা নিয়েই চিন্তা করা উচিত। তাঁদের ধারণা, প্রারম্ভিক

অবস্থার প্রশ্নটা অধিবিদ্যা (metaphysics) কিম্বা ধর্মের (religion) বিষয়। তাঁরা বলবেন ঈশ্বর সর্বশক্তিমান (omnipotent)। তিনি ইচ্ছে করলে যেভাবে খুশী মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে পারতেন। তা হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তিনি মহাবিশ্বকে সম্পূর্ণ যাদৃচ্ছিক (arbitrary) পদ্ধতিতেও বিকশিত করতে পারতেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মহাবিশ্বকে তিনি বেশ নিয়মবদ্ধ ভাবে কতগুলি বিশেষ বিধি (law) অনুসারে বিকশিত করেছিলেন। সুতরাং মনে হয় প্রারম্ভিক অবস্থার নিয়ামক বিধির অস্তিত্ব অনুমান করাও একই রকম যুক্তিসঙ্গত।

দেখা যায় একবারে মহাবিশ্বের বিবরণ দেওয়ার মতো একটা তত্ত্ব উদ্ভাবন করা খুব শক্ত। তার বদলে আমরা সমস্যাটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে নিই এবং কতগুলি আংশিক তত্ত্ব আবিষ্কার করি। এই আংশিক তত্ত্বগুলির প্রতিটি, সীমিত শ্রেণীর কয়েকটি পর্যবেক্ষণ ফলের বিবরণ দান করে এবং সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে। এ তত্ত্ব অন্য পরিমাণগুলির (quantities) চিন্তাকে অগ্রাহ্য করে কিম্বা কয়েকটি সরল সংখ্যাগুচ্ছকে সেগুলির প্রতিনিধি হিসাবে স্থাপন করে। হতে পারে এ পথ সম্পূর্ণ ভুল। মহাবিশ্বের প্রতিটি জিনিসই যদি প্রতিটি জিনিসের উপরে মূলগতভাবে নির্ভরশীল হয়, তা হলে সমস্যার অংশগুলি সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন ভাবে অনুসন্ধান করলে সম্পূর্ণ সমাধানের নিকটবর্তী হওয়া হয়তো অসম্ভব হতে পারে। তবুও অতীতে আমাদের যে প্রগতি হয়েছে, নিশ্চিতভাবে সেটা এই পদ্ধতিতে। এ বিষয়ে একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল নিউটনের মহাকর্ষীয় বিধি। এ তত্ত্ব আমাদের বলে, দুটি বস্তুপিণ্ডের অন্তর্বর্তী মহাকর্ষীয় বল প্রতিটি বস্তুপিণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত একটি সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। সেটা হল তার ভর। কিন্তু বস্তুপিণ্ডগুলি কি উপাদান নিয়ে গঠিত তার সঙ্গে এ বল সম্পর্কহীন। সুতরাং তাদের কক্ষ গণনার জন্য সূর্য এবং গ্রহগুলির গঠন এবং উপাদান সম্পর্কে কোনো তত্ত্বের প্রয়োজন হয় না।

আজকাল বৈজ্ঞানিকরা দুটি মূলগত আংশিক তত্ত্বের সাহায্যে মহাবিশ্বের বিবরণ দান করেন : ব্যাপক অপেক্ষবাদ এবং কোয়ান্টাম মেকানিকস্ (কণাবাদী বলবিদ্যা)। এ দুটি তত্ত্ব এ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নিরাট বৌদ্ধিক কৃতিত্ব। ব্যাপক অপেক্ষবাদ মহাকর্ষীয় বল এবং মহাবিশ্বের বৃহৎ মানের (large scale) গঠন সম্পর্কে বিবরণ দান করে, অর্থাৎ, যে গঠনের মাপ মাত্র কয়েক মাইল থেকে শুরু করে মিলিয়ান মিলিয়ান মিলিয়ান মিলিয়ান (১-এর পিঠে চব্বিশটা শূন্য) মাইল পর্যন্ত। শেষেরটা হল পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের মাপ। অন্যদিকে কণাবাদী বলবিদ্যার কাজকর্ম যদি ক্ষুদ্র মানের পরিঘটনা (extremely small scale) নিয়ে। যথা, এক ইঞ্চির এক মিলিয়ন ভাগের এক মিলিয়ান ভাগ। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা জানি এই দুটি তত্ত্বের পারস্পরিক অসঙ্গতি রয়েছে। দুটো তত্ত্বই নির্ভুল হতে পারে না। আধুনিক পদার্থবিদ্যার একটি প্রধান প্রচেষ্টা এবং এ বইয়ের একটি প্রধান বক্তব্য এমন একটি তত্ত্ব অনুসন্ধান করা যার ভিতরে দুটো তত্ত্বই থাকবে— মহাকর্ষ সম্বন্ধীয় কোয়ান্টাম তত্ত্ব। এ রকম তত্ত্ব এখনো আমাদের নেই। হয়তো এরকম তত্ত্বে পৌঁছাতে আমাদের বহু দেরী। কিন্তু এই তত্ত্বের কি কি গুণ থাকা আবশ্যিক হবে তার অনেকটাই আমরা এখন জানি। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখব মহাকর্ষ সম্পর্কীয় কোয়ান্টাম তত্ত্বের কি কি ভবিষ্যদ্বাণী করা অবশ্যিক হবে তার অনেকটাই আমাদের জানা।

আপনি যদি বিশ্বাস করেন, মহাবিশ্ব যাদৃচ্ছিক নয় এবং সুনিশ্চিত কতগুলি বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাহলে শেষ পর্যন্ত আংশিক তত্ত্বগুলিকে একত্রিত করে একটি ঐক্যবদ্ধ সম্পূর্ণ তত্ত্ব গড়তে হবে এবং সে তত্ত্ব মহাবিশ্বের সবটারই বিবরণ দান করবে। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ সম্পূর্ণ তত্ত্বের অনুসন্ধানের ব্যাপারে একটা মূলগত স্ববিরোধিতা (paradox) রয়েছে। উপরে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কে যে সমস্ত ভাবধারার সত্তা দেওয়া হয়েছে, তাতে অনুমান করে নেওয়া হয়েছে আমরা যুক্তিবাদী জীব। আমাদের ইচ্ছামতো পর্যবেক্ষণের স্বাধীনতা রয়েছে এবং যা পর্যবেক্ষণ করছি তা থেকে যৌক্তিক অবরোহী সিদ্ধান্ত (logical deduction) নেওয়ারও স্বাধীনতা আমাদের রয়েছে। এরকম একটা পরিকল্পনায় আমাদের মহাবিশ্ব পরিচালনা সম্পর্কীয় বিধিগুলি ক্রমশ নিকটতর হওয়ার দিকে অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে, এ রকম অনুমান যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু সত্যই যদি একটা ঐক্যবদ্ধ সম্পূর্ণ তত্ত্ব থাকে তা হলে সে তত্ত্ব আমাদের কার্যক্রমও নির্ধারণ করবে। সুতরাং, সে তত্ত্ব নিজেই আমাদের সেই তত্ত্ব অনুসন্ধানের ফলাফল নির্ধারণ করবে। সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে যে আমরা সঠিক সিদ্ধান্তই নেব, এ তত্ত্ব কেন সেটা নির্ধারণ করবে? একই ভাবে সে তত্ত্ব কি সাক্ষ্য থেকে আমাদের ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে একই রকম ভাবে সাহায্য করতে পারে না? কিম্বা কোনো সিদ্ধান্তেই না পৌঁছাতে?

এই সমস্যার আমি একটাই সমাধান করতে পারি। সে সমাধানের ভিত্তি ডারউইনের স্বাভাবিক নির্বাচন সম্পর্কীয় নীতি (principle of natural selection)। চিন্তনটা হল : স্বতত বংশরক্ষণকারী যে কোনো জীবগোষ্ঠীর ভিতর বিভিন্ন ব্যক্তির জেনেটিক পদার্থ (genetic material) এবং লালন পালনে নানা পার্থক্য হবে। এই পার্থক্যের অর্থ হবে কিছু ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিদের তুলনায় তাদের চতুষ্পার্শ্বের জগৎ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং সেই অনুসারে কাজ করতে পারবে অনেক ভাল ভাবে। এই সমস্ত ব্যক্তির বেঁচে থাকা এবং বংশবৃদ্ধি করার সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং তাদের আচরণ এবং চিন্তার ধরন আধিপত্য করবে। আমরা যাকে বুদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বলি সেগুলি বেঁচে থাকার পক্ষে একটা সুবিধা বহন করছে এ তথ্য অতীত সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে সত্য। ব্যাপারটা এখনও একই রকম রয়েছে কিনা সেটা স্পষ্ট নয়। আমাদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি হয়তো আমাদের সবাইকে ধ্বংস করতে পারে। তারা যদি ধ্বংস নাও করে তবুও একটি ঐক্যবদ্ধ সম্পূর্ণ তত্ত্ব আমাদের বাঁচার সম্ভাবনার ব্যাপারে খুব একটা পার্থক্য সৃষ্টি না করতে পারে। কিন্তু মহাবিশ্ব যদি নিয়মানুসারে বিবর্তিত হয়ে থাকে তা হলে আমরা আশা করতে পারি স্বাভাবিক নির্বাচনের ফলে আমরা যে যৌক্তিক ক্ষমতা লাভ করেছি, সে ক্ষমতার অস্তিত্ব এবং কর্মক্ষমতা আমাদের ঐক্যবদ্ধ সম্পূর্ণ তত্ত্বের অনুসন্ধানের সময়ও থাকবে এবং আমাদের ভুল সিদ্ধান্তের পথে নিয়ে যাবে না।

আমাদের যে আংশিক তত্ত্বগুলি রয়েছে, সেগুলি অতি চরম ক্ষেত্রগুলি ছাড়া অন্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করার পক্ষে যথেষ্ট। সেইজন্য ব্যবহারিক কারণে মহাবিশ্ব সম্পর্কে চরম তত্ত্বের অনুসন্ধানের যুক্তি খুঁজে পাওয়া মুশকিল (যদিও এ কথা স্মরণ করা উচিত যে অপেক্ষবাদ এবং কণাবাদী বলবিদ্যার বিরুদ্ধে একই রকম যুক্তি প্রয়োগ করা যেত। কিন্তু এই তত্ত্বগুলিই আমাদের পারমাণবিক শক্তি এবং মাইক্রো-ইলেকট্রনিক বিপ্লব দিয়েছে)। সুতরাং একটা ঐক্যবদ্ধ সম্পূর্ণ তত্ত্ব আবিষ্কার আমাদের প্রজাতিকে বাঁচতে সাহায্য নাও করতে

পারে। এমন কি, এ তত্ত্ব আমাদের জীবন যাত্রার ধরনের উপরেও কোনো প্রভাব বিস্তার না করতে পারে। কিন্তু সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ বিভিন্ন ঘটনাকে অসংযুক্ত এবং ব্যাখ্যার অতীত ভেবে সন্তুষ্ট হয় নি। মানুষ আকাঙ্ক্ষা করেছে পৃথিবীর অন্তর্নিহিত নিয়ম বুঝতে। এখনো আমরা জানতে চাই কেন আমরা এখানে এসেছি এবং কোত্থেকে এখানে এসেছি? জ্ঞানের জন্য মানুষের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা অবিচ্ছিন্ন অনুসন্ধানের সপক্ষে যুক্তি হিসাবে যথেষ্ট। এবং আমাদের সর্বনিম্ন আকাঙ্ক্ষা হল, যে মহাবিশ্বে আমরা বাস করি তার সম্পূর্ণ বিবরণ।

২

স্থান এবং কাল

(Space and Time)

বস্তুপিণ্ডগুলির গতি সম্পর্কে আমাদের আধুনিক ধারণার সূত্রপাত গ্যালিলিও এবং নিউটন থেকে। তার আগে লোকে বিশ্বাস করত অ্যারিস্টোটলকে। তিনি বলেছিলেন, বস্তুপিণ্ডের স্বাভাবিক অবস্থা স্থিতি এবং সে গতিশীল হয় শুধুমাত্র কোনো বল বা ঘাতের (impulse) দ্বারা। এ মতের ফলশ্রুতি হল একটি হাল্কা বস্তুপিণ্ডের তুলনায় একটি ভারি বস্তুপিণ্ডের পতন দ্রুততর হবে। তার কারণ পৃথিবীর প্রতি তার আকর্ষণ বেশী।

এ ছাড়াও অ্যারিস্টোটলের ঐতিহ্য বলে, বিশুদ্ধ চিন্তার সাহায্যেই মহাবিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারী সমস্ত বিধি (law) গঠন করা সম্ভব। পর্যবেক্ষণের সাহায্যে ব্যাপারটা মিলিয়ে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। সুতরাং, গ্যালিলিওর পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন ওজনের বস্তুপিণ্ডগুলির গতিবেগ বিভিন্ন কিনা— সেটা দেখার জন্য কেউ ব্যস্ত হয় নি। কথিত আছে পিসার হেলানো স্তম্ভ থেকে একাধিক ওজন ফেলে গ্যালিলিও প্রমাণ করেছিলেন অ্যারিস্টোটলের ধারণা ভুল। কাহিনীটা যে অসত্য সেটা প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু গ্যালিলিও এই ধরনের একটা কিছু করেছিলেন। তিনি একটি ঢালু মসৃণ পথে বিভিন্ন ওজনের বল গড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরিস্থিতিটা ভারি বস্তুপিণ্ডের উল্লম্বভাবে (vertically) পতনের মতো। কিন্তু ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করা সহজতর, তার কারণ গতিবেগ তুলনায় কম। গ্যালিলিওর মাপনে দেখা গেল ওজন যাই হোক না কেন প্রতিটি বস্তুপিণ্ডেরই দ্রুতি (speed) এক রকম। উদাহরণ, একটি বলের ওজন যাই হোক না কেন সেটাকে যদি এখন একটি ঢালু পথে ছেড়ে দেওয়া হয়, যার ঢাল প্রতি দশ মিটারে এক মিটার তা হলে এক সেকেণ্ডের পর বলটির দ্রুতি (speed) সেকেণ্ডে এক মিটার হবে, দ্বিতীয় সেকেণ্ডের পর দ্রুতি হবে প্রতি সেকেণ্ডে দুই মিটার এবং এই রকম চলতে থাকবে।

অবশ্য একটি সীসক নির্মিত ওজন একটি পালকের চাইতে দ্রুত যাবে। কিন্তু তার একমাত্র কারণ পালকটা বাতাসের বাধা পেয়ে মন্দগতি হয়। কিন্তু যদি এমন দুটি বস্তুপিণ্ড নিক্ষেপ করা যায়, যেগুলিকে বাতাস কোনো বাধা দেবে না— যথা ভিন্ন ওজনের দুটি সীসক— তা হলে তাদের পতনের হার হবে একই।

গ্যালিলিওর মাপনগুলিকে নিউটন তাঁর গতির বিধির ভিত্তি করেছিলেন (laws of motion)। গ্যালিলিওর পরীক্ষাগুলিতে একটি বস্তুপিণ্ড যখন ঢালু পথে গড়ায়, তখন তার উপরে একই বল (সেটার ওজন) ক্রিয়া করে এবং তার ক্রিয়া হল বস্তুপিণ্ডটির অবিচ্ছিন্ন দ্রুতি বৃদ্ধি করা। এ থেকে দেখা গেল একটি বলের বাস্তব ক্রিয়া সব সময়ই অবিচ্ছিন্নভাবে একটি বস্তুপিণ্ডের দ্রুতির পরিবর্তন করা। বস্তুপিণ্ডটির গতি শুধু শুরু করাই তার কাজ নয়, যদিও আগে লোকে তাই ভেবেছে। তা ছাড়া এর অর্থ ছিল একটি বস্তুপিণ্ডের উপরে যখন একটি বল ক্রিয়া করে বস্তুপিণ্ডটি তখন ঋজুরেখায় একই দ্রুতিতে চলতে থাকবে। এই ধারণা প্রথম স্পষ্টভাবে বলা হয় ১৬৮৭ সালে প্রকাশিত নিউটনের প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকাকে (Principia Mathematica)। এটা নিউটনের প্রথম বিধি (law) নামে পরিচিত: একটি বস্তুপিণ্ডের উপরে যখন একটি বল ক্রিয়া করে তখন কি হয় সেটা পাওয়া যায় নিউটনের দ্বিতীয় বিধিতে। এই বিধি বলে একটি বস্তুপিণ্ডের ত্বরণ কিম্বা তার দ্রুতির হার বলটির সঙ্গে সমানুপাতিক (উদাহরণ: বল যদি দ্বিগুণ হয়, তা হলে ত্বরণও দ্বিগুণ হবে)। বস্তুপিণ্ডটির ভর (mass—পদার্থের পরিমাণ) যত বেশী হবে ত্বরণও তত কম হবে। (একই বল যদি দ্বিগুণ ভরের বস্তুপিণ্ডের উপর ক্রিয়া করে তা হলে সে বল অর্ধেক ত্বরণ উৎপাদন করবে)। একটি পরিচিত উদাহরণ হল, আধুনিক মোটর গাড়ি। ইঞ্জিন যত শক্তিশালী হবে, ত্বরণও তত বেশী হবে, কিন্তু গাড়িটার ওজন যদি তুলনায় বেশী হয়, তা হলে ইঞ্জিনটা এক থাকলেও ত্বরণ কম হবে।

গতির বিধি ছাড়াও নিউটন আর একটি বিধি আবিষ্কার করেছিলেন। সে বিধি মহাকর্ষীয় বলের বিবরণ দান করে। এই বিধির বক্তব্য হল, প্রতিটি বস্তুপিণ্ডই প্রতিটি অন্য বস্তুপিণ্ডকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বল প্রতিটি বস্তুপিণ্ডের ভরের সমানুপাতিক। সুতরাং যদি বস্তুপিণ্ডগুলির একটির (ধরা যাক, বস্তুপিণ্ড ক) ভর দ্বিগুণিত করা যায়, তা হলে তাদের অন্তর্বর্তী বলও দ্বিগুণ শক্তিশালী হবে। এটাই আশা করা উচিত, কারণ, নতুন বস্তুপিণ্ডকে ভাবা যেতে পারে আগেকার ভর সম্পন্ন দুটি বস্তুপিণ্ড। প্রতিটি বস্তুপিণ্ড খ বস্তুপিণ্ডকে আকর্ষণ করবে আগেকার (original) বলে। সুতরাং ক এবং খ-এর অন্তর্বর্তী মোট বল হবে প্রথম বলের দ্বিগুণ। কিন্তু ধরুন একটি বস্তুপিণ্ডের ভর যদি দ্বিগুণ হয় এবং আর একটি বস্তুপিণ্ডের ভর যদি তিন গুণ হয়, তা হলে বল হবে ছয় গুণ শক্তিশালী। এখন বোঝা যায় কেন সমস্ত বস্তুপিণ্ডগুলির পতনের হার এক। একটি বস্তুপিণ্ডের ওজন দ্বিগুণ হলে যে মহাকর্ষীয় বল তাকে আকর্ষণ করছে সেটা দ্বিগুণ হবে। কিন্তু তার ভরও দ্বিগুণ হবে। নিউটনের দ্বিতীয় বিধি (law) অনুসারে এই দুটি ক্রিয়া পরস্পরকে নির্ভুল ভাবে বাতিল করবে। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে ত্বরণ এক থাকবে।

নিউটনের মহাকর্ষীয় বিধি আরো বলে যে, বস্তুপিণ্ডগুলির দূরত্ব যত বেশী হবে বলও তত কম হবে। নিউটনের মহাকর্ষীয় বিধি অনুসারে একটি তারকার মহাকর্ষীয় আকর্ষণ, অর্ধেক

দূরত্বে অবস্থিত একই রকম আর একটি তারকার আকর্ষণের তুলনায় এক চতুর্থাংশ হবে। এই বিধি পৃথিবী, চন্দ্র এবং বিভিন্ন গ্রহের কক্ষ (orbit) সম্পর্কে অত্যন্ত নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করে। বিধি যদি এমন হোত যে একটি তারকার দূরত্বের সঙ্গে আকর্ষণ আরো দ্রুত হ্রাস পায় তা হলে গ্রহগুলির কক্ষ (orbit) উপবৃত্তাকার (elliptical) না হয়ে সেগুলির পথ হোত সর্পিল এবং তারা সূর্যে পতিত হোত। এগুলির হ্রাসপ্রাপ্তি যদি মন্দতর হোত, তা হলে সুদূরে অবস্থিত তারকাগুলির মহাকর্ষীয় বল পৃথিবীর মহাকর্ষীয় বলের উপর আধিপত্য করত।

অ্যারিস্টোটলের ধারণা এবং নিউটন গ্যালিলিওর ধারণার ভিতরে বড় পার্থক্য হল, অ্যারিস্টোটলের মতে বস্তুপিণ্ডগুলির স্থিতাবস্থাই পছন্দ: তাঁর মতে যে কোনো বস্তুপিণ্ডই স্থিতাবস্থায় থাকবে অবশ্য যদি কোনো বল কিম্বা ঘাত তার উপর ক্রিয়া না করে। বিশেষ করে তিনি ভাবতেন পৃথিবীটা স্থিতিশীল। কিন্তু নিউটনের বিধির ফলশ্রুতি হল, স্থিতির কোনো অনন্য (unique) মান নেই। বলা যেতে পারে বস্তুপিণ্ড ক স্থিতিশীল এবং বস্তুপিণ্ড খ বস্তুপিণ্ড ক সাপেক্ষে একটা স্থির দ্রুতিতে চলমান। কিম্বা বলা যেতে পারে বস্তুপিণ্ড খ স্থিতিশীল এবং বস্তুপিণ্ড ক চলমান। দুটি বিবৃতিই সমভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণ, যদি মুহূর্তের জন্য— পৃথিবীর আবর্তন এবং সূর্যকে ঘিরে তার কক্ষ (orbit) না বিচার করা যায়, তা হলে বলা যেতে পারে পৃথিবী স্থিতিশীল এবং একটি রেলগাড়ী তার উপরে ঘণ্টায় নব্বুই মাইল বেগে উত্তরমুখী চলেছে কিম্বা বলা যেতে পারে ট্রেনটা স্থিতিশীল এবং পৃথিবী ঘণ্টায় নব্বুই মাইল বেগে দক্ষিণ দিকে চলেছে। গাড়িটির ভিতরে যদি কেউ পদার্থবিদ বস্তুপিণ্ড নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, তা হলে দেখবেন নিউটনের বিধিগুলি সে ক্ষেত্রেও সত্য। উদাহরণ: রেলগাড়ীতে যদি কেউ পিং পং খেলেন, তাহলে দেখবেন বলটি নিউটনীয় বিধি মেনে চলছে। রেল লাইনের পাশে অবস্থিত একটি টেবিলের উপর যে রকম হয় ঠিক সেই রকম। সুতরাং, রেলগাড়ীটি চলমান না পৃথিবী চলমান সেটা বলার কোনো উপায় নেই।

স্থিতির পরম মানের (absolute standard) অভাবের অর্থ: দুটি ঘটনা যদি বিভিন্ন কালে ঘটে থাকে তাহলে সে দুটি ঘটনার স্থানিক অবস্থান অভিন্ন কিনা সেটা নির্ধারণ করা যায় না। উদাহরণ: ধরুন আমাদের ট্রেনের ভিতরকার পিং পং বলটা উপর নিচে লাফিয়ে এক সেকেণ্ড পর পর টেবিলের একই বিন্দুতে দুবার ঠোক্কর খেল। রেলরাস্তার উপর যদি কেউ থাকেন তবে তাঁর মনে হবে বলের দুটো ঠোক্কর হয়েছে চল্লিশ ফুটের ব্যবধানে। তার কারণ, দুটি ঠোক্করের মধ্যবর্তী সময়ে ট্রেনটা অতটা দূরত্ব অতিক্রম করত। সুতরাং পরম স্থিতির অনস্তিত্বের অর্থ ছিল একটি ঘটনার স্থানে পরম অবস্থান কারো পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না। অ্যারিস্টোটল কিন্তু ভেবেছিলেন এটা সম্ভব। ট্রেনের একজন লোক সাপেক্ষে এবং রেলরাস্তার উপরের একজন লোক সাপেক্ষে ঘটনাগুলির অবস্থান এবং তার দূরত্ব ভিন্ন ভিন্ন হবে এবং এক জনের অবস্থানের বদলে অন্য জনের অবস্থান গ্রহণ করার কোনো কারণ থাকবে না।

পরম অবস্থান কিম্বা যাকে বলা হয় পরম স্থান— তার এই অনস্তিত্বের জন্য নিউটন খুব উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। তার কারণ তাঁর পরম ঈশ্বর সম্পর্কীয় ধারণার সঙ্গে এ [illegible]

মিল ছিল না। এমন কি তিনি পরম স্থানের অনস্তিত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন, অথচ তাঁর বিধিগুলির ভিতরে এ তথ্য নিহিত ছিল। এই অযৌক্তিক বিশ্বাসের জন্য অনেকেই তাঁর অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। তাঁদের ভিতরে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিশপ বার্কলে (Bishop Berkeley) নামক একজন দার্শনিক। বার্কলের বিশ্বাস ছিল সমস্ত বাস্তব পদার্থ এবং স্থান ও কাল ভ্রমাত্মক (illusion)। বার্কলের মতামত যখন বিখ্যাত ডঃ জনসনকে বলা হয়, তখন তিনি পায়ের অগ্রভাগ দিয়ে একটা বড় পাথরে আঘাত করে বলেছিলেন, "এই মতকে আমি এইভাবেই খণ্ডন করি।"

আরিস্টোটল এবং নিউটন দুজনেই পরম কালে (absolute time) বিশ্বাস করতেন। অর্থাৎ তাঁদের বিশ্বাস ছিল, দুটি ঘটনার অন্তর্বর্তী কাল নিশ্চিতভাবে মাপা সম্ভব; মাপনক্রিয়া যেই করুন না কেন কাল একই থাকবে। অবশ্য যদি তাঁরা একটা ভাল ঘড়ি ব্যবহার করেন। কাল ছিল স্থান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্থাননিরপেক্ষ এবং অধিকাংশ লোকই ভাবেন এই দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণবুদ্ধিসম্মত। কিন্তু আমাদের স্থান এবং কাল সম্পর্কিত ধারণা বদলাতে হয়েছে। আপেল কিম্বা যে সমস্ত গ্রহ তুলনায় ধীরগামী সেগুলির ক্ষেত্রে আমাদের আপাতদৃষ্ট সাধারণ বুদ্ধিজাত ধারণায় কাজ হয়। কিন্তু আলোকের দ্রুতি কিম্বা তার কাছাকাছি দ্রুতির ক্ষেত্রে এ সমস্ত ধারণায় কোনো কাজই হয় না।

আলোক সীমিত কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলাচল করে। ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন ডেনমার্কের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওলে ক্রিস্টেনসেন রোমার (Ole Christensen Roemer)। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, বৃহস্পতির চাঁদগুলি যখন তার পিছনে যাচ্ছে বলে মনে হয় তাদের তখনকার অন্তর্বর্তী সময়গুলি সঠিক সমান নয়। অর্থাৎ চাঁদগুলির যদি বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করার গতির হার স্থির হোত তা হলে যা হওয়া উচিত ছিল তা নয়। পৃথিবী এবং বৃহস্পতি সূর্য প্রদক্ষিণের সময় গ্রহ দুটির পারস্পরিক দূরত্বের পরিবর্তন হয়। রোমার লক্ষ্য করেছিলেন, বৃহস্পতি যত দূরে থাকে, তার চাঁদগুলির গ্রহণও তত দেরীতে দেখা যায়। তাঁর যুক্তি ছিল, এর কারণ— আমরা যখন দূরে অবস্থান করি তখন বৃহস্পতির চাঁদগুলি থেকে আলোক আমাদের কাছে পৌঁছাতে বেশী সময় লাগে। পৃথিবী থেকে বৃহস্পতির দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধি সম্পর্কে তাঁর মাপন কিন্তু খুব বেশী নির্ভুল হয়নি। তাঁর হিসাবে আলোকের দ্রুতি ছিল সেকেণ্ডে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল। এর সঙ্গে আধুনিক মান—সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইলের তুলনা করা যায়। তবুও শুধুমাত্র আলোক সীমিত দ্রুতিতে চলাচল করে এই তথ্য প্রমাণ করাতেই নয়, সেই দ্রুতি মাপনেও রোমারের কৃতিত্ব খুবই উল্লেখযোগ্য। কারণ, নিউটনের প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা প্রকাশের এগারো বছর আগে তিনি এ আবিষ্কার করেছিলেন।

আলোক বিস্তার সম্পর্কে সঠিক তত্ত্ব ১৮৬৫ সালের পূর্বে আবিষ্কৃত হয় নি। সেই সময় ব্রিটিশ পদার্থবিদ জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (James Clerk Maxwell) বিদ্যুৎ এবং চুম্বক সম্পর্কীয় সেই কাল পর্যন্ত প্রচলিত আংশিক তত্ত্বগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হন। ম্যাক্সওয়েলের (Maxwell) সমীকরণগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, সম্মিলিত চুম্বক বিদ্যুতীয় ক্ষেত্রে তরঙ্গের মতো একটি চাঞ্চল্য হওয়া সম্ভব এবং সরোবরের তরঙ্গের মতো সেগুলি

স্থির দ্রুতিতে চলমান হবে। এই তরঙ্গগুলির তরঙ্গদৈর্ঘ্য (একটি তরঙ্গশীর্ষ থেকে পরবর্তী তরঙ্গশীর্ষের দূরত্ব) যদি এক মিটার কিম্বা তার চাইতে বেশী হয় তাহলে আমরা এখন যাকে বেতার তরঙ্গ বলি তার সঙ্গে সেগুলি অভিন্ন। ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলির নাম মাইক্রোওয়েভ (কয়েক সেন্টিমিটার) কিম্বা অবলোহিত (infrared, এক সেন্টিমিটারের দশ হাজার ভাগের এক ভাগের চাইতে বেশী)। দৃশ্যমান আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক সেন্টিমিটারের চল্লিশ মিলিয়ান ভাগ থেকে ৮০ মিলিয়ান ভাগের মাঝামাঝি। এর চাইতে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলির নাম অতিবেগুনী (ultraviolet), রঞ্জন রশ্মি (X-rays) এবং গামা রশ্মি (gamma-rays)।

ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, রেডিও কিম্বা আলোক তরঙ্গগুলি একটি বিশেষ স্থির দ্রুতিতে চলমান হবে। কিন্তু নিউটনীয় তত্ত্ব পরম স্থিতির ধারণা থেকে মুক্ত হয়েছিল। তা হলে যদি অনুমান করা যায়, আলোক একটি স্থির দ্রুতিতে চলাচল করে তাহলে বলতে হবে সেই স্থিরত্বের মাপন কি সাপেক্ষ হবে। সুতরাং অনুমান করা হল 'ইথার' বলে একটি পদার্থ আছে, সেই পদার্থ সর্বত্র বিরাজমান— এমন কি, বিরাজমান 'শূন্য' স্থানেও। শব্দ তরঙ্গ যে রকম বায়ুর ভিতর দিয়ে চলাচল করে, আলোক তরঙ্গেরও সেই রকম ইথারের ভিতর দিয়ে চলাচল করা উচিত। সুতরাং তাদের দ্রুতি হওয়া উচিত ইথার সাপেক্ষ। ইথার সাপেক্ষ চলমান বিভিন্ন পর্যবেক্ষকের মনে হবে আলোক তাদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে আসছে। কিন্তু ইথার সাপেক্ষ আলোকের দ্রুতি স্থির থাকবে। বিশেষ করে, পৃথিবী যখন ইথারের ভিতর দিয়ে সূর্য প্রদক্ষিণ করার পথে, তখন ইথারের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর গতির অভিমুখে আলোকের দ্রুতি মাপলে (যখন আমরা আলোকের উৎস অভিমুখে চলেছি) সেটা গতির সমকোণে আলোকের দ্রুতির (speed) চাইতে উচ্চতর হবে (যখন আমরা উৎসের অভিমুখে যাচ্ছি না)। ১৮৮৭ সালে অ্যালবার্ট মিচেলসন (Albert Michelson) (পরবর্তী কালে তিনিই প্রথম আমেরিকান যিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন) এবং এডওয়ার্ড মর্লি (Edward Morley) ক্লীভল্যাণ্ডের ফলিত বিজ্ঞানের কেস স্কুলে (Case School of Applied Science) অতি যত্নে একটি পরীক্ষা করেন। তাঁরা পৃথিবীর গতির অভিমুখে আলোকের দ্রুতির সঙ্গে পৃথিবীর গতির অভিমুখের সমকোণে আলোকের দ্রুতি তুলনা করেন। তাঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন, দুটি দ্রুতিই নির্ভুলভাবে অভিন্ন।

১৮৮৭ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত মিচেলসন-মর্লি পরীক্ষা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। বস্তুপিণ্ডগুলি ইথারের ভিতর দিয়ে চলমান অবস্থায় সঙ্কুচিত হয় এবং ঘড়ি ধীরতর (slower) হয়— এই ভিত্তিতে মিচেলসন-মর্লি পরীক্ষার ব্যাখ্যা করার অনেকগুলি চেষ্টা হয়। যাঁরা চেষ্টা করেন তাদের ভিতরে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ওলন্দাজ পদার্থবিদ হেন্ড্রিক লোরেন্জ্ (Hendrik Lorentz)। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের পেটেন্ট অফিসের একজন অখ্যাত কেরানী ১৯০৫ সালে প্রকাশিত একটি বিখ্যাত গবেষণাপত্রে দেখিয়ে দেন পরম কালের ধারণা পরিত্যাগ করলে ইথার সম্পর্কিত সমস্ত ধারণাই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। এই অখ্যাত কেরানীর নাম অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। কয়েক সপ্তাহ বাদে ফরাসী গণিতবিদ আঁরি পয়েনকেয়ার (Henri Poincaré) একই রকম কথা বলেন। আইনস্টাইনের যুক্তিগুলি ছিল পয়েনকেয়ারের যুক্তির তুলনায় পদার্থবিদ্যার নিকটতর। পয়েনকেয়ারের মত ছিল সমস্যাটা গাণিতিক। সাধারণত

নতুন তত্ত্বের কৃতিত্ব আইনস্টাইনকে দেওয়া হয় কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের সঙ্গে পয়েনকেয়ারের নাম জড়িয়ে তাঁকে স্মরণ করা হয়।

সে সময় যাকে আপেক্ষিক তত্ত্ব বলা হোত তার মূলগত স্বীকার্য ছিল (fundamental postulate) অবাধে চলমান সমস্ত বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষই বৈজ্ঞানিক বিধিগুলি এক হতে হবে এবং সেটা হতে হবে বস্তুপিণ্ডের দ্রুতি নিরপেক্ষ। এই স্বীকার্য নিউটনের গতিবিষয়ক তত্ত্ব সম্পর্কে সত্য ছিল। কিন্তু এখন এই স্বীকার্য ম্যাক্সওয়েল তত্ত্ব এবং আলোকের গতির ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করল। তাঁরা নিজেরা যত দ্রুতিতেই চলমান হোন না কেন আলোকের দ্রুতির মাপন সমস্ত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ একই হবে। এই সরল চিন্তাধারার কতগুলি উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি রয়েছে। তার ভিতর সবচাইতে পরিচিত হল ভর এবং শক্তির সমতুল্যতা (equivalence)। এ তত্ত্বের সারসংক্ষেপ রয়েছে আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E = mc^2$-এ। এক্ষেত্রে E = শক্তি, m = ভর এবং c আলোকের দ্রুতি এবং এই বিধি : আলোকের দ্রুতির অধিক কোনো গতি হতে পারে না। শক্তি এবং ভরের সমতুল্যতা ধারণার ফলে একটি বস্তুপিণ্ডের গতির দরুন তার যে শক্তি রয়েছে সে শক্তি তার ভরে যুক্ত হবে। অন্য কথায় বলা যায় তার দ্রুতি বাড়ানো কঠিনতর হবে। যে সমস্ত বস্তুপিণ্ডের দ্রুতি আলোকের দ্রুতির কাছাকাছি, আসলে শুধুমাত্র সেই সমস্ত বস্তুপিণ্ডের ক্ষেত্রেই এই অভিক্রিয়ার গুরুত্ব রয়েছে। উদাহরণ, বস্তুপিণ্ডের দ্রুতি যদি আলোকের দ্রুতির ১০ শতাংশ হয়, তাহলে তার ভর বৃদ্ধি পাবে স্বাভাবিকের চাইতে শতকরা ০.৫ ভাগ মাত্র। কিন্তু তার দ্রুতি আলোকের দ্রুতির ৯০ শতাংশ হলে তার ভর হবে স্বাভাবিক ভরের দ্বিগুণেরও বেশী। বস্তুপিণ্ডের দ্রুতি আলোকের দ্রুতির যত নিকটতর হয়, তার ভরও ততই আরো বেশী তাড়াতাড়ি বাড়ে; সুতরাং তার দ্রুতি বাড়াতে আরো বেশী বেশী শক্তির প্রয়োজন হয়। আসলে বস্তুপিণ্ডের দ্রুতি কখনোই আলোকের দ্রুতির সমান হতে পারে না। কারণ তাহলে তার ভর হবে অসীম। আর ভর এবং শক্তির সমতুল্যতার তত্ত্ব অনুসারে ঐ অবস্থায় পৌঁছাতে হলে তার প্রয়োজন হবে অসীম শক্তি। সেইজন্য স্বাভাবিক বস্তুপিণ্ডের গতি অপেক্ষবাদ দ্বারা আলোকের গতির চাইতে নিম্নগতিতে চিরকালের জন্য সীমাবদ্ধ। শুধুমাত্র আলোক কিম্বা অন্য যে সমস্ত তরঙ্গের নিজস্ব কোনো ভর নেই তারাই আলোকের দ্রুতিতে চলতে পারে।

অপেক্ষবাদের একই রকম উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি হল স্থান এবং কাল সম্পর্কে আমাদের চিন্তাধারায় বিপ্লব। নিউটনের তত্ত্ব অনুসারে একটি স্থান থেকে অন্য একটি স্থানে যদি আলোকের একটি স্পন্দন (pulse) প্রেরণ করা যায় তাহলে বিভিন্ন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ তার ভ্রমণকাল সম্পর্কে মতৈক্য হবে (কারণ কাল পরম)। কিন্তু আলোক কতদূর গমন করেছে, সে বিষয়ে সব সময় মতৈক্য হবে না (কারণ স্থান পরম নয়)। যেহেতু, আলোকের দ্রুতি শুধুমাত্র আলোক যে দূরত্ব অতিক্রম করেছে, তার সঙ্গে দূরত্ব অতিক্রম করতে যে কাল ব্যয় হয়েছে, তার ভাগফল। সুতরাং বিভিন্ন পর্যবেক্ষকদের ক্ষেত্রে আলোকের গতিবেগের মাপনে পার্থক্য হয়। অথচ অপেক্ষবাদ অনুসারে সমস্ত পর্যবেক্ষকের ক্ষেত্রেই আলোকের চলনের দ্রুতি সম্পর্কে মতৈক্য হবে। তবুও কিন্তু আলোক কতটা দূরত্ব ভ্রমণ করেছে, সে সম্পর্কে মতৈক্য হবে

না সুতরাং যে কাল ব্যয় হয়েছে সে সম্পর্কেও তাদের মতানৈক্য হবে। (যে কাল ব্যয় হয়েছে সেটা হবে আলোক যে দূরত্ব অতিক্রম করেছে তাকে আলোকের দ্রুতি দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল হয় সেই ভাগফল। দূরত্ব সম্পর্কে পর্যবেক্ষকদের মতৈক্য হবে না। তবে আলোকের দ্রুতি সম্পর্কে তাদের মতৈক্য হবে)। অন্য কথায় অপেক্ষবাদ পরম কাল সম্পর্কীয় ধারণাকে শেষ করেছে। দেখা গিয়েছে প্রতিটি পর্যবেক্ষকের অবশ্যই কালের নিজস্ব মাপন থাকতে হবে। যে ঘড়ি সে বহন করছে সেই ঘড়িটাই সেই কাল নির্দেশ করবে। বিভিন্ন পর্যবেক্ষকেরা সমরূপ ঘড়ি বহন করলেও তাঁরা যে কাল সম্পর্কে একমত হবেন তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

প্রতিটি পর্যবেক্ষকই একটি আলোক কিম্বা বেতার তরঙ্গের স্পন্দন পাঠিয়ে ঘটনাটি কোথায় এবং কখন ঘটেছে সেটা বলবার জন্য রাডার যন্ত্র ব্যবহার করতে পারেন। স্পন্দনের একটি অংশ ঘটনায় (at the event) প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে এবং পর্যবেক্ষক প্রতিফলনটি ফিরে আসবার কাল মাপেন। তা হলে স্পন্দনটি যখন পাঠানো হয়েছিল এবং প্রতিফলনটি যখন ফিরে এল সেই কালের অর্ধেক হবে ঘটনার কাল : ঘটনার দূরত্ব হবে চলাচলের কালের অর্ধেককে আলোকের দ্রুতি দিয়ে গুণ করলে যা হয় তাই। (এই অর্থে একটি ঘটনা হল এমন কিছু যা স্থানে একটি বিন্দুতে এবং কালের একটা বিশিষ্ট বিন্দুতে ঘটে।) এই ধারণা (idea) দেখানো হয়েছে চিত্র ২.১ (পৃষ্ঠা ৪০)-এ। স্থান-কাল চিত্রের এটা একটা উদাহরণ। এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে যে পর্যবেক্ষকরা পরস্পর সাপেক্ষ চলমান তাঁরা একই ঘটনাকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং কালে আরোপ করবেন। কোনো বিশেষ পর্যবেক্ষকের মাপন অন্য কোনো পর্যবেক্ষকের মাপনের চাইতে বেশী নির্ভুল নয়। তবে প্রতিটি মাপনের ভিতরেই একটা সম্পর্ক রয়েছে। যে কোনো পর্যবেক্ষকই একটি ঘটনা সাপেক্ষ অন্য একজন পর্যবেক্ষক কি কাল এবং অবস্থান আরোপ করবেন সেটা হিসাব করে বলতে পারবেন– অবশ্য তিনি যদি আর একজনের আপেক্ষিক গতিবেগ জানেন।

আজকাল আমরা দূরত্ব নির্ভুলভাবে নির্ণয় করার জন্য এই পদ্ধতিই ব্যবহার করি। কারণ, আমরা দৈর্ঘ্যের চাইতে কাল অনেক নির্ভুলভাবে মাপতে পারি। কার্যক্ষেত্রে মিটারের সংজ্ঞা আলোক 0.000000003335640952 সেকেণ্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, সেই দূরত্ব। কাল মাপা হয় একটি সিসিয়াম (cesium) ঘড়ি দিয়ে। (এই বিশেষ সংখ্যার কারণ হল : এটা মিটারের ঐতিহাসিক সংজ্ঞার অনুকূল– প্যারিসে রক্ষিত একটি বিশেষ প্লাটিনাম দণ্ডে অঙ্কিত দুটি চিহ্নের বাঁধিধিতে)। একই ভাবে আমরা আলোক সেকেণ্ড নামক আরো সুবিধাজনক নতুন একটি দৈর্ঘ্যের একক ব্যবহার করতে পারি। এটার সংজ্ঞা শুধুমাত্র এক সেকেণ্ডে আলোক যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেই দৈর্ঘ্য। অপেক্ষবাদে আজকাল আমরা দূরত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণ করি কাল এবং আলোকের দ্রুতির বাঁধিধিতে (in terms of)। সুতরাং এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হল প্রতিটি পর্যবেক্ষকের মাপনে আলোকের গতিবেগ একই হবে (সংজ্ঞা অনুসারে প্রতি 0.000000003335640952 সেকেণ্ডে এক মিটার)। ইথার সম্পর্কীয় ধারণা উপস্থিত করার কোনো প্রয়োজন নেই। মিচেলসন-মর্লি পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে ইথারের অস্তিত্ব

কোনোক্রমেই আবিষ্কার করা যায় নি। অপেক্ষবাদ কিন্তু স্থান এবং কাল সম্পর্কে আমাদের ধারণা মূলগতভাবে পরিবর্তিত করতে বাধ্য করে। আমাদের মানতেই হবে: কাল স্থান

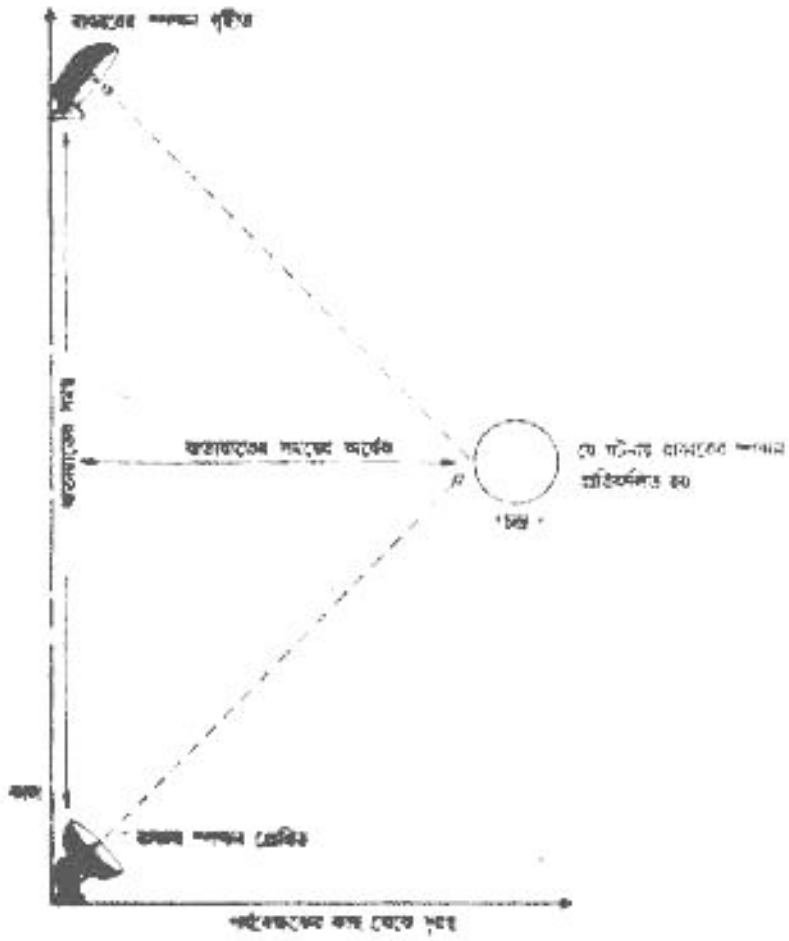

চিত্র ২.১ : সময় মাপা হয়েছে উল্লম্বভাবে এবং পর্যবেক্ষকের কাছ থেকে দূরত্ব মাপা হয়েছে আনুভূমিকভাবে। বাঁ দিকের উল্লম্ব রেখা দিয়ে স্থান-কালের মধ্য দিয়ে পর্যবেক্ষকের পথ দেখানো হচ্ছে। আলোকরশ্মির ঘটনা থেকে যাতায়াতের পথ দেখানো হয়েছে কর্ণরেখা দিয়ে।

থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয় এবং স্থান নিরপেক্ষও নয়। বরং এ দুটির সমন্বয়ে স্থান-কাল নামক বস্তু গঠিত হয়েছে।

সাধারণ অভিজ্ঞতায় বলে স্থানে একটি বিন্দুর অবস্থান তিনটি সংখ্যা কিম্বা তিনটি স্থানাঙ্ক দিয়ে নির্দিষ্ট করা যায়। উদাহরণ, বলা যায় ঘরের একটি বিন্দু একটি দেওয়াল থেকে সাত ফুট দূরে, আর একটি দেওয়াল থেকে তিন ফুট দূরে এবং মেঝে থেকে পাঁচ ফুট উপরে। কিম্বা নির্দেশ করা যায় একটি বিন্দু একটি বিশেষ অক্ষাংশ (latitude) এবং একটি বিশেষ দ্রাঘিমায় (longitude) এবং সমুদ্রতলের উপরে একটি বিশেষ উচ্চতায় অবস্থিত ছিল। স্বাধীনভাবে যে কোনো তিনটি স্থানাঙ্ক বেছে নেওয়া যেতে পারে, অবশ্য সেগুলির সত্যতার

ব্যাপ্তি সীমিত। চাঁদের অবস্থান নির্দেশ করতে হলে কেউ পিকাডিলি সার্কাস থেকে কত মাইল উত্তরে এবং কত মাইল পশ্চিমে এবং সমুদ্রতল থেকে কত ফুট উচ্চতায়—এই বাধিধি ব্যবহার করে না। তার বদলে সূর্য থেকে দূরত্ব কিম্বা কোনো গ্রহের কক্ষতল (plane of orbit) থেকে দূরত্বের বাধিধিতে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সংযোগকারী রেখা এবং সূর্য ও আলফা সেন্টোরীর (Alpha Centauri) মতো কোনো একটি নক্ষত্রকে সংযোগকারী রেখা দ্বারা গঠিত কোণের বাধিধিতে নির্দেশ করা যায়। আমাদের ছায়াপথে সূর্যের অবস্থানের বিবরণ দিতে হলে এই স্থানাঙ্কগুলি দিয়ে খুব সুবিধা হয় না। আমাদের ছায়াপথ (galaxy) গোষ্ঠীর ভিতরে আমাদের ছায়াপথের অবস্থান নির্দেশ করতে হলে এই স্থানাঙ্কগুলি দিয়েও খুব সুবিধা হয় না। আসলে সমগ্র মহাবিশ্বের বিবরণ কয়েকটি পরস্পর আবৃতকারী (overlapping) অংশের (patches) সমষ্টি রূপে দেওয়া যেতে পারে। প্রতিটি অংশের একটি বিন্দুর অবস্থান নির্দিষ্ট করার জন্য বিভিন্ন কেতার (set) তিনটি স্থানাঙ্ক ব্যবহার করা যায়।

একটি ঘটনা হল এমন একটি জিনিষ যা স্থানের একটি বিন্দুতে এবং একটি বিশেষ কালে ঘটে। সুতরাং, চারটি সংখ্যা বা স্থানাঙ্ক দিয়ে তাকে নির্দিষ্ট করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রেও স্থানাঙ্ক নির্বাচন যদৃচ্ছিক (arbitrary)। যে কোনো তিনটি স্থানিক স্থানাঙ্ক এবং কালের যে কোনো মাপন ব্যবহার করা যেতে পারে। অপেক্ষবাদে স্থানিক এবং কালিক স্থানাঙ্কের ভিতরে বাস্তবে কোনো পার্থক্য নেই। ঠিক যেমন নেই দুটি স্থানিক স্থানাঙ্কের ভিতরে। স্থানাঙ্কের একটি নতুন কেতা (set) বেছে নেওয়া যেতে পারে। ধরুন— সেটাতে আগেকার প্রথম এবং দ্বিতীয়ের সমন্বয় করে প্রথম স্থানাঙ্কটি হয়েছিল। উদাহরণ: পৃথিবীর উপরে একটি বিন্দুর অবস্থান পিকাডিলি থেকে উত্তরে কয়েক মাইল এবং পশ্চিমে কয়েক মাইল হিসাবে না মেপে, পিকাডিলি থেকে উত্তর-পূর্বে কয়েক মাইল এবং উত্তর-পশ্চিমে কয়েক মাইল করেও মাপা যেতে পারে। তেমনি, অপেক্ষবাদে প্রাচীন কাল (সেকেণ্ডে) এবং পিকাডিলি থেকে দূরত্বের (আলোক সেকেণ্ডে) সমন্বয় করে একটি নতুন কালিক স্থানাঙ্ক ব্যবহার করা যেতে পারে।

অনেক সময় একটি ঘটনার অবস্থান চার মাত্রিক স্থানে (four dimensional space) অর্থাৎ স্থান-কাল নির্দিষ্ট করার জন্য চারটি স্থানাঙ্কের বাধিধিতে চিন্তা করা সুবিধা। এর নাম স্থান-কাল। চারমাত্রিক স্থান কল্পনা করা অসম্ভব। ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে ত্রিমাত্রিক স্থানের দৃষ্টিকল্পন (visualize) করাই বেশী কঠিন। কিন্তু দ্বিমাত্রিক স্থানের, যথা পৃথিবীর পৃষ্ঠের (surface) মতো স্থানের চিত্রাঙ্কন সহজ [পৃথিবীর পৃষ্ঠ দ্বিমাত্রিক, কারণ, দু'টি স্থানাঙ্ক দিয়ে একটি বিন্দুর অবস্থান নির্দিষ্ট করা যায়: দ্রাঘিমা এবং অক্ষাংশ (longitude & latitude)]। আমি সাধারণত এমন চিত্র ব্যবহার করব— যাতে কাল বৃদ্ধি পায় উপর দিকে এবং স্থানিক মাত্রাগুলির একটি দেখানো হয় আনুভূমিকভাবে (horizontally)। অন্য দুটি স্থানিক মাত্রা অগ্রাহ্য করা হয় কিম্বা অনেক সময় তাদের একটি দেখানো হয় দর্শনানুপাতের (perspective) সাহায্যে। (এগুলিকে বলা হয় স্থান-কাল চিত্র, চিত্র ২.১-এর মতো।) উদাহরণ: চিত্র ২.২-এ কাল মাপা হয়েছে বৎসর হিসাবে এবং উর্দ্ধদিকে। আল্‌ফা সেন্টোরী (Alpha Centauri) থেকে সূর্য বরাবর দূরত্ব মাপা হয়েছে মাইল হিসাবে আনুভূমিকভাবে। স্থান-কালের ভিতর দিয়ে সূর্য এবং আলফা সেন্টোরীর (Alpha Centauri) পথ দেখানো হয়েছে চিত্রের ডান ও

বাম পাশে উল্লম্ব রেখা দিয়ে। সূর্য থেকে আগত একটি আলোকরশ্মি কর্ণরেখা (diagonal line) অনুসরণ করে এবং সূর্য থেকে আলফা সেন্টৌরী যেতে চার বছর সময় নেয়।

আমরা দেখেছি ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল আলোকের উৎসের দ্রুতি যাই হোক না কেন, আলোকের দ্রুতি একই থাকবে। এই তথ্যের সত্যতা নিখুঁত মাপনের সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতি হল যদি একটি বিশেষ কালে স্থানের একটি বিশেষ

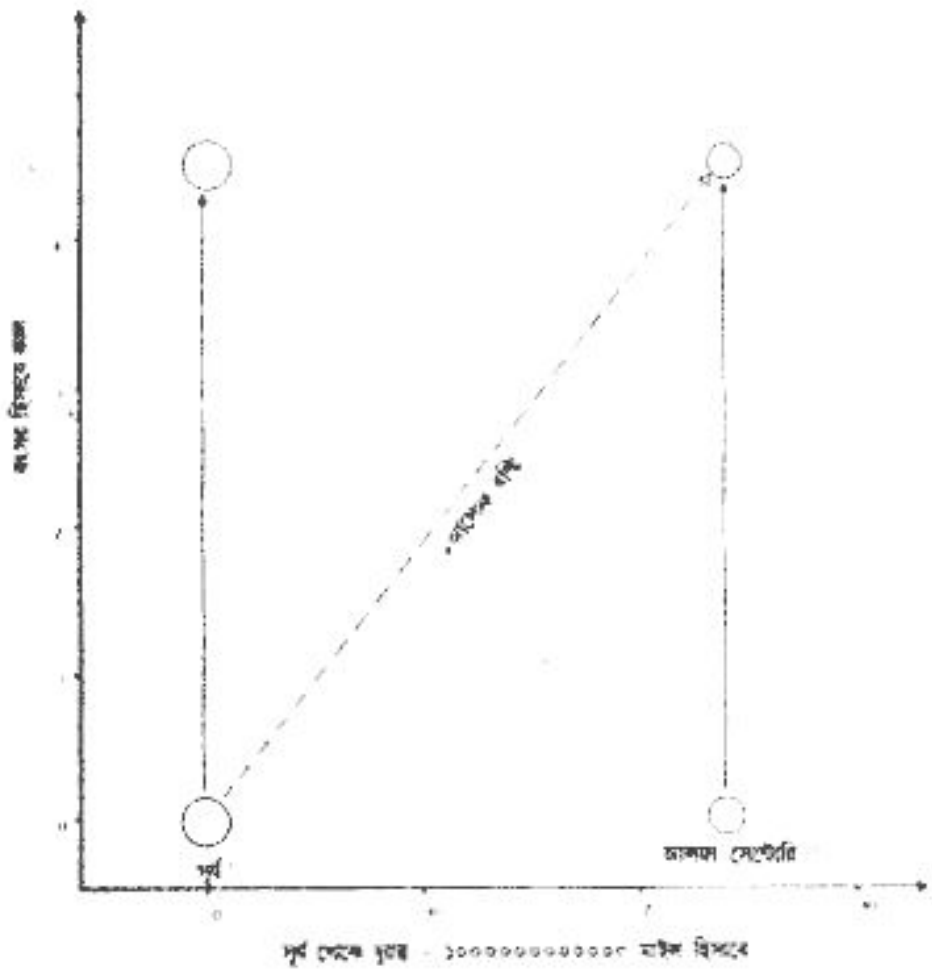

চিত্র - ২.২

বিন্দুতে আলোকের একটি স্পন্দন উৎসারিত হয়, তাহলে কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে সেটা একটা আলোকের গোলকরূপে বিস্তার লাভ করবে। তার আকার এবং অবস্থান হবে উৎসের গতিনিরপেক্ষ। এক সেকেণ্ডের এক মিলিয়ান (১০,০০,০০০) ভাগের এক ভাগ সময়ে

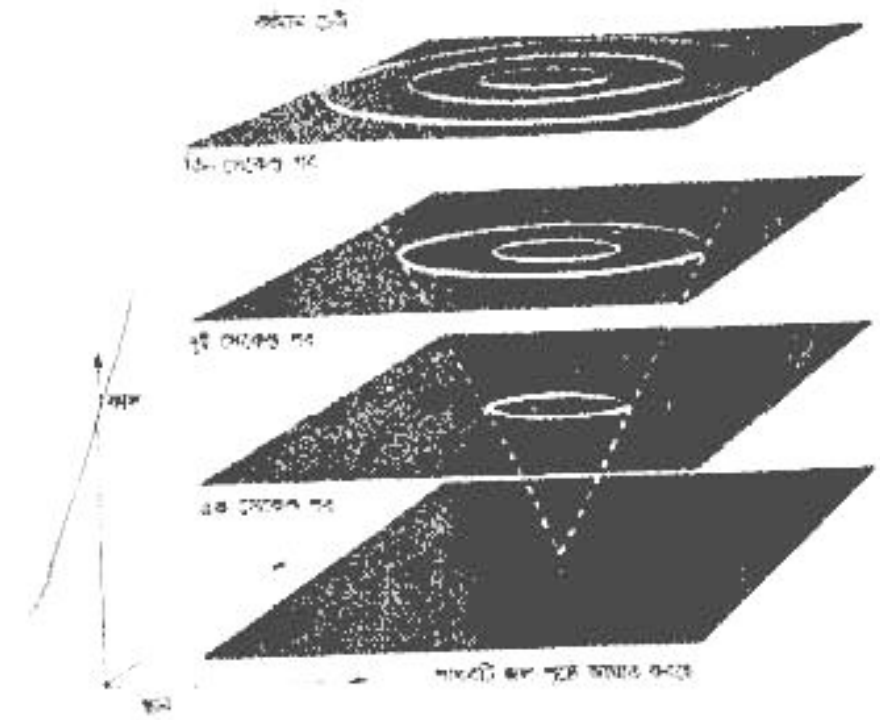

চিত্র - ২.৩

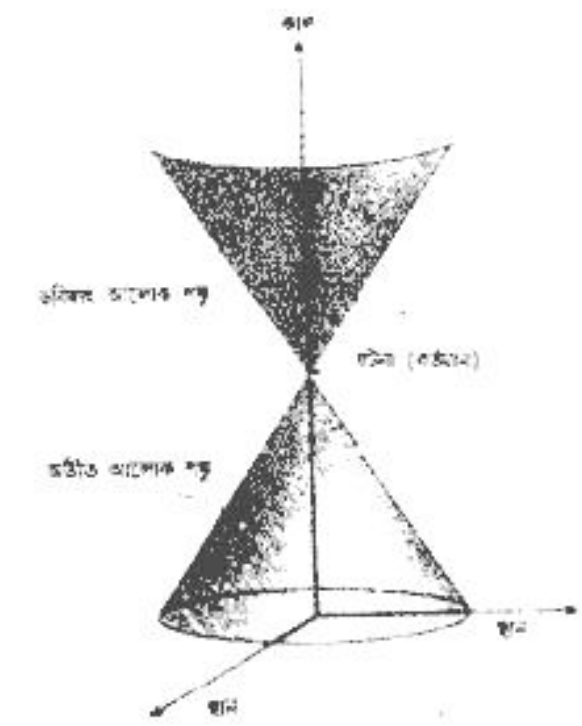

চিত্র - ২.৪

আলোক বিস্তার লাভ করে এমন একটা গোলক গঠন করবে যার ব্যাসার্ধ হবে ৩০০ মিটার। এক সেকেণ্ডের এক মিলিয়ান ভাগের দুভাগে ব্যাসার্ধ হবে ৬০০ মিটার এবং এইভাবে চলবে। ব্যাপারটা একটা পুকুরের পৃষ্ঠে (surface)ঢিল ফেললে ঢেউগুলি যেভাবে বিস্তার লাভ করে অনেকটা সেই রকম। ঢেউগুলি বিস্তার লাভ করে একটি বৃত্তরূপে এবং কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তটি আকারে বাড়ে। যদি পুকুরের পৃষ্ঠের দুই মাত্রা এবং কালের এক মাত্রা মিলিয়ে একটি ত্রিমাত্রিক প্রতিরূপের কথা ভাবা যায় তাহলে ঢেউয়ের বিস্তারমান বৃত্ত একটি শঙ্কু (cone)সৃষ্টি করবে। শঙ্কুর প্রান্তিক শীর্ষ বিন্দু থাকবে সেই স্থান-কালে যেখানে ঢিলটি জলে আঘাত করেছিল (চিত্র - ২.৩)। একইভাবে একটি ঘটনা থেকে বিস্তারমান আলোক চারমাত্রিক স্থান-কালে একটি ত্রিমাত্রিক শঙ্কু সৃষ্টি করে। এই শঙ্কুকে বলা হয় ঘটনার ভবিষ্যৎ আলোক

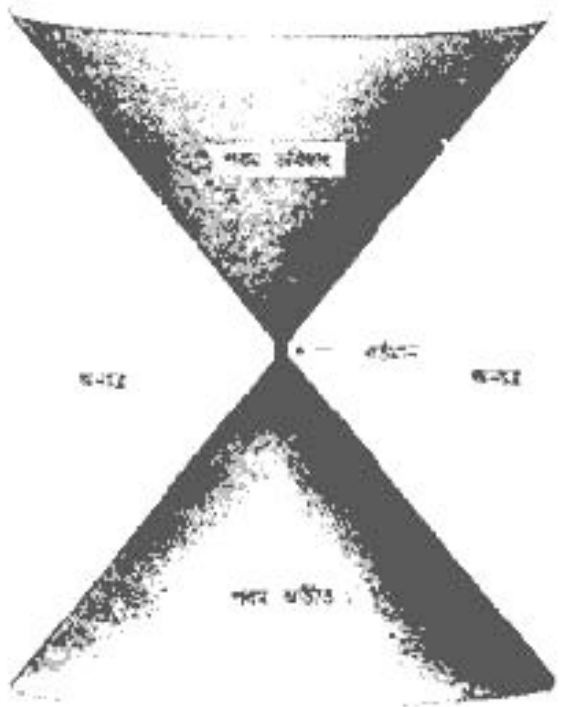

চিত্র ২.৫

শঙ্কু। এইভাবেই আমরা অতীত আলোক শঙ্কু নামে আর একটি শঙ্কু আঁকতে পারি। সেগুলি এমন কতগুলি ঘটনার কেতা (set) যেখান থেকে আলোকের একটি স্পন্দন নির্দিষ্ট ঘটনায় পৌঁছাতে পারে (চিত্র - ২.৪)।

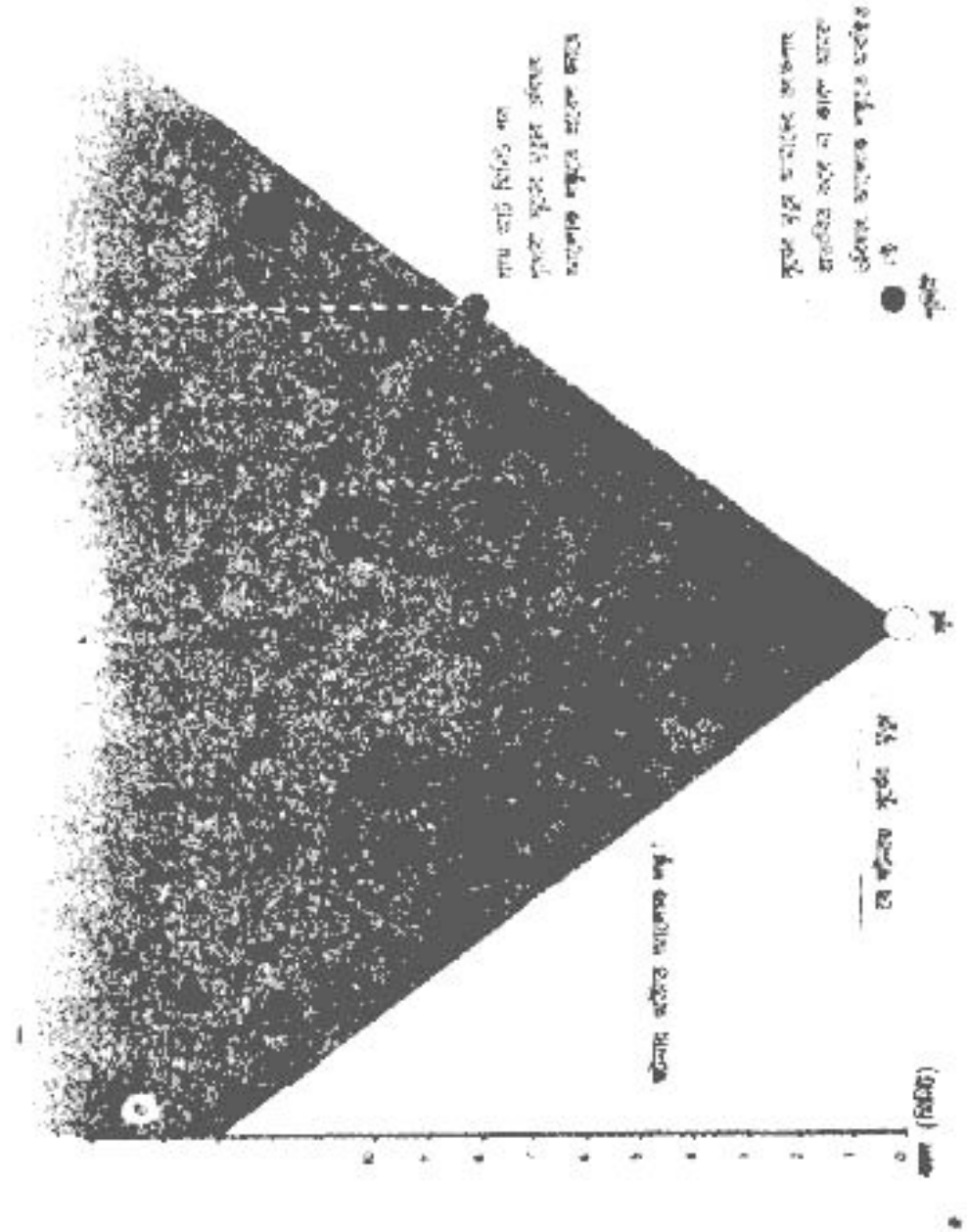

একটি ঘটনা P-এর ভবিষ্যৎ এবং অতীত আলোক শঙ্কু স্থান-কালকে তিনভাগে বিভক্ত করে (২.৫ চিত্র)। ঘটনাটির পরম ভবিষ্যৎ হল ভবিষ্যৎ আলোক শঙ্কু (cone) P-এর ভিতরকার একটি অঞ্চল। এটি হল P-তে যা ঘটনা ঘটে সেটা সম্ভাব্য যত ভাবে প্রভাবিত হতে পারে সে রকম সব ঘটনার একটি কেতা (set of all events)। আলোক শঙ্কু P—এর বাইরের ঘটনায় কখনো P থেকে উৎসারিত সঙ্কেত পৌঁছাতে পারে না। তার কারণ, কোনো কিছুই আলোকের চেয়ে দ্রুততর যেতে পারে না। সুতরাং P-তে কি ঘটছে তাই দিয়ে তারা প্রভাবিত হতে পারে না। অতীত আলোক শঙ্কুর অন্তর্বর্তী অঞ্চলই P এর পরম অতীত(absolute past)। আলোকের দ্রুতি কিম্বা তার নিম্নতম দ্রুতিতে চলমান যে সমস্ত সঙ্কেত সমস্ত ঘটনার কেতা (set of all events) থেকে P তে পৌঁছাতে পারে, এ হল তাই। সুতরাং এটা হল সেই সমস্ত ঘটনার কেতা যার P-তে যা ঘটছে তাকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা আছে। কোনো বিশেষকালে স্থানের যে অঞ্চল P-এর অতীত আলোক শঙ্কুর অন্তর্ভুক্ত, সে অঞ্চলের প্রত্যেক স্থানে যা ঘটছে তা যদি জানা থাকে তাহলে P-তে কি ঘটবে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। অন্য স্থান হল স্থান-কালের সেই অঞ্চল যা P-এর অতীত কিম্বা ভবিষ্যৎ আলোক শঙ্কুর অন্তর্ভুক্ত নয়। সেই অন্য স্থানের ঘটনা P-তে সংঘটিত ঘটনাগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে না কিম্বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হতেও পারে না। উদাহরণ: যদি এই মুহূর্তেই সূর্য আলোক বিকিরণ বন্ধ করে তাহলে বর্তমান কালে পৃথিবীতে অবস্থিত জিনিসের উপর তার কোনো প্রভাব পড়বে না। তার কারণ, সূর্য যখন নিভে গেল (চিত্র - ২.৬) তখন পৃথিবীর জিনিসগুলি থাকবে ঘটনার অন্য অঞ্চলে। ব্যাপারটা আমরা জানতে পারব শুধু আট মিনিট পর। অর্থাৎ সূর্য থেকে আমাদের কাছে আলো পৌঁছাতে যে সময় লাগে তারপর। শুধুমাত্র সেই সময়ই পৃথিবীস্থ ঘটনাবলী সূর্যের নিভে যাওয়া ঘটনার ভবিষ্যৎ আলোক শঙ্কুর অন্তর্ভুক্ত হবে। একইভাবে বলা যায় এই মুহূর্তে এই মহাবিশ্বের দূরতম অঞ্চলে কি ঘটছে তা আমরা জানি না। সুদূরের নীহারিকা থেকে আগত যে আলোক আমরা দেখি সে আলোক বহু মিলিয়ান বৎসর আগে সেই নীহারিকাগুলি থেকে রওনা হয়েছিল। দূরতম যে বস্তু আমরা দেখতে পাই, তাদের ক্ষেত্রে আলোক রওনা হয়েছে প্রায় আট হাজার মিলিয়ান বছর আগে। সুতরাং যখন আমরা মহাবিশ্ব দেখি তখন আসলে দেখতে পাই মহাবিশ্বের অতীত রূপ।

আইনস্টাইন এবং পয়েনকেয়ার (Einstein & Poincaré) ১৯০৫ সালে যা করেছিলেন, মহাকর্ষীয় অভিক্রিয়াকে যদি সেইরকম অগ্রাহ্য করা যায় তাহলে যা হবে সেটা হল বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ: স্থান-কালের প্রতিটি ঘটনা সাপেক্ষই আমরা একটি আলোক শঙ্কু গঠন করতে পারি [সেই ঘটনার (at the event) স্থান-কালে উৎসারিত আলোকের সম্ভাব্য সমস্ত গতিপথের কেতা (set)] এবং যেহেতু প্রতিটি ঘটনা সাপেক্ষ এবং প্রতিটি অভিমুখেই আলোকের দ্রুতি এক, সেইজন্য সমস্ত আলোক শঙ্কুই হবে সমরূপ এবং সবগুলির অভিমুখই হবে এক। এই তত্ত্ব আরো বলে আলোকের চাইতে দ্রুতগতি কারো হতে পারে না। এর অর্থ হল স্থান-কালের ভিতর দিয়ে যে কোনো বস্তুরই গতিপথের প্রতিরূপ এমন একটি রেখা

যা তার উপরে প্রতিটি ঘটনার আলোক শঙ্কুর অভ্যন্তরে অবস্থিত।

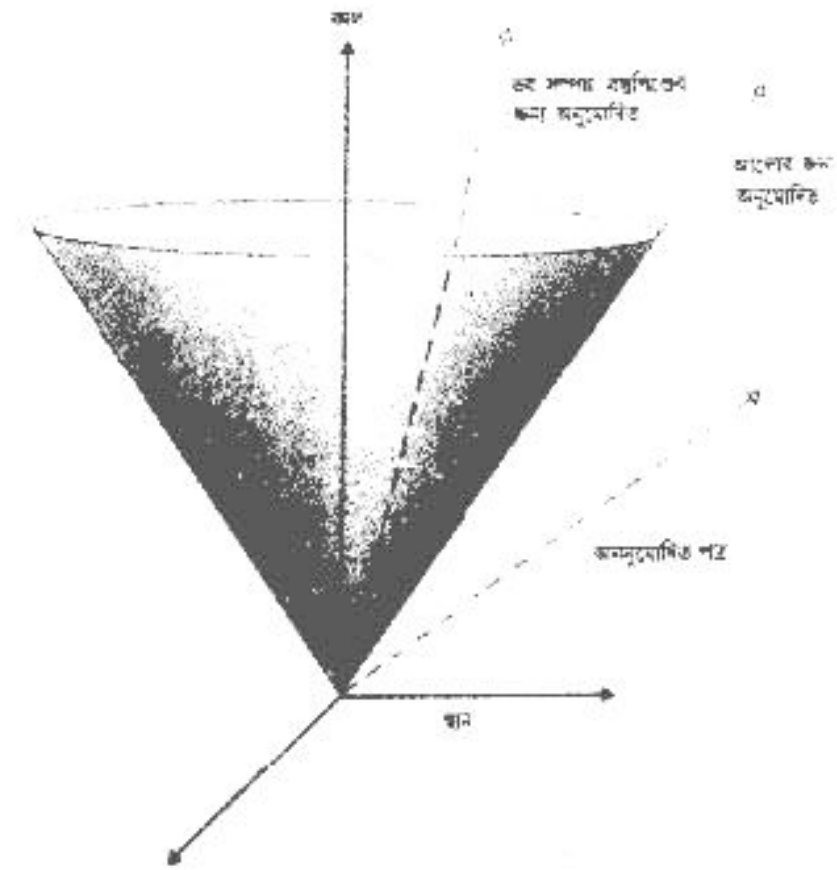

চিত্র - ২.৭

সমস্ত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষই আলোকের দ্রুতি অভিন্ন (মিচেলসন-মর্লির পরীক্ষাতে এটাই দেখানো হয়েছে)। এই তথ্য ব্যাখ্যায় এবং যখন কোনো বস্তু আলোকের দ্রুতির কাছাকাছি দ্রুতিতে চলমান হয় তখন কি ঘটে তার বিবরণ দেওয়ার ব্যাপারে বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ খুবই সাফল্য লাভ করে। নিউটনের মহাকর্ষীয় তত্ত্বের সঙ্গে এর কিন্তু অসঙ্গতি ছিল। সে তত্ত্বের মতে বস্তুগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং আকর্ষণবল তাদের অন্তর্বর্তী দূরত্বের উপর নির্ভরশীল। এর অর্থ হল: একটি বস্তুকে যদি সরানো যায় তাহলে অন্য বস্তুটির উপরে প্রযুক্ত বলের তাৎক্ষণিক পরিবর্তন হবে। কিম্বা অন্য ভাবে বলা যায়, মহাকর্ষীয় অভিক্রিয়ার অসীম গতিতে চলমান হওয়া উচিত। অথচ বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের দাবী মহাকর্ষীয় বলের দ্রুতি হওয়া উচিত আলোর দ্রুতির সমান বা তার চাইতে কম। ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত আইনস্টাইন চেষ্টা করেছেন এমন একটি মহাকর্ষীয় তত্ত্ব আবিষ্কার করতে যার সঙ্গে বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের সঙ্গতি থাকবে। কিন্তু তিনি সফল হন নি। শেষে ১৯১৫ সালে আমরা যাকে ব্যাপক অপেক্ষবাদ বলি সেই তত্ত্ব তিনি উপস্থিত করেন।

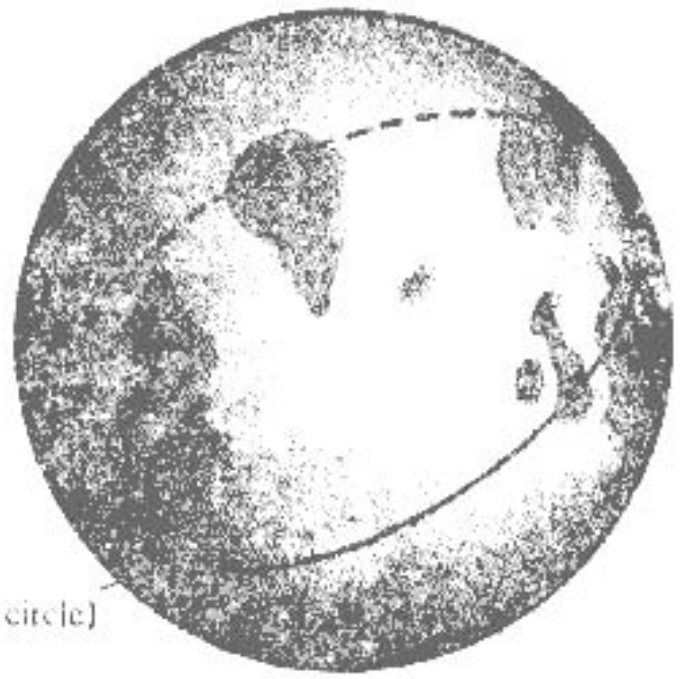

চিত্র - ২.৮

আইনস্টাইন এই বিপ্লবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, মহাকর্ষীয় বল অন্যান্য বলের মতো নয়। আগে যেরকম অনুমান করা গিয়েছিল স্থান-কাল সেরকম সমতল (flat) নয়, এটা বক্র কিম্বা বঙ্কিম (warped)। তার কারণ, স্থান-কালে ভর এবং শক্তির বণ্টন। আইনস্টাইনের মতে মহাকর্ষ এরই ফলশ্রুতি। পৃথিবীর মতো বস্তুপিণ্ড যে বঙ্কিম কক্ষে চলে তার কারণ মহাকর্ষ নামক বল নয়, তারা বঙ্কিম স্থানে ঋজুপথের নিকটতম পথ অনুসরণ করে। সে পথের নাম জিওডেসিক (geodesic)। নিকটবর্তী দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী হ্রস্বতম (কিম্বা দীর্ঘতম) পথের নাম জিওডেসিক। উদাহরণ: পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ (surface) একটি দ্বিমাত্রিক বঙ্কিম স্থান। পৃথিবীর উপরের জিওডেসিককে বলা হয় বৃহৎ বৃত্ত (great circle) এবং দুটি বিন্দুর ভিতরে এটাই হ্রস্বতম পথ (চিত্র ২.৮)। যেহেতু দুটি বিমানবন্দরের ভিতরে এটাই হ্রস্বতম পথ সেইজন্য বিমানের নাবিক (navigator) বিমানচালককে এই পথে যেতে বলে। ব্যাপক অপেক্ষবাদে বস্তুপিণ্ডগুলি সব সময়ই চতুর্মাত্রিক স্থান-কালে ঋজুরেখা অনুসরণ করে। কিন্তু আমাদের মনে হয় তারা আমাদের ত্রিমাত্রিক স্থানে বঙ্কিম পথে চলমান। (এটা অনেকটা পর্বতময় জমির উপর দিয়ে চলমান বিমান দেখার মতো। বিমানটি ত্রিমাত্রিক স্থানে একটি সরলরেখা অনুসরণ করে, কিন্তু এর ছায়া দ্বিমাত্রিক ভূমির উপর একটি বঙ্কিম পথ অনুসরণ করে)।

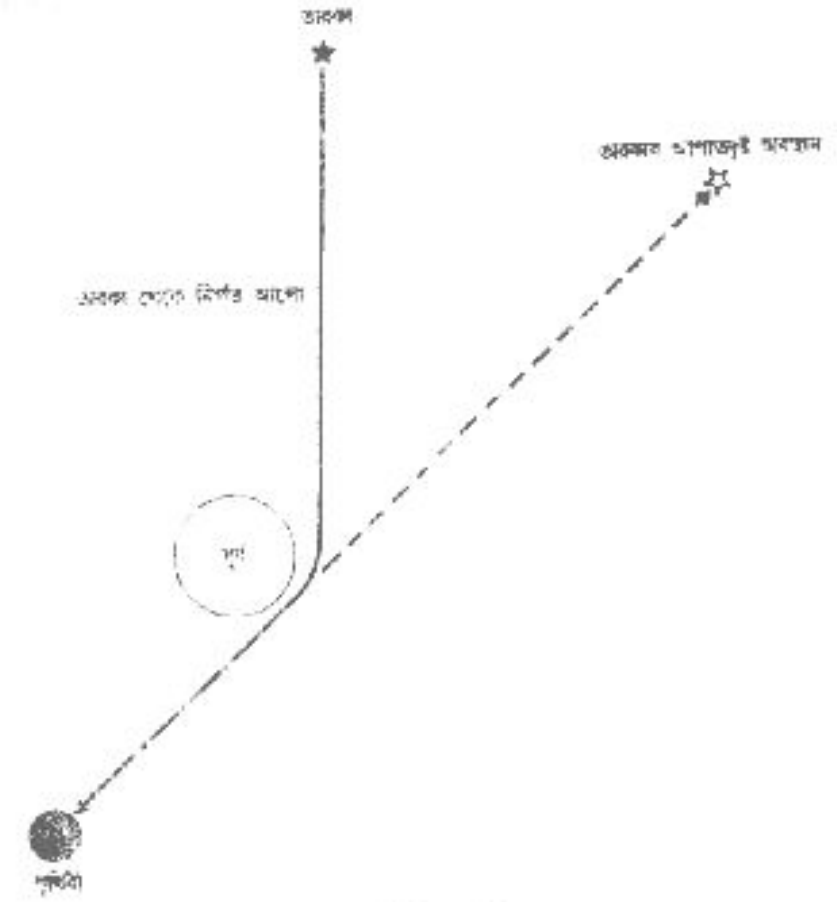

চিত্র - ২.৯

সূর্যের ভর স্থান-কালকে এমনভাবে বাঁকিয়ে দেয় যে পৃথিবী যদিও চতুর্মাত্রিক স্থান-কালে ঋজুপথ অনুসরণ করে, তবুও আমাদের মনে হয় পৃথিবী ত্রিমাত্রিক স্থানে বৃত্তাকার কক্ষে চলমান। আসলে ব্যাপক অপেক্ষবাদ গ্রহগুলির কক্ষ সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করছে তা মহাকর্ষ বিষয়ে নিউটনীয় তত্ত্বের সঙ্গে প্রায় নির্ভুলভাবে অভিন্ন। বুধগ্রহ সূর্যের নিকটতম এবং মহাকর্ষীয় অভিক্রিয়া তার ক্ষেত্রে সবচাইতে শক্তিশালী। তাছাড়া তার কক্ষ একটু লম্বাটে। ব্যাপক অপেক্ষবাদ কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী করেছে এই উপবৃত্তের দীর্ঘ অক্ষ (long axis) সূর্যের চতুষ্পার্শ্বে বৃত্তাকারে ১০,০০০ বছরে এক ডিগ্রী হিসাবে ঘুরবে। এই অভিক্রিয়া ক্ষুদ্র হলেও ১৯১৫ সালের আগেই এটা দেখা গিয়েছিল এবং আইনস্টাইনের তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণের প্রথম সাক্ষ্যগুলির ভিতরে এটি ছিল একটি। আধুনিক কয়েক বছরে অন্যান্য গ্রহগুলির কক্ষের (orbit) নিউটনীয় ভবিষ্যদ্বাণী থেকে আরও ক্ষুদ্রতর বিচ্যুতি, রাডার (Radar)-এর সাহায্যে মাপা হয়েছে। দেখা গিয়েছে, ব্যাপক অপেক্ষবাদের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে তার ঐক্য রয়েছে।

আলোক রশ্মিকে স্থান-কালে জিওডেসিক অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। তাছাড়া কথা যে বক্র এই তত্ত্বের অর্থ হল: স্থানে আলোককে আর ঋজুরেখায় চলমান বলে মনে হবে না। ব্যাপক অপেক্ষবাদের ভবিষ্যদ্বাণী হল, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র আলোককে বাঁকিয়ে দেবে। উদাহরণ, এই তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সূর্যের নিকটবর্তী বিন্দুগুলির আলোক

শঙ্কু সূর্যের ভরের জন্য অন্তর অভিমুখে সামান্য বঙ্কিম হবে। এর অর্থ হল, দূরবর্তী তারকা থেকে নির্গত আলোক সূর্যের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বিচ্যুত (deflected) হবে। এই বিচ্যুতির কোণ হবে সামান্য। ফলে পৃথিবীর একজন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ তারকাটিকে ভিন্ন স্থানে অবস্থিত বলে মনে হবে (চিত্র-২.৯)। অবশ্য তারকাটি থেকে আলোক যদি সব সময়ই সূর্যের নিকট দিয়ে গমন করে তাহলে আলোক বিচ্যুত (deflected) হচ্ছে, না কি তারকাটি যেখানে দেখা যাচ্ছে সেখানেই অবস্থিত—সেটা আমরা বলতে পারব না। কিন্তু পৃথিবী যখন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তখন বিভিন্ন তারকাকে সূর্যের পশ্চাদ্‌বর্তী বলে মনে হয় এবং তাদের আলোকের বিচ্যুতি ঘটে। সুতরাং সূর্য সাপেক্ষ তাদের আপাতদৃষ্ট অবস্থানের পরিবর্তন হয়।

এই অভিক্রিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা খুব শক্ত। তার কারণ, সূর্যের আলোকের দরুন যে সমস্ত তারকা সূর্যের নিকটবর্তী সেগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সূর্যগ্রহণের সময় এই পর্যবেক্ষণ সম্ভব। তখন সূর্যের আলোককে চাঁদ আটকে দেয়। ১৯১৫ সালে আলোকের বিচ্যুতি সম্পর্কে আইনস্টাইনের ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎক্ষণিক পরীক্ষা সম্ভব হয়নি। কারণ, তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। ১৯১৯ সালের আগে পর্যন্ত এ পরীক্ষা হয়নি। ১৯১৯ সালে একটি ব্রিটিশ অভিযাত্রী দল পশ্চিম আফ্রিকা থেকে একটি গ্রহণ পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন, আলোক সত্যিই সূর্য দ্বারা বিচ্যুত (deflected) হয়। অর্থাৎ তত্ত্ব যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, তাই হয়। একটি জার্মান তত্ত্ব ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক দ্বারা প্রমাণিত হওয়া তখনকার দিনে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দুটি দেশের বন্ধুত্ব পুনঃস্থাপনের সপক্ষে একটি পদক্ষেপ বলে অভিনন্দিত হয়েছিল। সেইজন্য ব্যাপারটা যেন একটা পরিহাস। তার কারণ, সেই অভিযানে যে আলোকচিত্রগুলি নেওয়া হয়েছিল পরে সেগুলি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, তাঁরা যে অভিক্রিয়া মাপতে চেষ্টা করেছিলেন আলোকচিত্রগুলিতে ভুল ছিল তার সমান সমান। তাঁদের মাপনটা ছিল নেহাৎই সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিম্বা তাঁরা যে ফল পেতে চেয়েছিলেন সেটা আগে থাকতেই জানা থাকার দরুনই ব্যাপারটা ঘটেছিল। বিজ্ঞানে এরকম ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। তবে পরবর্তী কয়েকটি পর্যবেক্ষণে আলোকের এই বিচ্যুতি যে সত্য সেটা নির্ভুলভাবে দেখা গিয়েছে।

ব্যাপক অপেক্ষবাদের আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী হল, পৃথিবীর মতো গুরু ভর সম্পন্ন কোনো বস্তুপিণ্ডের সন্নিকটে সময়ের গতি শ্লথ বলে মনে হবে। তার কারণ, আলোকের স্পন্দাঙ্ক (frequency —অর্থাৎ সেকেণ্ড প্রতি আলোক তরঙ্গের সংখ্যা) এবং আলোকের শক্তির ভিতরে একটি সম্পর্ক রয়েছে। শক্তি যত বেশী হবে স্পন্দাঙ্ক তত বাড়বে। আলোক পৃথিবীর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যত উপরে যাবে ততই তার শক্তি ক্ষয় হবে। সুতরাং তার কম্পাঙ্ক কমে যাবে (এর অর্থ হল একটি তরঙ্গশীর্ষ থেকে পরবর্তী তরঙ্গশীর্ষের মধ্যবর্তী কালের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে)। খুব উচ্চে অবস্থিত কোনো লোকের মনে হবে নিচের সব ঘটনাই একটু দেরীতে ঘটছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী পরীক্ষা করা হয়েছিল ১৯৬২ সালে। তখন একটি জলাধার স্তম্ভের উপরে এবং নিচে একজোড়া নির্ভুল ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছিল। যে ঘড়িটা নিচে ছিল অর্থাৎ পৃথিবীর নিকটতর ছিল, দেখা গেল তার গতি ধীরতর। এ তথ্যের

সঙ্গেও ব্যাপক অপেক্ষবাদের নির্ভুল ঐক্য রয়েছে। আধুনিক কালে পৃথিবীর উপরে বিভিন্ন উচ্চতায় স্থাপিত বিভিন্ন ঘড়ির দ্রুতির পার্থক্যের যথেষ্ট ব্যবহারিক গুরুত্ব রয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহ (satellites) থেকে আগত সঙ্কেতের ভিত্তিতে নির্ভুল নৌ এবং বিমান চালন ব্যবস্থার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এর গুরুত্ব বেড়েছে। ব্যাপক অপেক্ষবাদের ভবিষ্যদ্বাণী অগ্রাহ্য করলে অবস্থানের হিসাবে কয়েক মাইল পর্যন্ত ভুল হতে পারে।

নিউটনের গতি বিষয়ক বিধি স্থানে পরম অবস্থান সম্পর্কীয় চিন্তাধারা একদম শেষ করে দেয়। অপেক্ষবাদ শেষ করেছে পরম কালকে। এক জোড়া যমজের কথা ভাবা যাক। অনুমান করা হোক, একজন থাকল একটি পাহাড়ের চূড়াতে আর একজন রইল সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতায় অবস্থিত কোনো সমতলে। প্রথম জনের বয়স দ্বিতীয় জনের তুলনায় তাড়াতাড়ি বাড়বে। সুতরাং তাদের যদি আবার দেখা হয় তাহলে একজনকে আর একজনের চাইতে বয়স্ক বলে মনে হবে। এক্ষেত্রে বয়সের পার্থক্যটা হবে অতি সামান্য। কিন্তু পার্থক্যটা বেশী হবে যদি তাদের ভিতরে একজন মহাকাশ যানে চড়ে আলোকের দ্রুতির কাছাকাছি দ্রুতিতে ভ্রমণ করতে বার হয়। যখন সে ফিরবে তখন সে পৃথিবীতে যে ছিল তার তুলনায় অনেক বেশী তরুণ থাকবে। এ ব্যাপারটাকে বলা হয় যমজ সম্পর্কীয় স্ববিরোধ (twin paradox)। কিন্তু এটা শুধুমাত্র তখনই স্ববিরোধ, যখন মনের ভিতরে পরম কাল সম্পর্কে ধারণা রয়েছে। অপেক্ষবাদে কোনো অনন্য পরম কালের অস্তিত্ব নেই, তার বদলে রয়েছে প্রতিটি ব্যক্তির কালের নিজস্ব মাপন। সেটা নির্ভর করে তার অবস্থানের উপরে এবং সে কি ভাবে চলমান তার উপরে।

১৯১৫ সালের আগে ধারণা ছিল স্থান এবং কাল এক একটি স্থির ক্ষেত্র (arena)। ঘটনাগুলি ঘটে সেখানে, কিন্তু সেখানে যা ঘটছে তার দ্বারা ক্ষেত্রটি নিজে প্রভাবিত হয় না। এমন কি বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল সত্য। বস্তুপিণ্ডগুলি চলমান। তারা পরস্পরকে আকর্ষণ কিম্বা বিকর্ষণ করে কিন্তু কাল এবং স্থান নিরবধি, তার কোনো বিকার নেই (continued unaffected)। স্থান এবং কালকে চিরস্থায়ী ভাবাই ছিল স্বাভাবিক।

কিন্তু ব্যাপক অপেক্ষবাদে পরিস্থিতিটা অনেকটাই অন্যরকম। এখন স্থান এবং কাল গতিশীল রাশি। একটি বস্তুপিণ্ড যখন চলমান কিম্বা একটি বল যখন ক্রিয়াশীল, তখন সে স্থান-কালের বক্রতা প্রভাবিত করে এবং স্থান ও কালের গঠন আবার প্রভাবিত করে বস্তুপিণ্ডগুলির চলন এবং বিভিন্ন বলের ক্রিয়া। মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটছে সেগুলি শুধু স্থান-কালকে প্রভাবিত করে তাই নয়, স্থান-কাল নিজেরাও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু যেমন মহাবিশ্বে যে ঘটনাগুলি ঘটছে স্থান-কাল সম্পর্কে ধারণা ছাড়া সেগুলি সম্পর্কে বলা সম্ভব নয়। ব্যাপক অপেক্ষবাদেও তেমনি মহাবিশ্বের সীমানার বাইরে স্থান-কাল সম্পর্কে বলা অর্থহীন।

পরবর্তী দশকগুলিতে স্থান-কাল সম্পর্কে এই নতুন বোধ (understanding) আমাদের মহাবিশ্ব সম্পর্কীয় ধারণায় বিপ্লব এনেছে। আমাদের প্রাচীন ধারণা ছিল, মহাবিশ্ব মূলত অপরিবর্তনীয়। তার অস্তিত্ব চিরকাল ছিল এবং থাকবে। এর জায়গায় বর্তমান ধারণা: মহাবিশ্ব গতিশীল এবং প্রসারমান। সীমিতকাল পূর্বে তার শুরু এবং ভবিষ্যতে সীমিতকাল পরে তার

শেষও হতে পারে। পরবর্তী অধ্যায়ের বিষয়বস্তু এই বিপ্লব। বহু বছর পরে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় আমার গবেষণা শুরু হয়েছিল এই বিন্দু থেকে। রজার পেনরোজ (Roger Penrose) এবং আমি দেখিয়েছিলাম, আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদের ভিতরে নিহিত রয়েছে এই তত্ত্ব অর্থাৎ মহাবিশ্বের একটি শুরু রয়েছে এবং হয়তো একটা শেষও আছে।

৩

প্রসারমান মহাবিশ্ব

(The Expanding Universe)

কৃষ্ণপক্ষের নির্মল আকাশের দিকে তাকালে সবচাইতে উজ্জ্বল যে সমস্ত বস্তুপিণ্ড দেখা যায়, খুব সম্ভবত সেগুলি শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি গ্রহ। তাছাড়া খুব বেশী সংখ্যক তারকাও থাকে। সেগুলি আমাদের সূর্যেরই মতো তবে আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে। আসলে এই স্থির তারকাগুলির কিছু কিছুকে দেখা যায় পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরস্পর সাপেক্ষ অবস্থানের সামান্য পরিবর্তন করতে। তারা মোটেই স্থির নয়। এর কারণ তুলনায় তারা আমাদের কাছাকাছি। পৃথিবী সূর্য প্রদক্ষিণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঐ তারকাগুলিকে আমাদের বিভিন্ন অবস্থান থেকে দেখতে পাই। ঐগুলিকে দেখা যায় দূরতর তারকাগুলির পশ্চাৎপটে। এটা ভাগ্যের কথা, কারণ, এর ফলে আমরা ঐ সমস্ত তারকা থেকে আমাদের দূরত্ব প্রত্যক্ষভাবে মাপতে সক্ষম। তারা যত নিকটতর হয় তাদের চলাচলও তত বেশী দৃষ্টিগোচর হয়। নিকটতম তারকার নাম প্রক্সিমা সেন্টোরী (Proxima Centauri)। এর দূরত্ব প্রায় চার আলোকবর্ষ (ঐ তারকা থেকে আলোক পৃথিবীতে পৌঁছাতে সময় লাগে চার বছর) কিম্বা প্রায় ২৩ মিলিয়ান মিলিয়ান মাইল। খালি চোখে যে সমস্ত তারা দেখা যায় সেগুলির বেশীর ভাগেরই দূরত্ব আমাদের কাছ থেকে কয়েক শ' আলোকবর্ষের ভিতরে। তুলনায় আমাদের সূর্য আমাদের কাছ থেকে মাত্র আট আলোক মিনিট দূরে। দৃশ্যমান তারকাগুলি রাতের আকাশের সবটাই জুড়ে থাকে বলে মনে হয়। কিন্তু সেগুলি বিশেষ করে একটি বলয়ীতে কেন্দ্রীভূত। আমরা তার নাম দিয়েছি ছায়াপথ (Milky Way)। বহু বছর আগে, অর্থাৎ ১৭৫০ সালে কিছু কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানী মত প্রকাশ করেছিলেন: যদি অনুমান করে নেওয়া যায় : দৃশ্যমান তারকাগুলির অধিকাংশই একটি চাকতির মতো বাহ্যিক গঠনের (disklike

configuration) অন্তর্ভুক্ত তাহলে ছায়াপথের দৃশ্যমান রূপ ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এখনকার ভাষায় যাকে বলে: সর্পিল ছায়াপথ (spiral galaxy)। এটা তারই একটি দৃষ্টান্ত। মাত্র কয়েক দশক পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম হারশেল (Sir William Herschel) বিরাট সংখ্যক তারকার অবস্থান এবং দূরত্ব খুব পরিশ্রমের সঙ্গে তালিকাভুক্ত করে তাঁর এই চিন্তাধারার সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন। তবুও এই ধারণা সম্পূর্ণভাবে মেনে নেওয়া হয় শুধুমাত্র এই শতাব্দীর প্রথমে।

মহাবিশ্ব সম্পর্কিত আমাদের আধুনিক মানস চিত্রের (picture) শুরু ১৯২৪ সালে। তখন আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুইন হাবল (Edwin Hubble) দেখিয়েছিলেন আমাদের ছায়াপথই একমাত্র ছায়াপথ নয়। আসলে রয়েছে আরো বহু ছায়াপথ এবং তাদের মধ্যবর্তী বিরাট বিরাট শূন্যস্থান। এটা প্রমাণ করার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল এই ছায়াপথগুলির দূরত্ব নির্ধারণ। সেগুলি এত দূরে অবস্থিত যে তাদের সত্যিই স্থির বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে নিকটস্থ তারকাগুলির সঙ্গে তাদের বৈসাদৃশ্য রয়েছে। হাবল (Hubble) সেই কারণে দূরত্ব মাপবার জন্য পরোক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। একটি তারকার আপাতদৃষ্ট উজ্জ্বলতা দুটি কারণের উপরে নির্ভর করে। কতটা আলোক এর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে (তারকাটির জ্যোতি– its luminosity) এবং আমাদের কাছ থেকে তারকাটি কত দূরে অবস্থিত। নিকটস্থ তারকাগুলির ক্ষেত্রে আমরা তাদের দৃশ্যমান (apparent) উজ্জ্বলতা এবং দূরত্ব মাপতে পারি। সুতরাং আমরা হিসাব করে তাদের জ্যোতিও বার করতে পারি। আবার উল্টো দিক থেকে বলা যায়: অন্য ছায়াপথগুলির জ্যোতি যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে দৃশ্যমান উজ্জ্বলতা মেপে আমরা তাদের দূরত্ব হিসাব করতে পারি। হাবল (Hubble) দেখেছিলেন, কোনো কোনো ধরনের (certain types) তারকার নৈকট্য যখন এমন যে সেটা মাপা সম্ভব, তখন দেখা যায় যে তাদের জ্যোতি সব সময় একই থাকে। তাঁর যুক্তি: আমরা যদি অন্য ছায়াপথেও ঐ রকম তারকা দেখতে পাই তাহলে আমরা অনুমান করতে পারি তাদের জ্যোতিও এক। সুতরাং সেই ছায়াপথের দূরত্ব গণনা করা সম্ভব। একই ছায়াপথে যদি আমরা অনেকগুলি তারকার ক্ষেত্রে এরকম করতে পারি এবং আমাদের গণনায় যদি সবসময় দূরত্ব একই হয়, তাহলে আমরা আমাদের অনুমানের সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট নিশ্চিত হতে পারি।

এডুইন হাবল (Edwin Hubble) নয়টি বিভিন্ন ছায়াপথের দূরত্ব এইভাবে নির্ণয় করেছিলেন। এখন আমরা জানি আধুনিক দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান প্রায় এক লক্ষ মিলিয়ান ছায়াপথের ভিতরে আমাদের ছায়াপথ একটি। প্রতিটি ছায়াপথে প্রায় এক লক্ষ মিলিয়ান তারকা থাকে। চিত্র—৩.১ একটি সর্পিল ছায়াপথের। অন্য কোনো ছায়াপথবাসী কেউ যদি আমাদের ছায়াপথ দেখেন, মনে হয় তাঁদের কাছে আমাদের ছায়াপথ ঐ রকমই দেখাবে। আমরা এমন একটি ছায়াপথে থাকি যেটা আড়াআড়ি মাপে (across) প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ হবে। আমাদের ছায়াপথটি ধীর গতিতে ঘূর্ণায়মান। এর সর্পিল বাহুগুলিতে অবস্থিত তারকাগুলি প্রায় কয়েকশো মিলিয়ান বছরে একবার করে কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে। আমাদের সূর্য একটি অতি সাধারণ হলুদ তারকা। এর আকার তারকাগুলির গড় আকারের মতোই। এর অবস্থান সর্পিল বাহুগুলির একটির ভিতর দিককার কিনারায়। অ্যারিস্টোটল এবং টোলেমীর

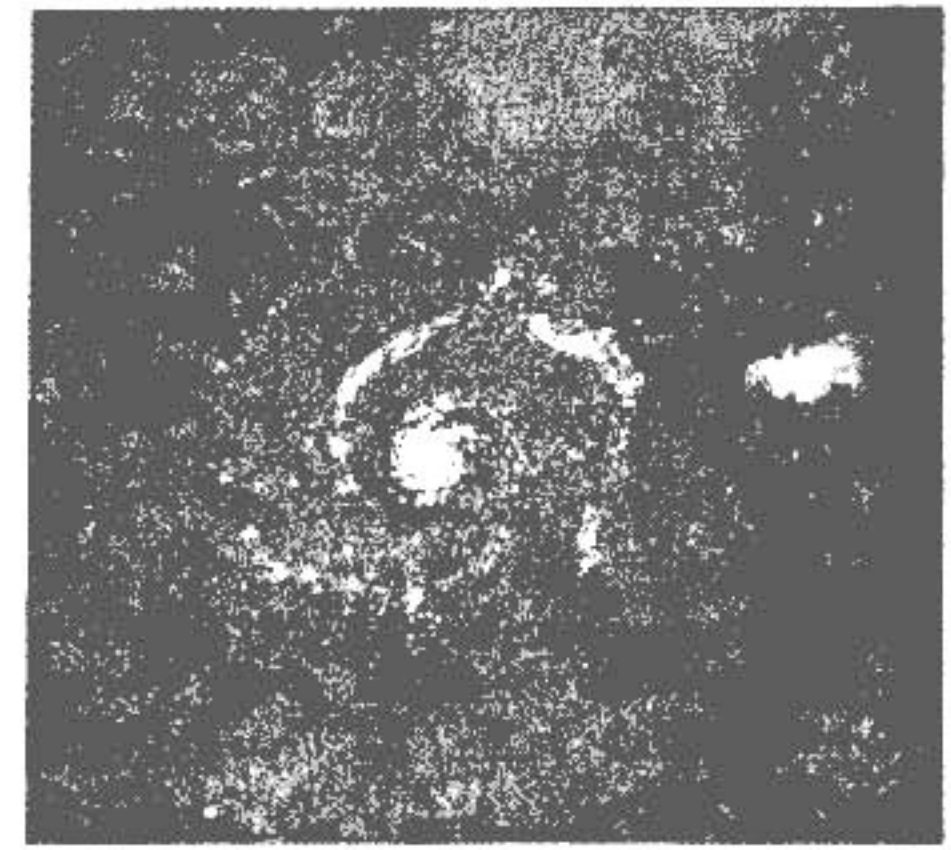

চিত্র - ৩.১

সময় আমরা ভাবতাম পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র। নিশ্চয়ই আমরা সেই সময় থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি।

তারকাগুলি আমাদের কাছ থেকে এত দূরে যে আমাদের কাছে সেগুলিকে এক একটি ক্ষুদ্র আলোক বিন্দুর মতো দেখায়। আমাদের পক্ষে তাদের আকার এবং গঠন দেখা সম্ভব নয়। তা হলে আমরা বিভিন্ন ধরনের তারকাকে কি করে পৃথক করি? তারকাগুলির বিরাট সংখ্যাগুরু অংশের শুধু একটি মাত্র গঠনবৈশিষ্ট্য আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি। সেটা হল: তাদের আলোকের রঙ। নিউটন আবিষ্কার করেছিলেন সূর্যের আলোক যদি একটি কাঁচের প্রিজমের (ত্রিপার্শ্ব কাঁচ) ভিতর দিয়ে যায়, তা হলে আলোক তার উপাদানের বিভিন্ন রঙে ভেঙে যাবে। ঠিক যেমন হয় রামধনুতে (spectrum- আলোকের বর্ণালী)। দূরবীক্ষণ (Telescope) যদি একটি তারকা কিম্বা ছায়াপথের দিকে নিশানা করা যায় তাহলে ঐ রকম ভাবেই একটা তারকা কিম্বা ছায়াপথের আলোকের বর্ণালী পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। বিভিন্ন তারকার বর্ণালী বিভিন্ন। কিন্তু একটি বস্তুপিণ্ড উত্তাপে লোহিত বর্ণ হয়ে যখন দীপ্ত হয়,

তখন তা থেকে বিচ্ছুরিত আলোকে যে রকম আশা করা যায় বিভিন্ন রঙের আপেক্ষিক ঔজ্জ্বল্যও নির্ভুলভাবে সেই রকম (আসলে যে কোনো অস্বচ্ছ বস্তু যখন উত্তপ্ত লোহিতবর্ণ হয়ে দীপ্তিমান হয়, তখন তার একটি বিশিষ্ট বর্ণালী থাকে। সে বর্ণালী শুধুমাত্র তার তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ তাপ-বর্ণালী। এর অর্থ একটি তারকার আলোকের বর্ণালী দেখে আমরা তার তাপমাত্রা বলতে পারি)। তা ছাড়া আমরা দেখতে পাই কয়েকটি অত্যন্ত বিশিষ্ট রঙ তারকাগুলির বর্ণালীতে অনুপস্থিত। এই অনুপস্থিত রঙগুলি এক একটা তারকায় এক এক রকম হতে পারে। আমরা জানি প্রতিটি মৌলিক রাসায়নিক পদার্থ কয়েকটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রঙের কেতা (set) বিশোষণ করে। তারকার বর্ণালীতে যে রঙগুলি অনুপস্থিত, তার সঙ্গে এই রঙগুলি মেলালে আমরা তারকার পরিমণ্ডলে কি কি মৌলিক উপাদান রয়েছে, তা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে পারি।

১৯২০ সালে যখন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অন্য ছায়াপথের তারকাগুলি পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন, তখন তাঁরা অতি অদ্ভুত একটা জিনিষ দেখতে পান। আমাদের নিজেদের ছায়াপথের তারকাগুলির ক্ষেত্রে যে রঙের কেতা (set) অনুপস্থিত, অন্য ছায়াপথের ক্ষেত্রেও সেই বিশিষ্ট রঙের কেতা অনুপস্থিত। কিন্তু তাদের সব কটি ক্ষেত্রেই রঙগুলি বর্ণালীর লোহিত প্রান্তের দিকে বিচ্যুত এবং সেই বিচ্যুতির পরিমাণ একই। এই তথ্যের ফলশ্রুতি বুঝতে হলে আমাদের প্রথম বুঝতে হবে ডপ্লার অভিক্রিয়া (Doppler effect)। আমরা দেখেছি দৃশ্যমান আলোক, বিদ্যুৎ চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্থিরতা (fluctuation) বা তরঙ্গ। আলোকের স্পন্দাঙ্ক (frequency অর্থাৎ সেকেণ্ড প্রতি তরঙ্গের সংখ্যা) খুব বেশী—সেক্ষেত্রে তার থেকে সাত লক্ষ মিলিয়ন মিলিয়ন। মানুষের চোখে যা বিভিন্ন বর্ণ বলে প্রতিভাত হয় সেগুলি হল আলোকের বিভিন্ন স্পন্দাঙ্ক (frequency)। সর্বনিম্ন স্পন্দাঙ্ক দেখা যায় বর্ণালীর লালের দিকে এবং সর্বোচ্চ স্পন্দাঙ্ক থাকে নীলের দিকে। এবার কল্পনা করা যাক আমাদের কাছ থেকে স্থির দূরত্বে অবস্থিত তারকার মতো একটি আলোকের উৎস এবং কল্পনা করা যাক সেখান থেকে একটি স্থির স্পন্দাঙ্ক বিশিষ্ট আলোক উৎসারিত হচ্ছে। স্পষ্টতই যে তথ্য আমরা পাই তার স্পন্দাঙ্ক এবং সেই তরঙ্গগুলি যখন উৎসারিত হচ্ছে, সেগুলির স্পন্দাঙ্ক—এই দুটি হবে অভিন্ন (ছায়াপথের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য ক্রিয়া হওয়ার মতো শক্তিশালী হবে না)। অনুমান করা যাক, উৎসটি আমাদের অভিমুখে চলতে শুরু করেছে। উৎসটি যখন পরবর্তী তরঙ্গশীর্ষ পাঠাবে, তখন সেটি হবে আমাদের নিকটতর। সুতরাং তরঙ্গশীর্ষের আমাদের কাছে পৌঁছাতে যে পরিমাণ সময় লাগবে, সেটা উৎস যখন স্থির ছিল, তখন যে সময় লাগত তার চাইতে কম। অর্থাৎ দুটি তরঙ্গশীর্ষের মধ্যবর্তী সময় [illegible] প্রতিটি সেকেণ্ডে আমাদের কাছে যে তরঙ্গ পৌঁছাবে (অর্থাৎ স্পন্দাঙ্ক) তার সংখ্যাটাও তারকার স্থির অবস্থার তুলনায় বেশী হবে। অনুরূপভাবে উৎস যদি আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যায়, তাহলে আমাদের কাছে যে তরঙ্গগুলি পৌঁছাবে তার স্পন্দাঙ্ক হবে কমতর। সুতরাং আলোকের ক্ষেত্রে আমাদের কাছ থেকে দূরে অপসৃয়মান তারকাগুলি থেকে নির্গত আলোক বর্ণালীর লাল প্রান্ত অভিমুখে বিচ্যুত হবে (লাল বিচ্যুতি) এবং আমাদের অভিমুখে যারা চলমান তাদের বর্ণালীতে থাকবে নীল অভিমুখে বিচ্যুতি। স্পন্দাঙ্ক এবং ক্রমের ভিতরে এই

সম্পর্ককে বলা হয় ডপ্লার অভিক্রিয়া (Doppler effect)। তবে এ অভিক্রিয়া কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অংশ। রাস্তা দিয়ে চলমান একটি গাড়ীর শব্দ শুনুন : গাড়ীটা যখন কাছে এগিয়ে আসে তখন তার ইঞ্জিনের শব্দের তীক্ষ্ণতা তীব্রতর হয় (শব্দ উচ্চতর স্পন্দাঙ্কের অনুরূপ) এবং গাড়ীটি যখন কাছে এসে দূরে অপসরণ করে তখন তার শব্দের তীক্ষ্ণতা নিম্নতর হয়। বেতার তরঙ্গ কিম্বা আলোক তরঙ্গেরও আচরণ এক রকম। আসলে পুলিশ গাড়ীর দ্রুতি মাপবার জন্য ডপ্লার অভিক্রিয়া ব্যবহার করে। পদ্ধতিটা হল গাড়ী থেকে প্রতিফলিত বেতার তরঙ্গের ঘাতের (pulse) স্পন্দাঙ্ক মাপা।

অন্যান্য ছায়াপথের অস্তিত্ব প্রমাণিত করার পরের বছরগুলিতে হাবল্ (Hubble) তাঁর সময় ব্যয় করেছেন ছায়াপথগুলির দূরত্বের তালিকা প্রস্তুত করে এবং তাদের বর্ণালী পর্যবেক্ষণ করে। সেই সময় অধিকাংশ লোকেরই আশা ছিল ছায়াপথগুলি বেশ এলোমেলোভাবে চলমান। সুতরাং আশা ছিল নীল বিচ্যুতি এবং লাল বিচ্যুতির সংখ্যা সমান সমান হবে। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন, অধিকাংশ ছায়াপথেই লাল বিচ্যুতি রয়েছে, অর্থাৎ সবগুলিই আমাদের কাছ থেকে দূরে অপসরণ করছে, তখন তাঁরা রীতিমতো বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু আরো বিস্মিত হওয়ার কারণ ছিল : ১৯২৯ সালে হাবলের প্রকাশিত আর একটি পর্যবেক্ষণ ফল। ছায়াপথগুলির লাল বিচ্যুতির পরিমাণও এলোমেলো নয়। এই বিচ্যুতি আর আমাদের কাছ থেকে ছায়াপথের দূরত্ব সমানুপাতিক (directly proportional) অর্থাৎ অন্য কথায় ছায়াপথটি যত দূরে, তার দূরাপসরণের গতিও তত বেশী। এর অর্থ হল, মহাবিশ্ব স্থিতাবস্থায় নেই। আগেকার দিনে সবাই ভাবত মহাবিশ্ব স্থিতাবস্থাতেই রয়েছে। কিন্তু মহাবিশ্ব আসলে প্রসারমান। ছায়াপথগুলির অন্তর্বর্তী দূরত্ব সব সময়ই বেড়ে চলেছে।

মহাবিশ্ব প্রসারমান এই আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর বৃহত্তম বৌদ্ধিক বিপ্লবগুলির অন্যতম। পশ্চাদ্দৃষ্টি দিয়ে (আবিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর) আমরা অবাক হয়ে ভাবতে পারি এর আগে কেন কেউ এমনটা ভাবে নি। নিউটন এবং অন্যদের বোঝা উচিত ছিল, স্থির বিশ্ব অচিরে মহাকর্ষের প্রভাবে সঙ্কুচিত হতে শুরু করবে। কিন্তু তার বদলে অনুমান করা যাক মহাবিশ্ব প্রসারমান। এই প্রসারণ যদি যথেষ্ট শ্লথ গতিতে হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত মহাকর্ষীয় বল প্রসারণ বন্ধ করবে এবং তারপর শুরু হবে সঙ্কোচন। কিন্তু এ প্রসারণ যদি একটি বিশেষ ক্রান্তিক হারের (critical rate) চাইতে বেশী হয় তা হলে মহাকর্ষীয় বল এমন শক্তিশালী হবে না যে প্রসারণ বন্ধ করতে পারে এবং মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারণশীলই থাকবে। ভূপৃষ্ঠ থেকে একটি রকেট (হাউই) ছাড়লে যা হয় ব্যাপারটা অনেকটা সেই রকম হবে। রকেটের গতি যদি যথেষ্ট ধীর হয়, তা হলে মহাকর্ষ শেষ পর্যন্ত রকেটটাকে থামিয়ে দেবে এবং তারপর রকেটটি পড়তে থাকবে। অন্যদিকে রকেটের গতি যদি একটি ক্রান্তিক দ্রুতির (critical speed) বেশী হয় (সেকেণ্ডে প্রায় সাত মাইল) তাহলে মহাকর্ষীয় শক্তির তাকে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা থাকবে না। সুতরাং রকেটটি অনন্তকাল ধরে পৃথিবী থেকে দূরে অপসরণ করবে। উনবিংশ শতাব্দীতে কিম্বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকেও মহাবিশ্বের এই আচরণ সম্পর্কে নিউটনের মহাকর্ষীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেত। অথচ স্থির মহাবিশ্ব সম্পর্কে বিশ্বাস এতই দৃঢ় ছিল যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকটা পর্যন্ত সে বিশ্বাস

টিকে রইল। এমন কি ১৯১৫ সালে আইনস্টাইন যখন ব্যাপক অপেক্ষবাদ গঠন করেন, তখনও পৃথিবীর স্থিরত্ব সম্পর্কে তিনি এত নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি এ স্থিরত্ব সম্ভব করার জন্য তাঁর সমীকরণে একটি তথাকথিত সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্রুবক (cosmological constant) ব্যবহার করেছিলেন। তিনি নতুন একটি মহাকর্ষ বিরোধী বল (anti gravity) উপস্থাপন করেছিলেন। এ বলের অন্যান্য বলের মতো কোনো বিশেষ উৎস ছিল না। এ বল তৈরী ছিল স্থান-কালের গঠনের ভিতরেই। তিনি মনে করতেন, স্থান-কালের ভিতরে একটি অন্তর্নিহিত (inbuilt) প্রসারণ প্রবণতা রয়েছে এবং এ প্রবণতাকে মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থের মহাকর্ষীয় বল মিলে নাকচ করে নিটুল ভারসাম্য সৃষ্টি করে। এর ফলশ্রুতি সুস্থির বিশ্ব। মনে হয় শুধু একজনই ব্যাপক অপেক্ষবাদকে তার অভিহিত মূল্যে (face value) গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। আইনস্টাইন এবং অন্যান্য পদার্থবিদরা যখন ব্যাপক অপেক্ষবাদের অস্থিরবিশ্ব সম্পর্কীয় ভবিষ্যদ্বাণী এড়িয়ে যাওয়ার উপায় খুঁজছিলেন, তখন রুশ পদার্থবিদ এবং গণিতবিদ আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যান চেষ্টা করেছেন ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার।

ফ্রিডম্যান মহাবিশ্ব সম্পর্কে দুটি সহজ সরল অনুমান করেছিলেন: আমরা যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন মহাবিশ্বের রূপ একই রকম দেখায় এবং আমরা যদি মহাবিশ্বকে অন্য কোনো স্থান থেকে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে মহাবিশ্বকে একই রকম দেখাবে। শুধুমাত্র এই দুটি অনুমান থেকেই ফ্রিডম্যান দেখিয়েছিলেন মহাবিশ্বকে স্থির মনে করা আমাদের উচিত নয়। আসলে এডুইন হাবলের আবিষ্কারের কয়েক বছর আগে ১৯২২ সালে ফ্রিডম্যান হাবলের যে আবিষ্কার সেটাই নির্ভুলভাবে বলেছিলেন। এটা ছিল ফ্রিডম্যানের ভবিষ্যদ্বাণী।

সমস্ত অভিমুখেই মহাবিশ্ব দেখতে এক রকম এ অনুমান বাস্তবে স্পষ্টতই সত্য নয়। উদাহরণ: আমরা দেখেছি আমাদের নীহারিকার অন্যান্য তারাগুলি আকাশে একটি স্পষ্ট আলোক বন্ধনী (band of light) সৃষ্টি করে। এর নাম ছায়াপথ। কিন্তু আমরা যদি দূরের নীহারিকাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে মনে হবে তাদের তারকাগুলির সংখ্যা প্রায় একই। মহাবিশ্বকে সব অভিমুখেই মোটামুটি এক রকম দেখায়। অবশ্য আমরা যদি নীহারিকাগুলির অন্তর্বর্তী দূরত্বের সঙ্গে তুলনীয় বিরাট মাত্রায় পর্যবেক্ষণ করি এবং স্বল্প মাত্রায় পর্যবেক্ষণে যে পার্থক্য দেখা যায় তাকে যদি অগ্রাহ্য করি তা হলেই এ তথ্য সত্য। অনেক দিন পর্যন্ত ফ্রিডম্যানের অনুমানের সপক্ষে এই যুক্তিই ছিল যথেষ্ট। এটা ছিল বাস্তব মহাবিশ্বের মোটামুটি একটা আসল রূপ কিন্তু আরো আধুনিক কালে একটি আকস্মিক শুভ ঘটনায় ফ্রিডম্যানের অনুমান যে মহাবিশ্ব সম্পর্কীয় উল্লেখযোগ্য নির্ভুল বিবরণ—সেই তথ্য আবিষ্কৃত হল।

১৯৬৫ সালে আর্নো পেঞ্জিয়াস্ (Arno Penzias) এবং রবার্ট উইলসন (Robert Wilson) নামে দুজন আমেরিকান পদার্থবিদ নিউ জার্সির বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরীতে দুটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর অণুতরঙ্গ (microwave) অভিজ্ঞাপক যন্ত্র (detector) পরীক্ষা করছিলেন (অণুতরঙ্গগুলি আলোক তরঙ্গেরই মতো, তবে তাদের স্পন্দাঙ্ক সেকেণ্ডে মাত্র দশ হাজার মিলিয়ান)। পেঞ্জিয়াস এবং উইলসন দেখলেন, তাঁদের যন্ত্রে যে পরিমাণ গোলমাল (শব্দ) ধরা পড়া উচিত তার চাইতে বেশী গোলমাল ধরা পড়ছে। ওঁরা চিন্তিত হলেন। গোলমাল (noise) কোনো বিশেষ অভিমুখ থেকে আসছিল বলে মনে হয় নি। প্রথমে তাঁরা তাঁদের গ্রাহকযন্ত্রে

কিছু পাখির মল পেলেন। তখন তাঁরা খুঁজতে লাগলেন যন্ত্রের বিকৃতির অন্য কোনো সম্ভাব্য কারণ। পরে সে সম্ভাবনাও দেখা গেল না। তাঁরা জানতেন, গ্রাহকযন্ত্র যখন সোজাসুজি উপর অভিমুখী তার তুলনায় যখন সে রকম নয়, তখনই পরিমণ্ডলের যে কোনো গোলযোগ বেশী শক্তিশালী হয়। তার কারণ আলোক রশ্মি যখন সোজাসুজি উপর দিক থেকে গৃহীত হয়, তখনকার তুলনায় যখন দিক্‌চক্রবাল(horizon) থেকে গৃহীত হয় তখন তাকে পরিমণ্ডলের অনেক বেশী অংশ অতিক্রম করতে হয়। অভিজ্ঞাপক যন্ত্রের অভিমুখ যাই হোক না কেন, বাড়তি গোলযোগটা একই থাকে। সুতরাং এ গোলযোগ অবশ্যই পরিমণ্ডলের বাইরে থেকে আগত। সারা বছর, দিনরাত এই গোলযোগ একই রকম। অথচ পৃথিবী তার অক্ষে ঘুরছে এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এ থেকে বোঝা গিয়েছিল এই বিকিরণ আসছে সৌরমণ্ডলের বাইরে থেকে, এমন কি, নীহারিকারও বাইরে থেকে। তাছাড়া পৃথিবীর গতির সঙ্গে অভিজ্ঞাপক যন্ত্রের অভিমুখের পরিবর্তনের ফলে এই গোলযোগেরও পরিবর্তন হোত। আসলে আমরা জানি এই বিকিরণ পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের অধিকাংশ অতিক্রম করে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। যেহেতু, সব অভিমুখেই এটা অভিন্ন সেইজন্য মহাবিশ্বও সবদিকে এক রকম। অবশ্য যদি শুধুমাত্র বৃহৎ মানে (large scale) বিচার করা হয়। এখন আমরা জানি, আমরা যে অভিমুখেই অনুসন্ধান করি না কেন, গোলযোগের পরিমাণের যে পরিবর্তন হয়, সেটা দশ হাজার ভাগের এক ভাগের বেশী নয়। সুতরাং পেঞ্জিয়াস্ এবং উইলসন ফ্রিডম্যানের প্রথম অনুমানের নির্ভুল সত্যতার একটা উল্লেখযোগ্য প্রমাণ আবিষ্কার করেছিলেন। অথচ, এ আবিষ্কার করার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না।

প্রায় একই সময়ে নিকটবর্তী প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন পদার্থবিজ্ঞানী বব্ ডিক্ (Bob Dicke) এবং জিম্ পিব্‌লস্ (Jim Peebles) অণুতরঙ্গ নিয়ে কাজ করছিলেন। তাঁরা জর্জ গ্যামোর (George Gamow) [জর্জ গ্যামো একসময় আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যানের (Alexander Friedmann) ছাত্র ছিলেন] একটি প্রকল্প (suggestion) নিয়ে কাজ করছিলেন। প্রকল্পটি হল, মহাবিশ্বের আদিম অবস্থায় খুবই ঘন এবং উত্তপ্ত হওয়া উচিত, হওয়া উচিত তাপদীপ্ত এবং উত্তাপে সাদা। ডিক্ এবং পিব্‌লসের যুক্তি ছিল আদিম মহাবিশ্বের দীপ্তি এখনও আমাদের দেখতে পাওয়া উচিত। তার কারণ, মহাবিশ্বের বহু দূরবর্তী অংশ থেকে আলোক আমাদের কাছে মাত্র বর্তমান কালেই এসে পৌঁছাচ্ছে। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারের অর্থ, এই আলোকেরও এত বেশী লাল বিচ্যুতি হবে যে আমাদের কাছে সেগুলিকে দেখাবে অণুতরঙ্গ বিকিরণের মতো। ডিক্ এবং পিব্‌ল্ বিকিরণ অনুসন্ধান করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। পেঞ্জিয়াস্ এবং উইলসন তাঁদের গবেষণার সংবাদ পেয়ে বুঝতে পারলেন তাঁরা নিজেরা এটা আগেই আবিষ্কার করেছেন। পেঞ্জিয়াস্ এবং উইলসন এজন্য ১৯৭৮ সালে নোবেল পুরস্কার পান (মনে হয় ডিক্ ও পিব্‌ল এর জন্য দুঃখ পেয়েছিলেন, গ্যামোর কথা না হয় নাই বলা হল)।

আমরা যে অভিমুখে লক্ষ্য করি না কেন মহাবিশ্ব একই রকম দেখায় এ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণগুলি প্রথমে দেখলে মনে হতে পারে মহাবিশ্বের যে অংশে আমরা বসবাস করি, তার নিশ্চয়ই একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। বিশেষ করে, সমস্ত নীহারিকাগুলিকে যদি আমাদের কাছ থেকে দূরে অপসরণ করছে বলে দেখতে পাই, তা হলে মনে হতে পারে, আমরা

নিশ্চয়ই মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থান করছি। এর কিন্তু একটা বিকল্প ব্যাখ্যাও রয়েছে। যে কোনো নীহারিকা থেকে দেখলে প্রতিটি অভিমুখে মহাবিশ্বকে একই রকম দেখতে পাবে। আমরা দেখেছি এটা ছিল ফ্রিডম্যানের (Friedmann) দ্বিতীয় অনুমান। এই অনুমানের সপক্ষে কিম্বা বিপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আমাদের নেই। শুধুমাত্র বিনয়ের জন্যই আমরা এ তত্ত্বে বিশ্বাস করি : আমাদের সব দিকেই যদি মহাবিশ্বকে একই রকম দেখায়, কিন্তু মহাবিশ্বের অন্য কোনো জায়গা থেকে সে রকম না দেখায়, তা হলে ব্যাপারটা খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হোত। ফ্রিডম্যানের প্রতিরূপ বলে, প্রতিটি নীহারিকাই প্রত্যেকভাবে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। পরিস্থিতি অনেকটা একটা বেলুনের মতো। বেলুনটার কয়েকটা বিন্দুতে রঙ লাগানো আছে এবং বেলুনটা অবিরাম ফোলানো হচ্ছে। বেলুনটা ফোলার সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো দুটি বিন্দুর অন্তর্বর্তী দূরত্ব বাড়ে, কিন্তু কোনো বিন্দুকেই প্রসারণের কেন্দ্র বলা যায় না। তাছাড়া, বিন্দুগুলির দূরত্ব যত বাড়বে, তারা তত তাড়াতাড়ি পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবে। একইভাবে ফ্রিডম্যানের প্রতিরূপে দুটি নীহারিকার পরস্পর থেকে দূরাপসারণের দ্রুতি তাদের অন্তর্বর্তী দূরত্বের আনুপাতিক। সুতরাং এ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া গিয়েছিল : একটি নীহারিকার সাল্ল বিস্তৃতি আমাদের কাছ থেকে তার দূরত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক (directly proportional)। হাবল্ যা আবিষ্কার করেছিলেন, এ তথ্য তার সঙ্গে নিখুঁতভাবে মেলে। এই প্রতিরূপ সাফল্যলাভ করেছিল এবং তিনি হাবলের পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন। কিন্তু তবুও মহাবিশ্বের সমরূপ প্রসারণ সম্পর্কে হাবলের আবিষ্কারে সাড়া দিয়ে আমেরিকান পদার্থবিদ হাওয়ার্ড রবার্টসন (Howard Robertson) এবং ব্রিটিশ গণিতবিদ আর্থার ওয়াকার (Arthur Walker) ১৯৩৫ সালে সদৃশ প্রতিরূপ আবিষ্কার না করা পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশে ফ্রিডম্যানের গবেষণা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অজানা ছিল।

ফ্রিডম্যান একটি প্রতিরূপই আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু আসলে তাঁর দুটি মূলগত অনুমান মেনে চলার মতো তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রতিরূপ রয়েছে। প্রথমটিতে (এটা আবিষ্কার করেছিলেন ফ্রিডম্যান) মহাবিশ্ব যথেষ্ট ধীরভাবে প্রসারমান এবং বিভিন্ন নীহারিকার পরস্পরের প্রতি মহাকর্ষীয় আকর্ষণের দরুন প্রসারণ ধীরতর হবে এবং শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে। নীহারিকাগুলি তারপর পরস্পরের অভিমুখে যেতে থাকে এবং মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত হয়। চিত্র ৩.২ তে (পৃ...৬১) দেখা যাচ্ছে, সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী দুটি নীহারিকার অন্তর্বর্তী দূরত্বের কি রকম পরিবর্তন হয়। শুরু হয় শূন্য (০), বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছায়, তারপর আবার শূন্যে নেমে যায়। দ্বিতীয় ধরনের সমাধানে মহাবিশ্ব এত দ্রুত প্রসারমান যে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ কখনোই এ প্রসারণ বন্ধ করতে পারে না, তবে একটু ধীরতর করতে পারে। চিত্র ৩.৩-এ দেখা যাচ্ছে, এই প্রতিরূপে প্রতিবেশী নীহারিকাগুলির বিচ্ছিন্নতা (separation) । এটা শুরু হয় শূন্য থেকে এবং শেষ পর্যন্ত নীহারিকাগুলি পরস্পর থেকে স্থির দ্রুতিতে দূরাপসরণ করে। আর শেষে আছে তৃতীয় সমাধান। এই সমাধানে মহাবিশ্বের প্রসারণের গতি শুধুমাত্র যাতে আবার চুপসে না যায়, সেই রকম। চিত্র ৩.৪-এ দেখানো

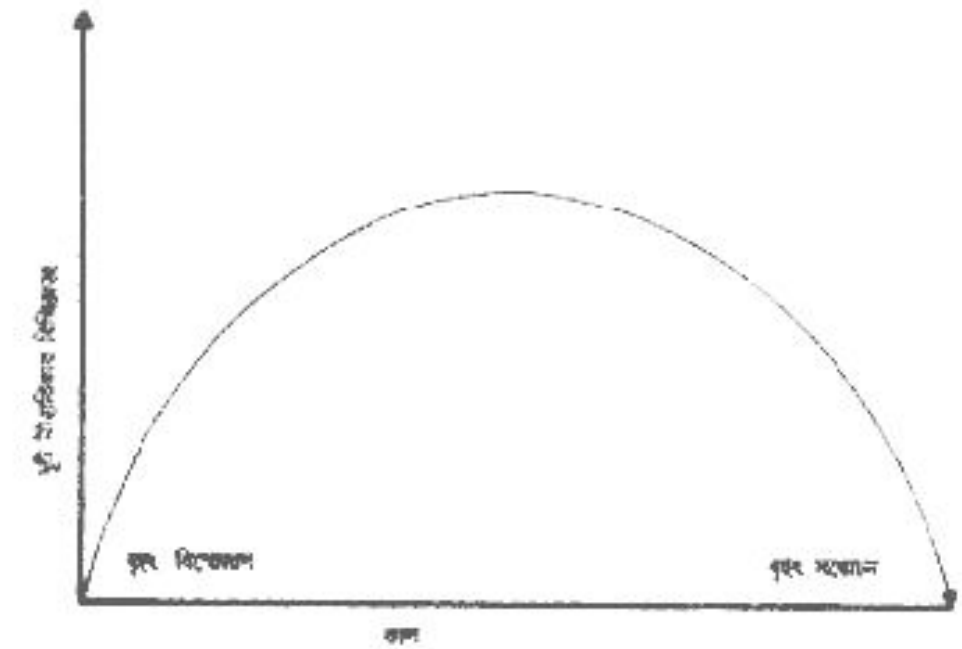

চিত্র- ৩.২

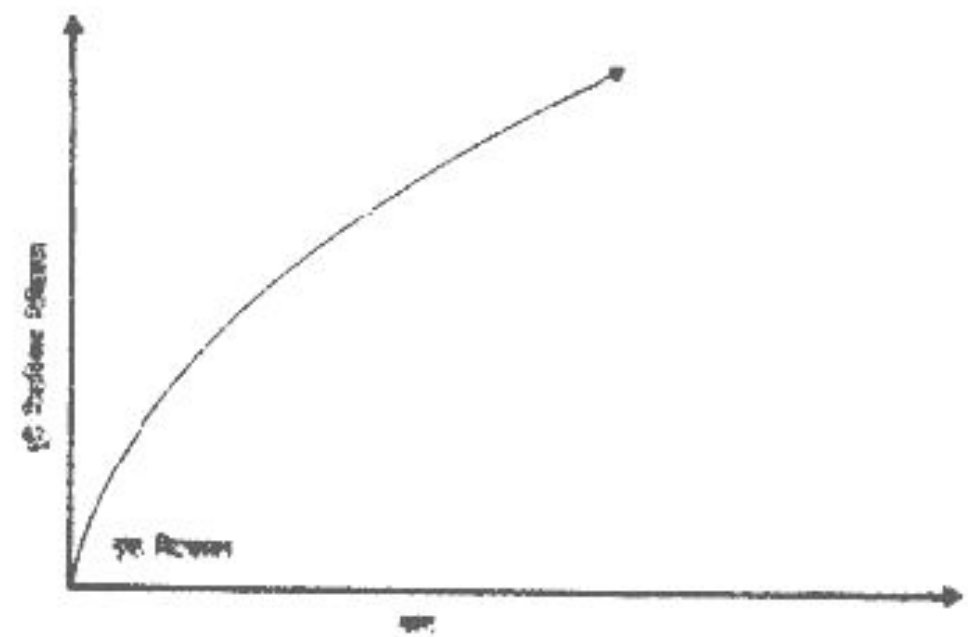

চিত্র- ৩.৩

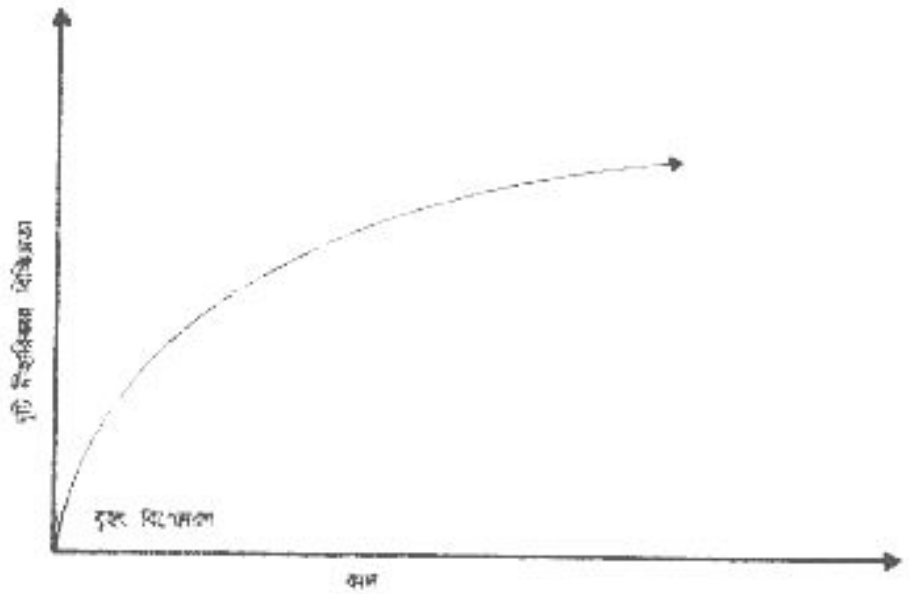

চিত্র ৩.৪

হয়েছে এই ক্ষেত্রেও প্রসারণ শুরু হয় শূন্যে এবং চিরকাল বাড়তে থাকে। কিন্তু নীহারিকাগুলির পরস্পর থেকে দূরাপসরণের দ্রুতি ক্রমশই কমতে থাকে তবে কখনোই একেবারে শূন্যে পৌঁছায় না।

ফ্রিডম্যানের প্রথম ধরনের প্রতিরূপের একটা উল্লেখযোগ্য অবয়ব হল : মহাবিশ্ব স্থানে অসীম নয়, কিন্তু স্থানেরও কোনো সীমারেখা (boundary) নেই। মহাকর্ষ এত শক্তিশালী যে স্থান নিজেই নিজের উপরে গোল হয়ে বেঁকে যায় (is bent)। ফলে এটা হয় অনেকটা ভূপৃষ্ঠের মতো। ভূপৃষ্ঠে বিশেষ আউমুখে গমন করলে কেউই অলঙ্ঘনীয় বাধার মুখোমুখি হয় না কিম্বা কিনারা থেকে পড়ে যায় না, বরং শেষ পর্যন্ত যেখান থেকে রওনা হয়েছিল, সেখানেই ফিরে আসে। ফ্রিডম্যানের প্রথম প্রতিরূপে স্থান ঠিক এই রকম। তবে ভূপৃষ্ঠের দুটি মাত্রার বদলে স্থানের রয়েছে তিনটি মাত্রা। চতুর্থ মাত্রা কালও বিস্তৃতির দিক থেকে সীমিত। কিন্তু এটা দুটি প্রান্ত বা সীমানা সমন্বিত রেখার মতো—আদি এবং অন্ত। পরে আমরা দেখব ব্যাপক অপেক্ষবাদের সঙ্গে কণাবাদী বলবিদ্যার (quantum mechanics) সমন্বয় করলে স্থান এবং কাল হতে পারে সসীম অথচ কোনো কিনারা কিম্বা সীমানা বিহীন।

গোটা মহাবিশ্ব পরিভ্রমণ করে যেখান থেকে যাত্রাশুরু হয়েছিল, সেখানেই ফিরে আসা সম্ভব এই ধারণা ভাল বৈজ্ঞানিক কল্পকথার ভিত্তি হতে পারে, কিন্তু এর বিশেষ কোনো ব্যবহারিক গুরুত্ব নেই। তার কারণ দেখানো যেতে পারে ভ্রমণ শেষ হওয়ার আগেই মহাবিশ্ব

চুপসে যাবে এবং তার আয়তন শূন্যে পৌঁছাবে। মহাবিশ্ব শেষ হয়ে যাওয়ার আগে, যেখান থেকে যাত্রা শুরু, সেখানে পৌঁছাতে হলে আলোকের চাইতে দ্রুতগতিতে চলতে হবে। সেটা অনুমোদনীয় নয়।

ফ্রিডম্যানের প্রতিরূপের প্রথম ধরনটায় মহাবিশ্ব প্রসারিত হয় আবার চুপসে যায়, স্থান নিজের উপরেই বাঁকানো– অনেকটা ভূপৃষ্ঠের মতো। সুতরাং এ বিস্তার সীমিত। দ্বিতীয় প্রতিরূপে মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারণশীল। স্থান ঘোড়ার জিনের (saddle) মতো অন্যদিকে বাঁকানো। সুতরাং এ ক্ষেত্রে স্থান অসীম। সব চাইতে শেষেরটা অর্থাৎ ফ্রিডম্যানের তৃতীয় প্রতিরূপে প্রসারণের হার শুধুমাত্র ক্রান্তিক (critical)। সুতরাং স্থান সমতল (অতএব অসীমও বটে)।

কিন্তু ফ্রিডম্যানের কোন প্রতিরূপ আমাদের মহাবিশ্বের সঠিক বিবরণ? মহাবিশ্বের প্রসারণ কি বন্ধ হয়ে যাবে এবং আবার সঙ্কোচন শুরু হবে; নাকি চিরকাল প্রসারণ চলবে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের জানা দরকার মহাবিশ্বের প্রসারণের বর্তমান হার এবং তার বর্তমান গড় ঘনত্ব। ঘনত্ব যদি একটি বিশেষ ক্রান্তিক পরিমাণের চাইতে কম হয় (এটা স্থির করা হয় প্রসারণের হার থেকে), তাহলে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ প্রসারণ বন্ধ করার মতো শক্তিশালী হবে না। ঘনত্ব যদি ক্রান্তিক পরিমাণের চাইতে বেশী হয়, তাহলে ভবিষ্যতে কোনো এক সময় প্রসারণ বন্ধ হয়ে যাবে এবং মহাবিশ্ব আবার চুপসে যাবে।

ডপ্লার অভিক্রিয়ার (Doppler effect) ভিত্তিতে আমাদের কাছ থেকে নীহারিকাগুলি কত দ্রুত দূরাপসরণ করছে সেই গতিবেগ নির্ধারণ করে আমরা মহাবিশ্বের প্রসারণের বর্তমান হার বার করতে পারি। এটা খুব নির্ভুলভাবেই করা যায়। নীহারিকাগুলির দূরত্ব কিন্তু খুব ভালভাবে জানা নেই। তার কারণ আমরা শুধুমাত্র পরোক্ষভাবেই দূরত্ব মাপতে পারি। সুতরাং আমরা যেটুকু জানি, সেটা হল প্রতি হাজার মিলিয়ান বছরে মহাবিশ্ব শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ হারে প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব সম্পর্কে আমাদের অনিশ্চয়তা আরো বেশী। আমরা যদি আমাদের নীহারিকা এবং অন্যান্য নীহারিকার দৃশ্যমান সমস্ত তারকাগুলির ভর যোগ করি, তা হলে যে যোগফল হয় সেটা মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ করার পক্ষে যেটা প্রয়োজন তার এক শতাংশের চাইতেও কম--এমন কি, আমরা যদি প্রসারণের হারের সর্বনিম্ন অনুমান গ্রহণ করি তা হলেও। আমাদের নীহারিকা এবং অন্যান্য নীহারিকায় কিন্তু কিছু অন্ধকারময় পদার্থ নিশ্চয়ই আছে। সেগুলি আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পারি না। কিন্তু নীহারিকাগুলির অন্যান্য তারকার কক্ষের উপর এগুলির মহাকর্ষীয় আকর্ষণের প্রভাব থেকে আমরা জানতে পারি ঐগুলির অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে। তাছাড়া অধিকাংশ নীহারিকাকেই গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় দেখা যায়। নীহারিকাগুলির গতির উপর তাদের প্রভাব থেকে আমরা এই সমস্ত নীহারিকার অন্তর্বর্তীস্থানে আরো অন্ধকারময় পদার্থের অস্তিত্ব অনুমান করি। এই সমস্ত অন্ধকারময় পদার্থ যোগ দিলেও আমরা যা পাই সেটা প্রসারণ বন্ধ করার জন্য যা প্রয়োজন তার এক দশমাংশেরও কম। কিন্তু মহাবিশ্বের সর্বত্র প্রায় সমভাবে বণ্টিত অন্য কোনো পদার্থের অস্তিত্বের সম্ভাবনা আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। হয়তো আমরা এখনো সেটা ধরতে পারি নি। সে পদার্থ হয়তো গড় ঘনত্বকে বাড়িয়ে এমন জায়গায় নিয়ে আসতে পারে, যা

প্রসারণ বন্ধ করার পক্ষে প্রয়োজনীয় ক্রান্তিক পরিমাণে পৌঁছাতে পারে। সেইজন্য আপাতত যা সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, তা থেকে মনে হয়, মহাবিশ্ব চিরকালই প্রসারমান থাকবে। কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে যা বলতে পারি, সেটা হল, মহাবিশ্ব যদি চুপসে যায়ও, তা হলেও সেটা অন্ততপক্ষে আগামী দশ হাজার মিলিয়ান বছরের আগে হবে না। তার কারণ, অন্তত ১০ হাজার মিলিয়ান বছর ধরেই মহাবিশ্ব প্রসারমান রয়েছে। এ নিয়ে অনর্থক দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই আমাদের। কারণ, আমরা যদি সৌর জগতের বাইরে কোথাও উপনিবেশ স্থাপন করতে না পারি, তা হলে তার বহু আগেই আমাদের সূর্য নিভে যাবে এবং তার সঙ্গে মনুষ্য জাতির মৃত্যু হবে!

ফ্রিডম্যানের সবকটি সমাধানেরই একটি দিক হল, কোনো এক অতীতকালে (অতীতে ১০ থেকে ২০ হাজার মিলিয়ান বছরের ভিতরে) প্রতিবেশী নীহারিকাগুলির অন্তর্বর্তী দূরত্ব নিশ্চয়ই ছিল শূন্য। সেই কালকে আমরা বলি বৃহৎ বিস্ফোরণ (big bang)। তখন মহাবিশ্বের ঘনত্ব এবং স্থান-কালের বক্রতা ছিল অসীম। আসলে গণিতশাস্ত্র অসীম সংখ্যা নিয়ে (infinite number) কাজ করতে অক্ষম। এর অর্থ হল, ব্যাপক অপেক্ষবাদের ভবিষ্যদ্বাণী (এটাই ফ্রিডম্যানের সমাধানের ভিত্তি) অনুসারে মহাবিশ্বের এমন একটা বিন্দু আছে যেখানে এই তত্ত্বটা ভেঙে পড়ে। যাকে গণিতবিদরা অনন্যতা (singularity) বলেন এ রকম একটি বিন্দু তারই এক উদাহরণ। আসলে আমাদের সমগ্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই স্থান-কাল মসৃণ এবং প্রায় সমতল (flat) এই অনুমানের ভিত্তিতে গঠিত। বৃহৎ বিস্ফোরণের অনন্যতায় স্থান-কালের বক্রতা অসীম। সুতরাং, সেখানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি ভেঙে পড়ে। এর অর্থ হল বৃহৎ বিস্ফোরণের আগে যদি কোনো ঘটনা থেকেও থাকে, তা হলেও পরবর্তীকালে কি ঘটবে সেটা নির্ধারণ করার জন্য সে সমস্ত ঘটনা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তার কারণ, বৃহৎ বিস্ফোরণে এসে ভবিষ্যদ্বাণীর সম্ভাবনাও ভেঙে পড়ে। অনুরূপভাবে বলা যায়, আমরা যদি শুধুমাত্র জানি বৃহৎ বিস্ফোরণের পরে কি ঘটেছিল (ব্যাপারটা আসলে এই রকমই) তা হলেও আমরা তার আগে কি ঘটেছিল তা নির্ধারণ করতে পারি না। আমাদের ক্ষেত্রে বৃহৎ বিস্ফোরণের আগের ঘটনার কোনো ফলশ্রুতি থাকতে পারে না। সুতরাং মহাবিশ্বের বৈজ্ঞানিক প্রতিরূপের কোনো অংশ সে ঘটনাগুলি হতে পারে না। অতএব সেগুলিকে আমরা প্রতিরূপ থেকে ছেঁটে ফেলব এবং আমরা বলব কালের একটা আরম্ভ ছিল।

কালের একটা আরম্ভ রয়েছে এই ধারণা অনেকেই পছন্দ করেন না। তার কারণ এতে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের গন্ধ রয়েছে (অন্যদিকে ক্যাথলিক চার্চ এই বৃহৎ বিস্ফোরণ প্রতিরূপ গ্রহণ করে ১৯৫১ সালে সরকারীভাবে ঘোষণা করেন এর সঙ্গে বাইবেলের সঙ্গতি রয়েছে)। সুতরাং বৃহৎ বিস্ফোরণ হয়েছিল এই সিদ্ধান্ত এড়ানোর জন্য অনেক প্রস্তাবই উপস্থিত করা হয়েছে। যে প্রস্তাবের সব চাইতে বেশী সমর্থন ছিল তার নাম বলা যেতে পারে স্থিরাবস্থাতত্ত্ব (steady state theory)। ১৯৪৮ সালের এই প্রস্তাবনা ছিল নাজি অধিকৃত অস্ট্রিয়া থেকে পলাতক হারম্যান বন্ডি (Herman Bondi) এবং টমাস গোল্ড (Thomas Gold) এই দুজন এবং ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle) নামে একজন ব্রিটিশের। ফ্রেড হয়েল যুদ্ধের সময় এঁদের সঙ্গে রাডার বিকাশের জন্য কাজ করেছেন। চিন্তনটা ছিল: নীহারিকাগুলি যেমন পরস্পর

থেকে দূরে সরে যায় অন্তর্বর্তী শূন্যস্থানে তেমনি অবিচ্ছিন্নভাবে নতুন নতুন নীহারিকার জন্ম হয়। নতুন পদার্থ সব সময়ই অবিচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি হচ্ছে এবং নীহারিকাগুলি তা থেকেই জন্ম নিচ্ছে। সুতরাং, সর্বকালে এবং স্থানে সর্ববিন্দু থেকে মহাবিশ্বকে একই রকম দেখাবে। অবিচ্ছিন্ন পদার্থ সৃষ্টি মেনে নিতে হলে স্থিরাবস্থাতত্ত্বের প্রয়োজন ছিল ব্যাপক অপেক্ষবাদের পরিবর্তন করা। কিন্তু সৃষ্টির যে হার এর সঙ্গে জড়িত সেটা এত অল্প (প্রতি ঘন কিলোমিটারে বছরে একটি কণা) যে তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। আমরা যে অর্থে প্রথম অধ্যায়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে ভাল বলেছি সেই অর্থে এই তত্ত্বটি ভালই ছিল। অর্থাৎ তত্ত্বটি ছিল সরল এবং এমন সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম যা পর্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রমাণ করতে পারা যায়। একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল: স্থানের একটি নির্দিষ্ট আয়তনের ভিতরে নীহারিকা কিম্বা তার সমতুল্য বস্তুপিণ্ডগুলির সংখ্যা সবসময় একই থাকবে। মহাবিশ্বের যে কোনো কালে এবং যে কোনো স্থানে পর্যবেক্ষণ করলেও কোনো পরিবর্তন হবে না। ১৯৫০-এর দশকের শেষের দিকে এবং ১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে বহির্বিশ্ব থেকে (outer space) আগত রেডিও তরঙ্গগুলির একটা জরিপ হয় (survey)। কাজটা হয়েছিল কেম্ব্রিজে, করেছিলেন মার্টিন রাইলের (Martin Ryle) (ইনিও যুদ্ধের সময় বন্ডি, গোল্ড এবং হয়েলের সঙ্গে রাডার নিয়ে কাজ করেছেন) নেতৃত্বে একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী। কেম্ব্রিজ-এর দলটি দেখিয়েছিলেন, এই সমস্ত রেডিও তরঙ্গের অধিকাংশেরই উৎস অবশ্যই আমাদের নীহারিকার বাইরে (আসলে তরঙ্গের অনেকগুলিই অন্য নীহারিকার সঙ্গে জড়িত বলে বোঝা গিয়েছিল) এবং শক্তিশালী উৎসের তুলনায় দুর্বল উৎসের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। তাঁদের ব্যাখ্যা ছিল দুর্বল তরঙ্গগুলির উৎস অনেক দূরে এবং সবল তরঙ্গগুলির উৎস নিকটে। তখন মনে হয়েছিল স্থানের প্রতিটি ঘন একক প্রতি সাধারণ (common) উৎসের সংখ্যা—দূরতর উৎসগুলির তুলনায় নিকটতর উৎসগুলিতে কম। এ তথ্যের অর্থ এমনও হতে পারে যে আমরা মহাবিশ্বের একটা বিরাট অঞ্চলের (great? মহান) কেন্দ্রে অবস্থান করছি। সে অঞ্চলে তরঙ্গের উৎসগুলি অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় স্বল্প। এর বিকল্প অর্থ হতে পারে উৎসগুলির সংখ্যা অতীতে অর্থাৎ তরঙ্গগুলি যখন আমাদের অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে তখন এখনকার তুলনায় অনেক বেশী ছিল। দুটি ব্যাখ্যাই স্থিরাবস্থাতত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীর বিরোধী। তাছাড়া, ১৯৬৫ সালে পেঞ্জিয়াস্(Penzias) এবং উইলসনের (Wilson) অণুতরঙ্গ বিকিরণ (microwave) আবিষ্কারের ফলে ইঙ্গিত পাওয়া যায় মহাবিশ্ব অতীতে অনেক বেশী ঘন ছিল। সুতরাং স্থিরাবস্থাতত্ত্ব পরিত্যক্ত হল।

একটি বৃহৎ বিস্ফোরণ ঘটেছিল, সুতরাং কালের একটি আরম্ভ আছে এই সিদ্ধান্ত এড়ানোর আর একটি প্রচেষ্টা ছিল ১৯৬৩ সালে দুজন রুশ বৈজ্ঞানিকের—ইভ্‌গেনী লিফশিজ্ (Evgenii Lifshitz) এবং আইজাক খালাতনিকভ (Isaac Khalatnikov) এর। তাঁদের প্রস্তাবনা ছিল বৃহৎ বিস্ফোরণ শুধুমাত্র ফ্রিডম্যানের প্রতিরূপেরই বিশেষত্ব হতে পারে। সেগুলি আসলে বাস্তব মহাবিশ্বের আসন্ন (approximation) প্রতিরূপ মাত্র। হয়তো যে সমস্ত প্রতিরূপগুলি মোটামুটি বাস্তব মহাবিশ্বের অনুরূপ সেগুলির ভিতরে বৃহৎ বিস্ফোরণের অনন্যতা রয়েছে শুধুমাত্র ফ্রিডম্যানের প্রতিরূপে। সে প্রতিরূপে নীহারিকাগুলি প্রত্যক্ষভাবে পরস্পর

থেকে দূরে অপসৃয়মান। সুতরাং অতীতের কোনো কালে সেগুলি একই স্থানে অবস্থিত ছিল এ অনুমানে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু বাস্তব মহাবিশ্বে নীহারিকাগুলি শুধুমাত্র পরস্পর থেকে প্রত্যক্ষভাবে (directly) দূরে অপসৃয়মান তাই নয়; তাদের সামান্য একটু পার্শ্ব অভিমুখী গতিবেগও রয়েছে। সুতরাং, বাস্তবে তাদের ঠিক একই স্থানে একই অবস্থায় থাকার কোনো প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন ছিল শুধুমাত্র খুব কাছাকাছি থাকবার। তাহলে হয়তো বর্তমান প্রসারমান মহাবিশ্ব একটি অনন্য বৃহৎ বিস্ফোরণের ফলশ্রুতি না হতে পারে, হতে পারে পূর্বতন সঙ্কোচনের ফলশ্রুতি। মহাবিশ্ব যখন সঙ্কুচিত হয়ে চুপ্‌সে গেল (collapsed) তখন এর ভিতরকার কণিকাগুলির সবগুলির সংঘর্ষ হয়তো হয়নি, হয়তো সেগুলি পরস্পরকে ছাড়িয়ে দূরে অপসরণ করেছিল এবং সৃষ্টি হয়েছিল মহাবিশ্বের বর্তমান প্রসারণ। তাহলে আমরা কি করে বলতে পারি যে বাস্তব মহাবিশ্বের শুরু একটি বৃহৎ বিস্ফোরণ থেকে? লিফ্‌শিজ এবং খালাতনিকভ মোটামুটি ফ্রিডম্যানের প্রতিরূপের মতো মহাবিশ্বের একাধিক প্রতিরূপ নিয়েও চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু তিনি বাস্তব মহাবিশ্বের নীহারিকাগুলির অনিয়মিত এবং এলোমেলো (random) গতিরও বিচার করেছিলেন। তাতে দেখা গিয়েছিল, নীহারিকাগুলি যদি আর পরস্পর থেকে প্রত্যক্ষভাবে দূরে অপসরণ নাও করে, তা হলেও ঐরকম প্রতিরূপ একটি বৃহৎ বিস্ফোরণ থেকে শুরু হতে পারে। কিন্তু তাঁরা বলেছিলেন, এটার সম্ভাবনা থাকতে পারে শুধুমাত্র এমন কতগুলি প্রতিরূপের ক্ষেত্রে, যেখানে নীহারিকাগুলি নির্ভুল সঠিক ভাবে চলমান। সে সব ক্ষেত্রকে ব্যতিক্রমই বলা উচিত। তাঁদের আরো যুক্তি ছিল বৃহৎ বিস্ফোরণ ছাড়াও ফ্রিডম্যানের প্রতিরূপের মতো অসংখ্য প্রতিরূপ হতে পারে। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত আসলে কোনো বৃহৎ বিস্ফোরণ হয়নি। পরে কিন্তু তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন ফ্রিডম্যানের মতো প্রতিরূপের অনেক বেশী সাধারণ (general) শ্রেণী রয়েছে, যেগুলির এই অনন্যতা থাকতে পারে এবং সে সব ক্ষেত্রে নীহারিকাগুলি একটু বিশেষভাবে চলমান হওয়ার আবশ্যকতা নেই। সুতরাং ১৯৭০ সালে তাঁরা তাঁদের দাবী প্রত্যাহার করে নেন।

লিফ্‌শিজ্ এবং খালাতনিকভের গবেষণা ছিল মূল্যবান, কারণ, এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে ব্যাপক অপেক্ষবাদ যদি নির্ভুল হয়, তা হলে মহাবিশ্বের একটা অনন্যতা থাকতে পারত, হতে পারত একটা বৃহৎ বিস্ফোরণ। কিন্তু এর ফলে একটি নির্ণায়ক সমস্যার সমাধান হয়নি: ব্যাপক অপেক্ষবাদের ভবিষ্যদ্বাণী কি এই যে আমাদের মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে একটি বিস্ফোরণ থাকতে হবে অর্থাৎ থাকতে হবে একটি কালের প্রারম্ভ? এর উত্তর পাওয়া গিয়েছিল ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। ব্রিটিশ গণিত এবং পদার্থবিদ রজার পেনরোজ (Roger Penrose) সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি চিন্তন তখন উপস্থিত করেন। ব্যাপক অপেক্ষবাদের আলোক শঙ্কুর (cone) আচরণ এবং মহাকর্ষের সর্বকালের আকর্ষণের সমন্বয় করে তিনি দেখালেন, একটি তারকা নিজস্ব মহাকর্ষের ফলে চুপ্‌সে যাওয়ার সময় এমন একটি অঞ্চলে বন্দী হয় (trapped) যার পৃষ্ঠ (surface) সঙ্কুচিত হতে হতে শেষপর্যন্ত শূন্যে পরিণত হয়। সে অঞ্চলের পৃষ্ঠ সঙ্কুচিত হয়ে শূন্য পরিণত হয়, সুতরাং তার আয়তনও অবশ্যই শূন্যে পরিণত হবে। তারকার ভিতরের সমস্ত পদার্থ সঙ্কুচিত হয়ে শূন্যে আয়তন বিশিষ্ট অঞ্চলে অবস্থান করবে। সুতরাং পদার্থের ঘনত্ব এবং স্থান-কালের বক্রতাও হবে অসীম। অন্য কথায় কৃষ্ণগহ্বর নামে পরিচিত

স্থান-কালের একটি অঞ্চলের একটি অনন্যতা থাকবে।

প্রথম দৃষ্টিতে পেনরোজের গবেষণার ফল শুধুমাত্র তারকাগুলির ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছিল। অতীতে সমগ্র মহাবিশ্বের একটি বৃহৎ বিস্ফোরণরূপ অনন্যতা ছিল কিনা এই প্রশ্নের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু পেনরোজ (Penrose) যখন তাঁর এ উপপাদ্য উপস্থিত করলেন আমি তখন গবেষণারত ছাত্র। তখন আমি হন্যে হয়ে এমন একটা সমস্যা খুঁজছি যেটা নিয়ে আমার পি. এইচ. ডি-র গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ করা যেতে পারে। দুবছর আগে আমার রোগ নির্ণয় করা হয়েছিল। নির্ণীত হয়েছিল আমি ALS রোগে ভুগছি। রোগটি সাধারণত লু গেরিকের ব্যাধি (Lou Gehrig's Disease) কিম্বা মোটর নিউরন ব্যাধি (Motor Neuron Disease) নামে পরিচিত। আমাকে বোঝানো হয়েছিল আমার আয়ু নাকি আর এক কিম্বা দুবছর। এই অবস্থায় আমার পি. এইচ. ডি-এর জন্য কাজ করার কোনো অর্থ ছিল বলে মনে হয়নি। অতদিন আমার বাঁচবার আশা ছিল না, অথচ দুবছর হয়ে গেল আমার অবস্থা এমন কিছু খারাপ হয়নি। আসলে ব্যাপারটা বরং আমার ক্ষেত্রে ভালই চলছিল। জেন ওয়াইল্ড (Jane Wilde) নামে অত্যন্ত ভাল একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল, কিন্তু বিয়ে করতে হলে আমার একটা চাকরীর দরকার এবং চাকরী পেতে হলে দরকার ছিল পি. এইচ. ডি.।

১৯৬৫ সালে আমি পেনরোজের উপপাদ্য সম্পর্কে পড়ি। উপপাদ্যটি হল, যে কোনো বস্তুপিণ্ডের মহাকর্ষের ফলে সঙ্কুচিত হয়ে চুপ্‌সে যেতে হলে শেষ পর্যন্ত তার একটি অনন্যতা (singularity) গঠন করতে হবে। আমি শীঘ্র বুঝতে পারলাম পেনরোজের উপপাদ্যের সময়ের অভিমুখ যদি উল্টে দেওয়া যায়, অর্থাৎ চুপ্‌সে যাওয়াটা যদি সম্প্রসারণ হয়ে যায়, তাহলেও উপপাদ্যের শর্তগুলি রক্ষিত হবে। অবশ্য আধুনিক কালের মহাবিশ্বের প্রতিরূপ বৃহৎমানে বিচার করলে যদি মোটামুটি ফ্রিডম্যানের প্রতিরূপের মতো হয়। পেনরোজের উপপাদ্য দেখিয়েছে, যে কোনো সঙ্কোচনশীল তারকা একটি অনন্যতায় (singularity) শেষ হবে। কাল বৈপরীত্যভিত্তিক যুক্তিতে দেখা গেল ফ্রিডম্যান তত্ত্বের অনুরূপ যে কোনো সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বকে একটা অনন্যতা দিয়ে শুরু করতেই হবে। ব্যবহারিক (technical) কারণে পেনরোজের উপপাদ্যের প্রয়োজন ছিল স্থানে অসীম হওয়া। আসলে শুধুমাত্র প্রসারণ যদি এত দ্রুত হয় যে সঙ্কোচন অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলেই মহাবিশ্বের একটা অনন্যতা থাকতে পারে— এই তত্ত্ব প্রমাণ করার জন্যই আমি পেনরোজের তথ্য ব্যবহার করেছিলাম (কারণ, শুধুমাত্র ফ্রিডম্যানের ঐ প্রতিরূপগুলি স্থানে অসীম ছিল)।

পরবর্তী কয়েক বছরে আমি কতগুলি নতুন গাণিতিক ব্যবহারিক পদ্ধতি (technique) উদ্ভাবন করি। উদ্দেশ্য ছিল, যে সমস্ত উপপাদ্যে প্রমাণ করা হয়েছে অনন্যতা হতেই হবে, তা থেকে এটা এবং অন্যান্য ব্যবহারিক শর্ত দূর করা। চূড়ান্ত গবেষণার ফল ছিল ১৯৭০ সালে আমার এবং পেনরোজের একটি যুক্ত গবেষণাপত্র। সে পত্রে শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়, ব্যাপক অপেক্ষবাদ যদি নির্ভুল হয় এবং মহাবিশ্বে যে পরিমাণ পদার্থ আমরা পর্যবেক্ষণ করি, তার অস্তিত্ব যদি সত্য হয়, তা হলে একটা বৃহৎ বিস্ফোরণ অবশ্যই হয়েছিল। আমাদের গবেষণার বিরোধী ছিল অনেক। বিরোধিতা অংশত এসেছিল রুশদের কাছ থেকে। কারণ তাঁরা ছিলেন মার্ক্সীয় বৈজ্ঞানিক নিমিত্তবাদে (determinism) বিশ্বাসী। আর যাঁরা বিরোধিতা

করেছিলেন, তাঁদের ধারণা ছিল অনন্যতা (singularity) বিষয়ক সমগ্র ধারণাগুলিই আইনস্টাইনের তত্ত্বের বিরোধী এবং সে তত্ত্বের সৌন্দর্যহানি করে। কিন্তু কেউ তো আসলে গাণিতিক উপপাদ্যের বিরুদ্ধে তর্ক করতে পারে না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত আমাদের গবেষণা সাধারণভাবে গৃহীত হয় এবং আজকাল প্রায় সবাই মেনে নিয়েছেন— মহাবিশ্বের শুরু একটি বৃহৎ বিস্ফোরণের অনন্যতা দিয়ে। ব্যাপারটা হয়তো পরিহাসের (irony) মতো শোনাবে— আমি নিজের মতটা পাল্টে ফেলে এখন অন্য পদার্থবিদদের বোঝাতে চাইছি যে মহাবিশ্বের শুরুতে আসলে কোনো অনন্যতা ছিল না। আমরা পরে দেখব কণাবাদী অভিক্রিয়া (quantum effect) বিচার করলে অনন্যতা (singularity) মিলিয়ে যেতে পারে।

আমরা এই অধ্যায়ে দেখেছি মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষের যে দৃষ্টিভঙ্গি হাজার হাজার বছর ধরে সৃষ্টি হয়েছিল, অর্ধ শতাব্দীর চাইতেও অল্প সময়ে সে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছে। হাবল আবিষ্কার করলেন মহাবিশ্ব প্রসারমান এবং আমরা বুঝতে পারলাম, মহাবিশ্বের বিরাটত্বে আমাদের গ্রহটির স্থান নগণ্য। এই শুধু শুরু। পরীক্ষামূলক এবং তাত্ত্বিক সাক্ষ্য জমা হতে লাগল এবং ক্রমশই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হল যে, কোনো এক কালে মহাবিশ্ব শুরু হয়েছিল। অবশেষে ১৯৭০ সালে, আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদের ভিত্তিতে আমি এবং পেনরোজ এ তত্ত্ব চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করেছি। এই প্রমাণ থেকে দেখা গিয়েছে, ব্যাপক অপেক্ষবাদ একটি অসম্পূর্ণ তত্ত্ব। মহাবিশ্ব কি করে শুরু হল, এ তত্ত্ব তা বলতে পারে না। তার কারণ, এ তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ব্যাপক অপেক্ষবাদ সমেত সমস্ত ভৌত তত্ত্ব মহাবিশ্বের প্রারম্ভের সময় ভেঙে পড়ে। ব্যাপক অপেক্ষবাদ কিন্তু দাবী করে সে নিজেও একটি আংশিক তত্ত্ব মাত্র। সুতরাং অনন্যতার উপপাদ্যগুলি (singularity theorem) আসলে প্রদর্শন করে যে, মহাবিশ্বের অতি আদি যুগে এমন একটি কাল অবশ্যই ছিল যখন মহাবিশ্ব ছিল এত ক্ষুদ্র যে সে সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় মহান আংশিক তত্ত্ব কণাবাদী বলবিদ্যার (quantum mechanics) ক্ষুদ্রমানের অভিক্রিয়াগুলি (small scale effect) কোনো ক্রমেই অগ্রাহ্য করা যায় না। ১৯৭০ দশকের প্রথমে আমরা আমাদের অস্বাভাবিক বিরাট সম্পর্কীয় তত্ত্ব থেকে অস্বাভাবিক ক্ষুদ্র সম্পর্কীয় তত্ত্বের দিকে অভিমুখ ফেরাতে বাধ্য হই। এর উদ্দেশ্য মহাবিশ্বকে বোঝা। দুটি আংশিক তত্ত্বকে সম্মিলিত করে একটি কণাবাদী মহাকর্ষ তত্ত্ব গঠন করার প্রচেষ্টার বিবরণ দেওয়ার আগে আমরা কণাবাদী বলবিদ্যার বিবরণ দেব।

৪

অনিশ্চয়তাবাদ

(The Uncertainty Principle)

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির সাফল্য, বিশেষ করে, নিউটনীয় মহাকর্ষীয় তত্ত্বের সাফল্যের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফরাসী বৈজ্ঞানিক মার্কুইস দ্য লাপ্লাস (Marquis De Laplace) যুক্তি দেখিয়েছিলেন— মহাবিশ্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ধারণীয় (বৈজ্ঞানিক নিয়তিভিত্তিক— deterministic)। লাপ্লাসের প্রস্তাবনা ছিল, এমন একগুচ্ছ বৈজ্ঞানিক বিধি থাকা উচিত যার সাহায্যে মহাবিশ্বের যে কোনো এক সময়কার অবস্থা যদি সম্পূর্ণভাবে জানা থাকে, তা হলে ভবিষ্যতে মহাবিশ্বে কি ঘটবে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হবে। উদাহরণ: সূর্য এবং গ্রহগুলির যে কোনো এক সময়কার দ্রুতি এবং অবস্থান যদি জানা থাকে, তা হলে নিউটনের বিধিগুলির সাহায্যে সৌরতন্ত্রের অন্য যে কোনো সময়কার অবস্থা গণনা করে বলা সম্ভব। এক্ষেত্রে নির্ধারণীয়তাবাদ (determinism) বেশ স্পষ্ট। কিন্তু লাপ্লাস আরো খানিকটা অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর অনুমান ছিল, অন্য সমস্ত বিষয় সম্পর্কে, এমন কি, মানবিক আচরণ সম্পর্কেও এই ধরনের বিধি রয়েছে।

অনেকেই বৈজ্ঞানিক নির্ধারণীয়তাবাদের (determinism) ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, এই মতবাদ পৃথিবীতে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু, তবুও এই শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত নির্ধারণীয়তাবাদই ছিল প্রমাণ (standard) বৈজ্ঞানিক অনুমান। এই বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে হবে— এই সম্পর্কে প্রথম ইঙ্গিতগুলির একটি ছিল ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক লর্ড র‍্যালে (Lord Rayleigh) এবং স্যার জেমস্ জিনসের (Sir James Jeans) গণনা। সে গণনায় দেখা যায়, যে কোনো উত্তপ্ত বস্তুপিণ্ড কিম্বা তারকার মতো একটি বস্তুপিণ্ড আবশ্যিকভাবে অসীম হারে শক্তি বিকিরণ করবে। তখন আমরা যা বিশ্বাস করতাম,

সেই বিধি অনুসারে একটি উত্তপ্ত বস্তুপিণ্ডের সমভাবে সমস্ত স্পন্দাঙ্কে (frequency) বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ (electro magnetic wave) [যেমন, বেতার তরঙ্গ, দৃশ্যমান আলোক, কিম্বা এক্স-রে] বিকিরণ করা উচিত। উদাহরণ: একটি উত্তপ্ত বস্তুপিণ্ড সেকেণ্ডে এক থেকে দুই মিলিয়ান মিলিয়ান তরঙ্গের স্পন্দাঙ্কে যে পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করে, সেই একই পরিমাণ শক্তি তার সেকেণ্ডে দুই থেকে তিন মিলিয়ান মিলিয়ান তরঙ্গের স্পন্দাঙ্কেও বিকিরণ করা উচিত। যেহেতু প্রতি সেকেণ্ডে তরঙ্গের সংখ্যা অসীম সেজন্য এর অর্থ হবে বিকিরিত (radiated) শক্তির পরিমাণও অসীম।

সুস্পষ্ট হাস্যকর এই ফলশ্রুতি এড়ানোর জন্য জার্মান বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স প্লাঙ্ক (Max Planck) ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তাব করেন– আলোক, এক্স-রে এবং অন্যান্য তরঙ্গ যাদৃচ্ছিক (arbitrary) হারে বিকিরিত হতে পারে না। বিকিরিত হতে পারে শুধুমাত্র বিশেষ প্যাকেটে (packet), তার নাম তিনি দিয়েছিলেন কোয়ান্টা। তা ছাড়া প্রতিটি কোয়ান্টাতেই একটা বিশেষ পরিমাণ শক্তি থাকে এবং তরঙ্গের স্পন্দাঙ্ক যত বেশী হয় শক্তিও হয় তত বেশী। সুতরাং যথেষ্ট উচ্চ স্পন্দাঙ্ক হলে এক একটি কোয়ান্টামের বিকিরণে যে শক্তির প্রয়োজন হবে সেটা প্রাপ্তিযোগ্য শক্তির চাইতে বেশী। সুতরাং উচ্চ স্পন্দাঙ্কের বিকিরণ কমে যাবে। অতএব, বস্তুপিণ্ড যে শক্তি ক্ষয় করবে, সেটাও হবে সীমিত।

কোয়ান্টাম প্রকল্প (hypothesis) তপ্ত বস্তুপিণ্ডগুলি থেকে বিকিরণ নির্গত হওয়ার পর্যবেক্ষণ করার হার ভালই ব্যাখ্যা করেছিল। কিন্তু ১৯২৬ সালের আগে পর্যন্ত নির্ধারণীয়তাবাদ (determinism) সাপেক্ষ এই প্রকল্পের ফলশ্রুতি বোঝা যায় নি। সেইসময় ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ (Werner Heisenberg) নামে আর একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক বিখ্যাত অনিশ্চয়তাবাদ (uncertainty principle) গঠন করেন। একটি কণিকার (particle) ভবিষ্যৎ অবস্থান ও গতিবেগ (velocity) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে হলে তার বর্তমান অবস্থান ও গতিবেগ নির্ভুলভাবে মাপা প্রয়োজন। স্পষ্টতই এ কাজ করার সহজ পন্থা কণাটির উপর আলোকপাত করা। তা হলে কিছু আলোক তরঙ্গকে এ কণিকা বিক্ষিপ্ত (scattered) করে দেবে এবং তার ফলে তার অবস্থানের নির্দেশ পাওয়া যাবে। কিন্তু আলোকের দুটি তরঙ্গশীর্ষের দূরত্বের চাইতে বেশী নির্ভুলভাবে ঐ কণিকার অবস্থান নির্ধারণ করা যাবে না। সেইজন্য প্রয়োজন হবে হ্রস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকপাত করা, যাতে কণিকাটির অবস্থান সঠিকভাবে মাপা যায়। কিন্তু প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম প্রকল্প অনুসারে যাদৃচ্ছিক (arbitrary) ক্ষুদ্র পরিমাণ আলোক ব্যবহার করা সম্ভব নয়। অন্ততপক্ষে, এক কোয়ান্টাম আলোক ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু এই কোয়ান্টাম কণিকাটিকে অস্থির করে তুলবে (disturb) এবং তার গতিবেগে এমন পরিবর্তন আনবে যে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে না। তা ছাড়া, অবস্থানের মাপন যত নির্ভুল হবে, আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্যও তত ক্ষুদ্র হবে; সুতরাং এক কোয়ান্টামে শক্তির পরিমাণও হবে উচ্চতর। তা হলে, কণিকাটির গতিবেগের স্থিরত্বকে বৃহত্তর শক্তি বিঘ্নিত করে তুলবে। অন্যভাবে বলা যায়, একটি কণিকার অবস্থানে যত নির্ভুলভাবে মাপার চেষ্টা করা যাবে, তার দ্রুতির মাপন হবে তত কম নির্ভুল এবং এর বিপরীতও সত্য হবে (vice versa)। হাইজেনবার্গ দেখিয়েছিলেন কণিকাটির ভরকে তার গতিবেগের অনিশ্চয়তা দিয়ে গুণ করে তাকে কণিকার অবস্থানের অনিশ্চয়তা দিয়ে

গুণ করলে গুণফল কখনোই একটি বিশেষ পরিমাণের কম হতে পারে না। এই পরিমাণই প্লাঙ্কের ধ্রুবক (Plank's constant) বলে পরিচিত। তাছাড়া, এই সীমা কণিকাটির অবস্থান মাপনের চেষ্টার পদ্ধতি কিম্বা গতিবেগ মাপনের চেষ্টার পদ্ধতি কিম্বা কণিকার জাতিরূপের (type) উপর নির্ভরশীল নয়: হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি বিশ্বের একটি মূলগত অনতিক্রমণীয় ধর্ম।

পৃথিবী সাপেক্ষ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে এই অনিশ্চয়তার নীতির নিহিতার্থ গভীর। পঞ্চাশ বছরেরও বেশী সময় কেটে গিয়েছে। এখনও বহু দার্শনিক ব্যাপারটার মর্ম সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং এখনও এই অনিশ্চয়তার নীতি বহু দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে। লাপ্লাসের (Laplace) স্বপ্ন ছিল বিজ্ঞানের এমন একটি তত্ত্ব– মহাবিশ্বের এমন একটি প্রতিরূপ যা হবে সম্পূর্ণ নির্ধারণযোগ্য (deterministic): মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থানই যদি নির্ভুলভাবে মাপা সম্ভব না হয়, তা হলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নির্ভুলভাবে বলা অসম্ভব। এই পরিস্থিতি লাপ্লাসের স্বপ্নের অন্তিম অবস্থারই ইঙ্গিত। অবশ্য আমরা এখনো কল্পনা করতে পারি কোনো এক অতিপ্রাকৃত জীব সাপেক্ষ এমন একগুচ্ছ বিধি রয়েছে যে বিধি ঘটনাবলী সম্পূর্ণভাবে নির্ধারণ করে। তিনি হয়তো কোনোরকম অস্থিরতার সৃষ্টি না করেই মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন! কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ মরণশীল জীবের পক্ষে মহাবিশ্বের সেই প্রতিরূপের কোনো আকর্ষণ নেই। তার চাইতে বরং ওকাম্‌স্ রেজর (Occam's razor)[১] নামক মিতব্যয়িতার নীতি প্রয়োগ করে তত্ত্বটির যা কিছু পর্যবেক্ষণ করা যায় না সবটাই ছেঁটে বাদ দিতে পারি। উনিশশ' কুড়ির দশকে এই দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে হাইজেনবার্গ, এরভিন শ্রয়েডিংগার এবং পল্ ডিরাক বলবিদ্যার পুনর্গঠন করে কণাবলী বলবিদ্যা (quantum mechanics) নামক নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই নতুন তত্ত্বের ভিত্তি হল অনিশ্চয়তাবাদ। এই তত্ত্ব অনুসারে কণিকাগুলির আর পৃথক সুসংজ্ঞিত (well-defined) অপর্যবেক্ষণযোগ্য অবস্থান এবং গতিবেগ রইল না। তার বদলে তাদের থাকল কোয়ান্টাম অবস্থা। সে অবস্থা গতিবেগ এবং অবস্থানের সমন্বয়।

সাধারণত, কণাবলী বলবিদ্যার (quantum mechanics) ভবিষ্যদ্বাণীতে একটি পর্যবেক্ষণের একক সুনিশ্চিত ফল থাকে না। তার বদলে সে ভবিষ্যদ্বাণীতে থাকে অনেকগুলি পৃথক পৃথক (different) ফলশ্রুতি। তাছাড়া থাকে ফলগুলির প্রতিটির কতটা সম্ভাব্যতা। অর্থাৎ কেউ যদি বহুসংখ্যক সমরূপতন্ত্রের (similar system) একই মাপ নেন এবং তাদের প্রতিটি যদি একইভাবে শুরু হয়ে থাকে, তাহলে দেখতে পাবেন বিশেষ সংখ্যক ক্ষেত্রে মাপন ফল হবে ক। ভিন্ন আর কিছু ক্ষেত্রে মাপন ফল হবে খ এবং এই রকম (and so on)। কতবার ফল ক কিম্বা খ হবে সে সম্পর্কে একটা আসন্ন (approximate) সংখ্যা ভবিষ্যদ্বাণীতে থাকতে পারে। কিন্তু একক একটি মাপনের বিশেষ ফল (specific result) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে না। সুতরাং কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উপস্থিত করেছে ভবিষ্যদ্বাণী করার অসম্ভাব্যতা কিম্বা একটা এলোমেলো অনিশ্চিত অবস্থা

১- ওকাম্‌স্ রেজর: উইলিয়াম অব ওকাম (১২৮৫-১৩৪৯)। ওকামের নামে পরিচিত মিতব্যয়িতার নীতি। এ নীতি গ্যালিলিওর ও ও অনেকেই অনুসরণ করেছেন। নীতিটির মূল বক্তব্য হল: সরলতর প্রকল্পই গ্রহণ যোগ্য– অনুবাদক।

(randomness)। এই পরিস্থিতি এড়ানো অসম্ভব। এই সমস্ত চিন্তাধারার বিকাশে আইনস্টাইন খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর খুবই আপত্তি ছিল। কোয়ান্টাম তত্ত্বে অবদানের জন্য আইনস্টাইনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহাবিশ্ব শাসিত হয় আপতন (chance) দ্বারা—এ তত্ত্ব আইনস্টাইন কখনোই মেনে নিতে পারেন নি। এ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব সংক্ষেপে তাঁর বিখ্যাত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—"ঈশ্বর পাশা খেলেন না।" কিন্তু অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের অধিকাংশই কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে মেনে নিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তার কারণ, এ বলবিদ্যার সঙ্গে পরীক্ষামূলক তথ্যের নিখুঁত ঐক্য ছিল। সত্যিই এ তথ্য বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করেছে। আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার প্রায় অধিকাংশের ভিত্তি এই তত্ত্ব। ট্রানজিস্টার এবং সমকলিত পরিপথ (integrated circuit) নিয়ন্ত্রণ করে এই তত্ত্ব। টেলিভিশন এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিরও অবিচ্ছেদ্য উপাদান ট্রানজিস্টার এবং সমকলিত পরিপথ (integrated circuit)। আধুনিক রসায়ন এবং জীববিদ্যারও ভিত্তি এই তত্ত্ব। ভৌতবিজ্ঞানের যে দুটি ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে এখনও সঠিকভাবে যুক্ত করা যায়নি, সে দুটি হল মহাকর্ষ এবং মহাবিশ্বের বৃহৎমাত্রিক গঠন (large scale structure)।

আলোক তরঙ্গ দিয়ে গঠিত হলেও প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম প্রকল্প বলে, কোনো

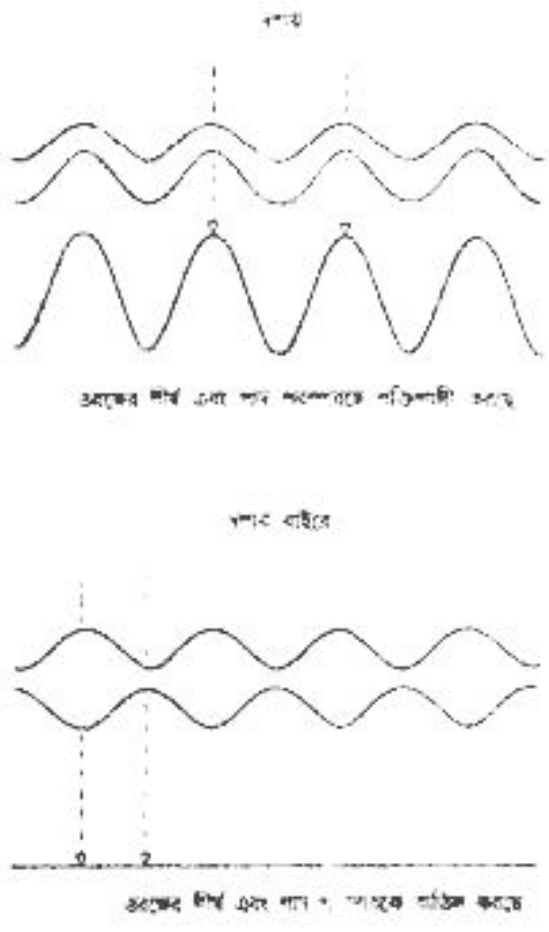

চিত্র ৪.১

কোনো অবস্থায় আলোকের আচরণ এমন যে মনে হয় আলোক কণিকার দ্বারা গঠিত। আলোক

শুধুমাত্র প্যাকেট (packet) কিম্বা কোয়ান্টাম রূপেই নির্গত হতে পারে কিম্বা বিশোষিত হতে পারে। একইভাবে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদের অর্থ কণিকাও কোনো কোনো ব্যাপারে তরঙ্গের মতো আচরণ করে। তাদের কোনো নিশ্চিত অবস্থান নেই। সেগুলি বিশেষ সম্ভাবনায় বিতরিত হয়ে "প্রলিপ্ত হয়" (smeared out with a certain probability distribution)। কোয়ান্টাম গণিতের তত্ত্বের ভিত্তি সম্পূর্ণ অন্য এক ধরনের গণিত। এ গণিত কণিকা এবং তরঙ্গের বাক্‌বিধিতে (terms) আর বাস্তব জগতের বিবরণ দান করে না। এই সমস্ত

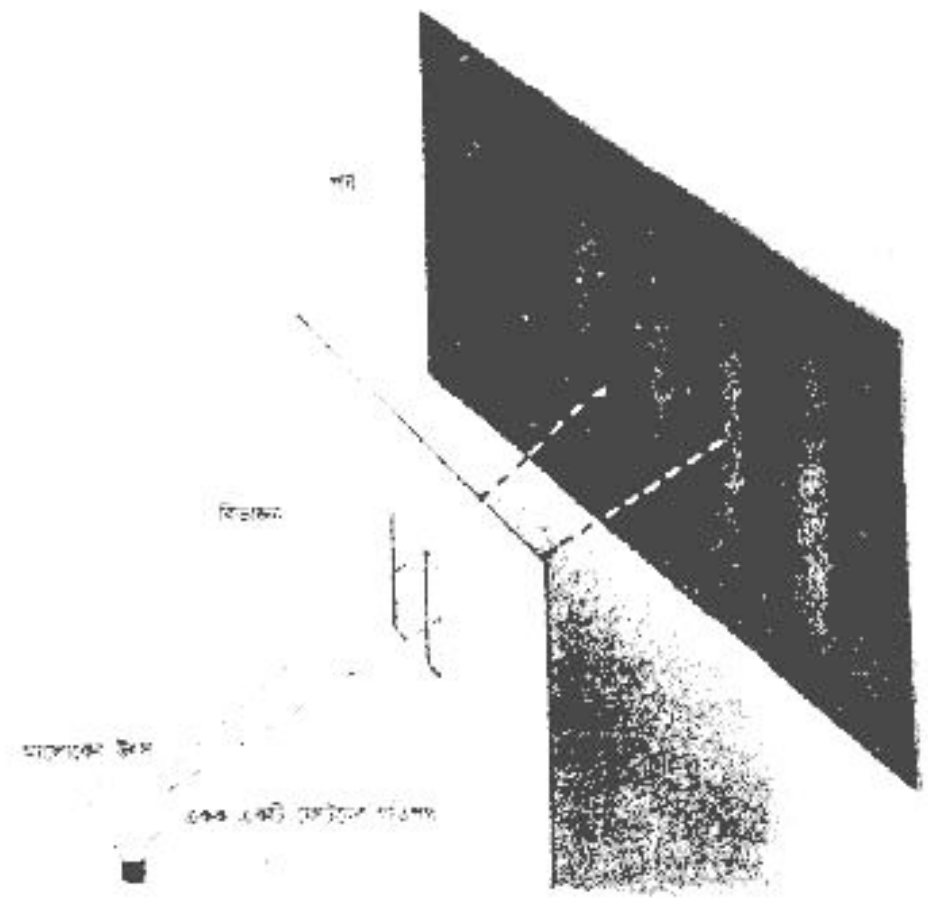

চিত্র ৪.২

বাক্‌বিধিতে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ করা বিশ্বেরই বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। সেজন্য কোয়ান্টাম বলবিদ্যাতে তরঙ্গ এবং কণিকার ভিতরে দ্বিত্ব (duality) রয়েছে। কোনো কোনো উদ্দেশ্যে কণিকাগুলিকে তরঙ্গরূপে চিন্তা করলে সুবিধা হয়, আবার কোনো কোনো উদ্দেশ্যে তরঙ্গকে কণিকা রূপে চিন্তা করলেই ভাল। এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ফলশ্রুতি হল, দুই কেতা (set) তরঙ্গ কিম্বা কণিকার ভিতরে ব্যতিচার (interference) পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। অর্থাৎ এক

কেতা (set) তরঙ্গের শীর্ষ অন্য কেতা (set) তরঙ্গপাদের (wave trough) সঙ্গে সমস্থানিক (coincide) হতে পারে। তা হলে দুই কেতা তরঙ্গ পরস্পরকে বাতিল করে দেবে। আশা করা যেতে পারত দুটি যোগের ফলে আরো শক্তিশালী একটা তরঙ্গ হবে কিন্তু সেটা হয় না (চিত্র–৪.১)। সাবানের ফেনার বুদ্‌বুদের ভিতরে যে রঙ দেখা যায়, সেটা আলোকের ক্ষেত্রে ব্যতিচারের (ipterference) একটি সুপরিচিত উদাহরণ। যে সূক্ষ্ম জলের পর্দা ঐ বুদ্‌বুদটি গঠন করে, তার দুপাশ থেকে আলোর প্রতিফলনই এর কারণ। সাদা আলো বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক নিয়ে গঠিত। বিশেষ কয়েকটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে একদিক থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গগুলির শীর্ষ অন্য দিক থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গপাদ সমস্থানিক (coincide) হয়। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুরূপ রঙগুলি প্রতিফলিত আলোকে অনুপস্থিত থাকে। সুতরাং সে আলোকগুলিকে রঙিন মনে হয়।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা যে দ্বিত্ব (duality) উপস্থাপন করেছে, তার দরুন কণিকার ক্ষেত্রেও ব্যতিচার হতে পারে। তথাকথিত দুটি চেরা ছিদ্রের পরীক্ষা (two-slit experiment, চিত্র ৪.২) এর একটা বিখ্যাত উদাহরণ। দুটি সমান্তরাল ও সরু চেরাই যুক্ত একটা বিভাজক প্রাচীরের কথা বিবেচনা করুন। প্রাচীরের একপাশে একটি বিশেষ রঙের আলোকের উৎস স্থাপন করা হোক (অর্থাৎ, একটি বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো)। অধিকাংশ আলোই বিভাজক প্রাচীরে পড়বে কিন্তু খুব সামান্য পরিমাণ আলো ঐ চেরাই করা ফাঁকের ভিতর দিয়ে যাবে। এবার ভেবে নেওয়া যাক বিভাজক প্রাচীরের অন্যদিকে একটা পর্দা টাঙানো হয়েছে। পর্দার যে কোনো বিন্দুতেই দুটি চেরাই করা ফাঁক থেকে তরঙ্গ এসে পড়বে। কিন্তু সাধারণত দুটি চেরাই করা ফাঁক দিয়ে উৎস থেকে পর্দায় পৌঁছাতে আলোর ভিন্ন ভিন্ন দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। এর অর্থ হবে চেরাইয়ের ফাঁক দিয়ে নির্গত তরঙ্গগুলি যখন পর্দায় পৌঁছাবে তখন তারা পরস্পর সাপেক্ষ একই দশায় (phase) থাকবে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা পরস্পরকে বাতিল করবে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা পরস্পরকে শক্তিশালী করবে। ফল হবে আলোর এবং অন্ধকারের একটা বিশিষ্ট নক্সার ঝালর।

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, যদি আলোক উৎসের বদলে নির্দিষ্ট নিশ্চিত গতি সম্পন্ন কোনো কণিকা প্রতিস্থাপন করা যায়, তা হলে একই রকম নক্সা পাওয়া যাবে। সে কণিকা ইলেকট্রনও হতে পারে (এর অর্থ হল অনুরূপ তরঙ্গগুলিরও একটা নির্দিষ্ট নিশ্চিত দৈর্ঘ্য রয়েছে)। ব্যাপারটা আরো অদ্ভুত এইজন্য যে শুধুমাত্র একটি চেরাই করা ফাঁক থাকলে নক্সা পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় পর্দার উপরে সমরূপে বণ্টিত (uniformly distributed) ইলেকট্রন। অনেকে ভাবতে পারেন, আর একটি চেরাই করা ফাঁক থাকলে পর্দার প্রতিবিন্দুতে যে ইলেকট্রনগুলি আঘাত করছে সেগুলির সংখ্যা বাড়বে। কিন্তু ব্যতিচারের (interference) জন্য বাস্তবে কোনো কোনো স্থানে ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশি কমে যায়। এই চেরাই করা ফাঁক দুটো দিয়ে যদি একটা করে ইলেকট্রন পাঠানো যায়, তা হলে আশা করা উচিত ছিল ইলেকট্রনগুলি কোনো বার একটি ফাঁক দিয়ে ঢুকবে, কোনো বার অন্য ফাঁক দিয়ে ঢুকবে। অর্থাৎ শুধুমাত্র একটি ফাঁক হলে তাদের আচরণ যে রকম হোত, সে রকম আচরণ হবে।

ফলে পর্দার উপরে সমরূপ বণ্টন হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু একটি করে ইলেকট্রন পাঠালেও নক্সা দেখা দেয়। তা হলে প্রতিটি ইলেকট্রন নিশ্চয়ই একই সময়ে দুটি ফাঁক দিয়ে ঢুকছে!

কণিকাগুলির ভিতরে ব্যতিচার (interference) আমাদের পরমাণুর গঠন বোঝার পক্ষে একটি বিনিশ্চায়ক (crucial) পরিঘটনা। রসায়ন ও জীববিদ্যায় এই পরমাণুই মূল একক (basic unit)। আর এই পরমাণুই আমরা ও আমাদের চারপাশে যা আছে সেগুলি গঠন করার ইট। ঐ শতাব্দীর প্রথমে ভাবা হোত অণুগুলি অনেকটা সূর্যের কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান গ্রহের মতো। ইলেকট্রনগুলি [অপরা (negative) বৈদ্যুতিক কণিকা] কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াসের চারপাশে কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান। কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস পরা (positive) বিদ্যুৎ বহন করে। অনুমান করা হোত সূর্য এবং গ্রহগুলির অন্তর্বর্তী মহাকর্ষীয় আকর্ষণ (gravitational attraction) যে রকম গ্রহগুলিকে তাদের কক্ষপথে রাখে ঠিক সেই রকম অপরা এবং পরা বিদ্যুতের আকর্ষণও ইলেকট্রনগুলিকে তাদের কক্ষপথে রাখে। এ তত্ত্বের অসুবিধা হল, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আগেকার বলবিদ্যা এবং বিদ্যুৎবিজ্ঞানের (electricity) বিধি অনুসারে পূর্বাভাস ছিল: ইলেকট্রনগুলি ক্রমশ শক্তি হারাবে এবং ক্রমশ ঘুরতে ঘুরতে ভিতরে প্রবেশ করবে এবং নিউক্লিয়াসের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হবে। এর অর্থ হোত পরমাণু এবং সমস্ত পদার্থই দ্রুত চুপসে অত্যন্ত ঘন একটি অবস্থায় পৌঁছাবে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কের বৈজ্ঞানিক নীলস্ বোর (Niels Bohr) এই সমস্যার একটি আংশিক সমাধান পেয়েছিলেন। তাঁর প্রস্তাবনা (suggestion) ছিল ইলেকট্রনগুলি হয়তো কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস থেকে যে কোনো দূরত্বে অবস্থিত কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করতে পারে না। প্রদক্ষিণ করতে পারে কয়েকটা বিশেষ নির্দিষ্ট দূরত্বে। এছাড়া যদি অনুমান করা যায় এই সমস্ত দূরত্বের যে কোনো একটিতে মাত্র একটি কিম্বা দুটি ইলেকট্রন কক্ষপথে ঘুরতে পারে তাহলে পরমাণু চুপসে যাওয়ার সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। কারণ, সে ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন শক্তি এবং দূরত্বে অবস্থিত কক্ষপথ ছাড়া ইলেকট্রনগুলি অন্য কোনো কক্ষপথে ঘুরতে পারে না।

এই প্রতিরূপ সবলতম পরমাণু হাইড্রোজেনের গঠন খুব ভালই ব্যাখ্যা করতে পারে। কারণ তার নিউক্লিয়াসের চারপাশে কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান একটিমাত্র ইলেকট্রন থাকে। কিন্তু এই তত্ত্ব কি করে আরো জটিল পরমাণুর ক্ষেত্রে প্রসারিত করা যায় সেটা খুব স্পষ্ট ছিল না। তা ছাড়া অনুমোদিত সীমিত কয়েক কেতা মাত্র কক্ষ সম্পর্কে ধারণা খুব যাদৃচ্ছিক বলে মনে হোত। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নতুন তত্ত্ব এই অসুবিধা দূর করেছে। এই তত্ত্বে প্রকাশ পেয়েছে নিউক্লিয়াসের সর্বদিকে কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনকে একটি তরঙ্গও ভাবা চলে। সেই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ভর করবে তার গতিবেগের উপর। কোনো কোনো কক্ষপথের ক্ষেত্রে কক্ষের দৈর্ঘ্য হবে ইলেকট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একটি পূর্ণ সংখ্যার অনুরূপ (তবে ভগ্নাংশের নয়)। এই সমস্ত কক্ষপথের ক্ষেত্রে প্রতি আবর্তনে তরঙ্গশীর্ষ থাকবে একই জায়গায়। সুতরাং তরঙ্গগুলি যোগ হতে থাকবে। এই কক্ষপথগুলি হবে বোরের অনুমোদিত কক্ষগুলির অনুরূপ। কিন্তু যে সমস্ত কক্ষপথের দৈর্ঘ্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলির একটি পূর্ণ সংখ্যা নয়, সে সমস্ত ক্ষেত্রে ইলেকট্রনগুলি যখন ঘূর্ণায়মান তখন প্রতিটি তরঙ্গশীর্ষকে একটি তরঙ্গপাদ বাতিল করে দেবে।

যে তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য পূর্ণ সংখ্যা নয়, সেগুলি অনুমোদিত হবে না।

আমেরিকান বৈজ্ঞানিক রিচার্ড ফেনম্যানের (Richard Feynman) উপস্থিত করা তথাকথিত ইতিহাসের যোগফল (sum over histories), তরঙ্গ এবং কণার দ্বিত্ব (duality) অনুধাবন করার একটা খুব সুন্দর পদ্ধতি। এই উপস্থাপনে চিরায়ত অ-কোয়ান্টাম তত্ত্বের মতো স্থান-কালে কণিকার একটি মাত্র ইতিহাস কিম্বা পথ অনুমান করা হয় না। তার বদলে অনুমান করা হয় কণিকাটি সম্ভাব্য যে কোনো পথেই ক থেকে খ-এ যেতে পারে। প্রতিটি পথের সঙ্গে দুটি সংখ্যা যুক্ত। একটি সংখ্যা তরঙ্গের আকার নির্দেশক, আর অন্যটি নির্দেশ করে এই চক্রে তার স্থান (অর্থাৎ এটা শীর্ষে না পাদে অবস্থিত)। ক থেকে খ-এ যাবার সম্ভাবনা পাওয়া যায় পথ সাপেক্ষ সমস্ত তরঙ্গের যোগফল দিয়ে; সাধারণভাবে কাছাকাছি পথের কেতাগুলি তুলনা করলে (a set of neighbouring path) এই চক্রে দশা (phase) অথবা অবস্থানের প্রচুর পার্থক্য দেখা যাবে। এর অর্থ হল— এই সমস্ত পথের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তরঙ্গগুলি প্রায় নির্ভুলভাবে একে অপরকে বাতিল করে দেবে। তবে কাছাকাছি পথগুলির কোনো কোনো কেতার (sets) পথগুলির ভিতর দশার (phase) খুব পার্থক্য হবে না। এই পথগুলি সাপেক্ষ তরঙ্গগুলি পরস্পরকে বাতিল করবে না। এই পথগুলি বোরের অনুমোদিত কক্ষপথগুলির অনুরূপ।

এই ধারণাগুলির ভিত্তিতে মূর্ত গাণিতিক গঠনের সাহায্যে আরো জটিল পরমাণুর ক্ষেত্রে, এমন কি, অণুর ক্ষেত্রেও অনুমোদিত কক্ষপথগুলি গণনা করা তুলনায় বেশ সহজ ছিল। অণুগুলি কক্ষস্থিত ইলেকট্রন দ্বারা আবদ্ধ একাধিক পরমাণু দ্বারা গঠিত। এই ইলেকট্রনগুলি একাধিক কেন্দ্রক (নিউক্লিয়াস) প্রদক্ষিণ করে। অণুর গঠন এবং তাদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সমগ্র রসায়ন শাস্ত্র এবং জীববিদ্যার ভিত্তি। সে জন্য নীতিগতভাবে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আমাদের চারপাশে আমরা যা কিছু দেখি সে সম্পর্কে পূর্বাভাস দেবার সামর্থ্য দান করে। অবশ্য সে সামর্থ্য অনিশ্চয়তাবাদ দিয়ে সীমিত (কার্যক্ষেত্রে কিন্তু যে সমস্ত তত্ত্বে কয়েকটির বেশী ইলেকট্রন আছে সেগুলি সম্পর্কে গণনা এত জটিল যে আমরা সে গণনা করতে পারি না)।

মনে হয় আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদ মহাবিশ্বের বৃহৎমাত্রিক গঠনের নিয়ামক। এটা হল তথাকথিত চিরায়ত তত্ত্ব (classical theory), অর্থাৎ এ তত্ত্ব কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অনিশ্চয়তাবাদ বিবেচনা করে না। অথচ অন্যান্য তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য এটা বিবেচনা করা উচিত। এর জন্য পর্যবেক্ষণফলের সঙ্গে কোনোরকম গোলমাল না হওয়ার কারণ, সাধারণত আমাদের অভিজ্ঞতায় যে সমস্ত মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র আমরা পাই সেগুলি খুবই দুর্বল। ইতিপূর্বে আলোচিত অনন্যতার উপপাদ্য (singularity theorem) অনুসারে কিন্তু মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের অন্তত দুটি পরিস্থিতিতে খুবই শক্তিশালী হওয়া উচিত: কৃষ্ণগহ্বর (black hole) এবং বৃহৎ বিস্ফোরণ (big bang)। এই রকম শক্তিশালী ক্ষেত্রগুলিতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অভিক্রিয়ার গুরুত্ব থাকা উচিত। এক অর্থে চিরায়ত ব্যাপক অপেক্ষবাদ অসীম ঘনত্বের (infinite density) বিন্দু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে নিজেরই পতন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, ঠিক তেমনি চিরায়ত বলবিদ্যা (অর্থাৎ যে বলবিদ্যা কোয়ান্টাম নয়) পরমাণু চুপসে অসীম ঘনত্ব প্রাপ্ত

হবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করে নিজের পতন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। ব্যাপক অপেক্ষবাদ এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে ঐক্যবদ্ধ করে এরকম সঙ্গতিপূর্ণ সম্পূর্ণ একটি তত্ত্ব এখনো আমাদের নেই, কিন্তু সে তত্ত্বের অবয়ব কি রকম হবে সে সম্পর্কে আমাদের কিছু কিছু জানা আছে। কৃষ্ণগহ্বর এবং বৃহৎ বিস্ফোরণ সাপেক্ষ এইগুলির ফলশ্রুতি নিয়ে আমরা পরের অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করব। আপাতত আমরা ইদানীং প্রকৃতির অন্যান্য বলগুলিকে একক ঐক্যবদ্ধ কোয়ান্টাম তত্ত্বে বুঝবার যে আধুনিক প্রচেষ্টাগুলি হয়েছে, দৃষ্টিপাত করব সেই দিকে।

lainternet

৫

মৌলকণা এবং প্রাকৃতিক বল

(Elementary Particles and the Forces of Nature)

অ্যারিস্টোটলের বিশ্বাস ছিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ চারটি মৌলিক উপাদান দিয়ে গঠিত। ক্ষিতি (earth), মরুৎ (air), অগ্নি (fire) এবং অপ্ (water)। এই উপাদানগুলির উপরে দুটি বল ক্রিয়াশীল : মহাকর্ষ— ক্ষিতি এবং অপের ডুবে যাবার প্রবণতা এবং লঘুত্ব— মরুৎ এবং অগ্নির উপরে ওঠার প্রবণতা। মহাবিশ্বের উপাদানগুলিকে পদার্থ এবং বলে বিভাজন আজও ব্যবহার করা হয়।

অ্যারিস্টোটলের বিশ্বাস ছিল পদার্থ অবিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ পদার্থের একটা টুকরোকে ক্ষুদ্রতর এবং ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা সম্ভব। এই ভাগ করার কোনো সীমা নেই। এমন কোনো পদার্থ কণিকা পাওয়া সম্ভব নয় যাকে ভাগ করা যায় না। ডেমোক্রিটাসের মতো দু-একজন গ্রীক কিন্তু বিশ্বাস করতেন, পদার্থ জন্মগত ভাবেই দানাদার (grainy) এবং সমস্ত পদার্থই বহু সংখ্যক নানা ধরনের পরমাণু দিয়ে গঠিত [গ্রীক ভাষায় পরমাণু (atom) শব্দের অর্থ "অবিভাজ্য"] এই দ্বন্দ্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছিল। তবে কোনো পক্ষেই কোনো বাস্তব সাক্ষ্য পাওয়া যায় নি। কিন্তু ১৮০৩ সালে ব্রিটিশ রাসায়নিক এবং পদার্থবিদ জন ডালটন (John Dalton) দেখালেন, রাসায়নিক যৌগগুলি (chemical compound) সব সময়েই একটি বিশেষ অনুপাতে মিশ্রণের ফলে হয়। এ তথ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় পরমাণুগুলির বিশেষ বিশেষ এককে গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়া। এগুলির নাম তিনি দিয়েছিলেন অণু। কিন্তু, এই শতাব্দীর প্রথম দিকটা পর্যন্ত চিন্তাধারার এই দুটি দলের যুক্তি তর্কের পরমাণুবাদীদের সপক্ষে চরম মীমাংসা হয় নি। একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌত সাক্ষ্য উপস্থিত করেছিলেন আইনস্টাইন। বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ সম্পর্কীয় বিখ্যাত গবেষণাপত্র প্রকাশের কয়েক সপ্তাহ আগে ১৯০৫ সালে তিনি

দেখিয়েছিলেন ব্রাউনীয় গতিকে একটি তরল পদার্থের অণুগুলির সঙ্গে ধূলিকণার সংঘর্ষ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। একটি তরল পদার্থে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণার এলোমেলো এবং অনিয়মিত গতিকে বলা হয় ব্রাউনীয় গতি।

এই পরমাণুগুলি আসলে অবিভাজ্য নয়— এর ভিতরেই এই সন্দেহ হওয়া শুরু হয়েছিল। কয়েক বছর আগে কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের জে. জে. টমসন (J.J. Thomson) নামে একজন ফেলো ইলেকট্রন নামক একটি ক্ষুদ্র পদার্থকণার অস্তিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। এই কণার ভর লঘুতম পরমাণুর ভরের এক সহস্রাংশের চাইতেও কম। তিনি আধুনিক টি.ভি.র পিকচার টিউবের মতো একটা যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। উত্তপ্তে রক্তবর্ণ একটি ধাতব ফিলামেন্ট থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। যেহেতু ইলেকট্রনগুলির আধান অপরা (negative) সেইজন্য একটা ফসফরাস মাখানো পর্দার অভিমুখে তাদের ত্বরণ সৃষ্টি করার জন্য একটা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ব্যবহার করা যেত। ইলেকট্রনগুলি পর্দায় আঘাত করলে আলোর ঝলক সৃষ্টি হোত। অনতিবিলম্বেই বোঝা গিয়েছিল ইলেকট্রনগুলি নিশ্চয়ই নির্গত হয় পরমাণুগুলির ভিতর থেকে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ পদার্থবিদ আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford) ১৯১১ সালে দেখাতে সমর্থ হন— পরমাণুগুলিরও একটি আভ্যন্তরীণ গঠন আছে; তাদের গঠনে রয়েছে পরা (positive) আধান সম্পন্ন একটি কেন্দ্রক (nucleus)। তার চতুষ্পার্শ্বে আবর্তিত হচ্ছে কতগুলি ইলেকট্রন। তেজস্ক্রিয় পরমাণুগুলি থেকে বিকিরিত পরা আধান সম্পন্ন α (আলফা) কণিকাগুলির পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষ হলে তাদের গতিপথে যে বিচ্যুতি হয় সেটা বিচার করেই তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন।

প্রথমে মনে হয়েছিল পরমাণুর কেন্দ্রক একাধিক ইলেকট্রন এবং বিভিন্ন সংখ্যক পরা আধান যুক্ত কণিকার দ্বারা গঠিত। এগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল প্রোটন। আসলে গ্রীক শব্দ প্রোটোসের অর্থ প্রথম। কারণ তখন বিশ্বাস ছিল এগুলিই বস্তু গঠনের মূলগত একক। কিন্তু ১৯৩২ সালে কেম্ব্রিজে রাদারফোর্ডের সহকর্মী জেমস্ চ্যাডউইক (James Chadwick) আবিষ্কার করলেন কেন্দ্রকে আর একটি কণাও থাকে তার নাম নিউট্রন। এর ভর প্রোটনের মতোই কিন্তু এর কোনো বৈদ্যুতিক আধান নেই। এই আবিষ্কারের জন্য চ্যাডউইক নোবেল পুরস্কার পান এবং কেম্ব্রিজের গনভিল ও কাইয়াস কলেজের মাস্টার নির্বাচিত হন (আমি এখন এই কলেজের ফেলো)। পরে তিনি মাস্টার পদ ত্যাগ করেন। এর কারণ, ফেলোদের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটে। যুদ্ধের পর একদল তরুণ ফেলো ফিরে এসে অনেক প্রাচীন ফেলোর বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে তাঁদের কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করেন। এই পুরানো ফেলোরা বহুদিন কলেজের অনেক পদ অধিকার করে ছিলেন। এই ঘটনা নিয়ে কলেজে তিক্ত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল আমার আসার আগে। আমি এ কলেজে যোগদান করি এ বিবাদের একেবারে শেষ দিকে ১৯৬৫ সালে। তখন এই ধরনের মতানৈক্যের জন্য আর একজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী স্যার নেভিল মট (Sir Nevill Mott) পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

বছর কুড়ি আগে পর্যন্ত মনে হয়েছিল প্রোটন এবং নিউট্রনই "মৌল কণা" (elementary particle)। কিন্তু কতগুলি পরীক্ষায় প্রোটনের সঙ্গে প্রোটনের সংঘর্ষ ঘটানো হয়। কিম্বা সংঘর্ষ ঘটানো হয় দ্রুতগামী ইলেকট্রনের সঙ্গে। প্রোটনের এই পরীক্ষাগুলি থেকে নির্দেশ পাওয়া

যায় আসলে এগুলিও ক্ষুদ্রতর কণা দ্বারা গঠিত। ক্যালটেক পদার্থবিদ মারে গেলমান (Murray Gell-Mann) এই কণাগুলির নাম দেন কার্ক ((quark)। এই গবেষণার জন্য তিনি ১৯৬৯ সালে নোবেল প্রাইজ পান। এ নামের উৎপত্তি হয় জেমস জয়েসের একটা হেঁয়ালী কবিতা "Three quarks for Muster Mark!" থেকে। কার্ক শব্দের উচ্চারণ হওয়া উচিত quart-এর মতো, তবে শেষে t-এর বদলে k হবে কিন্তু সাধারণত উচ্চারণ করা হয় ক্লার্কের মতো।

কার্ক অনেক রকমের আছে; মনে হয় কার্ক রয়েছে অন্তত ছটি সুগন্ধের (flavour)। এগুলির নাম নিচু (down), অজানা (strange), মোহিত (charmed), সবার নিচে (bottom) এবং সবার উপরে (top)। প্রতিটি সুগন্ধেরই আবার তিনটি রঙ (colour); লাল, সবুজ, নীল (জোরালো ভাবে বলা উচিত, এই শব্দগুলি শুধুমাত্র নাম। কার্কের আকার দৃশ্যমান আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চাইতে অনেক ছোট। সুতরাং স্বাভাবিক অর্থে যাদের রঙ বলা হয় সেরকম কিছু তাদের নেই। এ শব্দগুলির একটিই অর্থ: আধুনিক পদার্থবিদরা নতুন কণিকা এবং পারিপার্শ্বিক নামকরণে অনেক বেশী কল্পনাশক্তির অধিকারী। তাঁরা শুধুমাত্র গ্রীক শব্দে আবদ্ধ থাকেন না!) প্রতিটি প্রোটন কিম্বা নিউট্রন তিনটি কার্ক দিয়ে গঠিত। প্রতিটির এক একটি রঙ। একটা প্রোটনে রয়েছে দুটি উচু কার্ক (up quark) এবং একটা নিচু কার্ক (down); নিউট্রনে রয়েছে দুটি নিচু (down) কার্ক আর একটি উচু কার্ক। অন্য কার্ক দিয়েও আমরা কণিকা বানাতে পারি। অজানা (strange), মোহিত (charmed), সবার নিচে (bottom) এবং সবার উপরে (top)। কিন্তু এ সবগুলিরই ভর অনেক বেশী এবং দ্রুত অবক্ষয় হয়ে তারা প্রোটনে এবং নিউট্রনে পরিণত হয়।

এখন আমরা জানি পরমাণু কিম্বা তাদের নিউক্লিয়াস প্রোটন নিউট্রন কোনোটাই অবিভাজ্য নয়। সুতরাং প্রশ্ন হল, সত্যিকারের মৌল কণা অর্থাৎ যা দিয়ে সমস্ত জিনিষ তৈরী হয়েছে সেগুলি কি? আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য একটি পরমাণুর আকারের চাইতে অনেক বড়। সুতরাং সাধারণভাবে পরমাণু দেখার কোনো আশাই নেই। অতএব আমাদের প্রয়োজন তার চাইতেও অনেক ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য সম্পন্ন কিছু। আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মতে সমস্ত কণাই আসলে তরঙ্গ এবং শক্তি যত বেশী অনুরূপ তরঙ্গ তত ছোট। সুতরাং আমাদের প্রশ্নের সব চাইতে ভাল উত্তর হল, কতটা কণিকাশক্তি (particle energy) আমাদের হাতে আছে। তার কারণ তার উপরে নির্ভর করবে কতটা ক্ষুদ্রমানের দৈর্ঘ্য আমরা দেখতে পাব। এই কণিক শক্তি মাপনের সাধারণ একককে নাম ইলেকট্রন ভোল্ট (টমসনের ইলেকট্রন নিয়ে পরীক্ষাতে আমরা দেখেছি তিনি ইলেকট্রনের ত্বরণের জন্য বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ব্যবহার করেছিলেন। এক ভোল্টের একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র থেকে একটা ইলেকট্রন যে শক্তি সংগ্রহ করে তাকে বলে এক ইলেকট্রন ভোল্ট)। উনবিংশ শতাব্দীতে যে কণিকাশক্তির ব্যবহার জানা ছিল সেটা হল, আগুন জ্বালার সময় কিম্বা ঐ রকম কোনো রাসায়নিক ক্রিয়ার সময় উদ্ভূত কয়েকটি ইলেকট্রন ভোল্ট মাত্র। তখন মনে করা হোত, পরমাণুই ক্ষুদ্রতম একক; রাদারফোর্ডের পরীক্ষাতে α (আলফা) কণিকাগুলির শক্তি ছিল বহু মিলিয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট। আরো আধুনিক কালে আমরা শিখেছি কি করে বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে কণিকাগুলিকে প্রথমে কয়েক মিলিয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি দান করা যায় এবং তারপর দান করা যায়

BanglaBook.org

হাজার হাজার মিলিয়ান ভোল্ট শক্তি। এভাবেই আমরা জানতে পেরেছি কুড়ি বছর আগে যেগুলিকে মৌলকণা ভাবা হোত, সেগুলিও ক্ষুদ্রতর কণা দ্বারা গঠিত। আমরা যদি উচ্চতর শক্তিতে পৌঁছাই, তাহলে কি দেখা যাবে এই কণাগুলি আরো ক্ষুদ্র কণিকা দ্বারা গঠিত? এটা নিশ্চয়ই সম্ভব। কিন্তু আমাদের সত্যসত্যই এমন কিছু তাত্ত্বিক যুক্তি রয়েছে, যার দরুন আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে প্রকৃতির গঠনের অন্তিম মৌলকণা সম্পর্কে আমরা জেনেছি কিম্বা জানার অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়েছি।

আগের অধ্যায়ে আমরা যে তরঙ্গ কণিকা দ্বৈততা সম্পর্কে আলোচনা করেছি, তার সাহায্যে আলোক এবং মহাকর্ষ সমেত মহাবিশ্বের সব কিছুই কণিকার বাহিধিতে প্রকাশ করা যায়। এই কণিকাগুলির একটি ধর্মের নাম চক্রণ (spin)। চক্রণ সম্পর্কে ভাববার একটি পদ্ধতি হল এগুলিকে এক একটি অক্ষে (axis) ঘূর্ণায়মান লাটিম ভাবা। এতে কিন্তু ভুল হতে পারে, কারণ কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আমাদের বলে কণিকাগুলির কোনো সুসংজ্ঞিত (well-defined) অক্ষ নেই। একটি কণিকার চক্রণ বলতে বাস্তবে যা বোঝায় সেটা হল বিভিন্ন অভিমুখ থেকে সেটা কি রকম দেখায়। একটি কণিকার চক্রণ (spin) যদি শূন্য হয় তাহলে

চিত্র ৫.১

সেটা একটা বিন্দুর মতো: যে কোনো দিক থেকে সেটা একই রকম দেখাবে (চিত্র ৫.১-i)। কণিকার চক্রণ ১ হলে সেটা একটা তীরের মতো, এক এক দিক থেকে সেটা দেখতে এক এক রকম (চিত্র ৫.১-ii)। শুধুমাত্র যদি পূর্ণভাবে আবর্তিত (৩৬০ ডিগ্রী) হয়, তা হলেই

কণাটিকে এক রকম দেখাবে। দুই চক্রণ বিশিষ্ট কণিকা একটি দুমুখী তীরের মতো (চিত্র ৫.১-iii), অর্ধবৃত্ত পথে আবর্তিত হলে (১৮০ ডিগ্রী) সেটাকে এক রকম দেখাবে। একইভাবে উচ্চতর চক্রণবিশিষ্ট কণিকাগুলিকে একই রকম দেখাবে, যদি সেগুলিকে পূর্ণ আবর্তনের ক্ষুদ্রতর ভগ্নাংশ পরিমাণ ঘোরানো যায়। এই পর্যন্ত ব্যাপারটা সহজবোধ্য (fairly straight forward) কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, এমন অনেক মৌলকণা আছে, যেগুলিকে ঠিক একটি আবর্তনে এক রকম (look the same) দেখায় না। সেগুলিকে এক রকম দেখায় দুটি আবর্তনে। বলা হয় এই মৌল কণাগুলির চক্রণ অর্ধেক ($\frac{১}{২}$)।

মহাবিশ্বের সমস্ত জানিত কণিকাগুলিকে দুই গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়: যে সমস্ত কণিকার চক্রণ (spin) অর্ধেক, পৃথিবীর সমস্ত পদার্থই সেই কণিকাগুলি দিয়ে গঠিত এবং যে সমস্ত কণিকার চক্রণ (spin) ০, ১ এবং ২, আমরা দেখতে পাব সেগুলি দিয়েই পদার্থকণিকার অন্তর্বর্তী বল তৈরী হয়। পদার্থ কণাগুলি পাউলির অপবর্জন নীতি (Pauli's exclusion principle) নামক নীতি মেনে চলে। এ নীতি ১৯২৫ সালে অষ্ট্রীয় পদার্থবিদ উল্‌ফ্‌গ্যাঙ্ পাউলি (Wolfgang Pauli) আবিষ্কার করেন। এ আবিষ্কারের জন্য তিনি ১৯৪৫ সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তাত্ত্বিক পদার্থবিদদের মূল আদর্শ (archetypal)। তাঁর সম্পর্কে কথিত আছে, এমন কি একই শহরে তাঁর উপস্থিতিও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলিকে গোলমাল করিয়ে দিত। পাউলির অপবর্জন নীতির বক্তব্য: দুটি সমরূপ (similar) কণা একই অবস্থায় থাকতে পারে না। অর্থাৎ অনিশ্চয়তাবাদ অনুমোদিত সীমার ভিতরে দুটি কণারই একই অবস্থান এবং একই গতিবেগ থাকতে পরে না। অপবর্জন নীতি বিনিশ্চায়ক (crucial)। কারণ: চক্রণ ০,১ এবং ২ বিশিষ্ট কণাগুলি দ্বারা সৃষ্ট বলের প্রভাবে পদার্থগুলি কেন চুপ্‌সে অত্যন্ত ঘন অবস্থায় পৌঁছায় না, অপবর্জন নীতি সেটা ব্যাখ্যা করে। পদার্থ কণাগুলির অবস্থান অত্যন্ত সন্নিকট হলে তাদের গতিবেগে পার্থক্য থাকবেই। এর অর্থ হবে কণাগুলি একই অবস্থায় বেশী ক্ষণ থাকবে না। পৃথিবী যদি অপবর্জন নীতি ছাড়া সৃষ্ট হোত, তা হলে কার্কগুলি বিচ্ছিন্ন সুসংজ্ঞিত প্রোটন এবং নিউট্রন গঠন করত না। আবার এগুলিও ইলেকট্রন সহযোগে বিচ্ছিন্ন সুসংজ্ঞিত পরমাণু গঠন করতে পারত না। তারা সবাই চুপ্‌সে মোটামুটি এক রকম ঘন একটি "সুপ" (soup) তৈরী করত।

ইলেকট্রন এবং অর্ধেক চক্রণ বিশিষ্ট কণিকাগুলি সম্পর্কে ১৯২৮ সালের আগে সঠিক উপলব্ধি হয় নি। সে বছরে পল ডিরাক্ (Paul Dirac) একটি তত্ত্ব উপস্থিত করেন। তিনি পরে কেম্ব্রিজে গণিতশাস্ত্রের লুকেসিয়ান (Lucasian) অধ্যাপক নির্বাচিত হন (এক সময় নিউটন এই অধ্যাপক পদে ছিলেন এবং এই পদে এখন আমি রয়েছি)। ডিরাক-এর তত্ত্বই এই ধরনের প্রথম তত্ত্ব যার সঙ্গে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এবং বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের সঙ্গতি রয়েছে। ইলেকট্রনের কেন অর্ধেক চক্রণ রয়েছে এবং সম্পূর্ণ একটি আবর্তনে তাকে কেন একই রকম দেখায় না, অথচ দুটি আবর্তনে দেখায়— এই প্রশ্নগুলি ডিরাকের তত্ত্ব গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করেছে। এই তত্ত্ব আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী করে: ইলেকট্রনের নিশ্চয়ই একটি জুড়ি থাকবে। অর্থাৎ থাকবে একটি বিপরীত ইলেকট্রন (anti-electron) কিম্বা পজিট্রন। ১৯৩২ সালে পজিট্রন আবিষ্কৃত হয়। ফলে ডিরাকের তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণিত হয়। এই আবিষ্কার

১৯৩৩ সালে ডিরাকের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পথিকৃৎ। আমরা এখন জানি প্রতিটি কণিকারই একটি বিপরীত-কণিকা (anti-particle) আছে। তার সঙ্গে কণিকাটি বিনাশপ্রাপ্ত (annhilated) হতে পারে (বলবাহী কণাগুলির ক্ষেত্রে বিপরীত কণিকা এবং কণিকাটি অভিন্ন)। বিপরীত কণিকার দ্বারা গঠিত বিপরীত-পৃথিবী এবং বিপরীত মানুষও থাকতে পারে। কিন্তু আপনার বিপরীত সত্তার সঙ্গে দেখা হলে তার সঙ্গে করমর্দন করবেন না। তা করলে আপনারা দুজনেই একটা বিরাট আলোর ঝলকে মিলিয়ে যাবেন। বিপরীত কণিকার তুলনায় সাধারণ কণিকাগুলির সংখ্যা এত বেশী মনে হয় কেন? এ প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ের শেষে আমি সে প্রশ্নে ফিরে আসব।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় অনুমান করা হয়—পদার্থ কণিকাগুলির অন্তর্বর্তী বল কিম্বা পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াগুলি পূর্ণসংখ্যায় চক্রণ (spin) বিশিষ্ট কণা দ্বারা বাহিত হয়। যেমন—০, ১ এবং ২। আসলে যা ঘটে তা হল: ইলেকট্রন কিম্বা কার্কের মতো একটা পদার্থ কণিকা একটি বলবাহী কণিকা নিক্ষেপ করে। এই নিক্ষেপে (emission) যে প্রত্যাগতি (recoil) হয়, তার ফলে পদার্থ কণাটির গতিবেগের পরিবর্তন হয়। বলবাহী কণিকাটির সঙ্গে তখন অন্য একটি পদার্থ কণিকার সংঘর্ষ হয়। ফলে বলবাহী কণিকাটি বিশোষিত হয় (absorbed)। এই সংঘর্ষের ফলে দ্বিতীয় কণিকাটির গতিবেগের পরিবর্তন হয়, ঠিক যেন দুটি পদার্থ কণিকার ভিতরে একটি অন্তর্বর্তী বল ছিল।

বলবাহী কণিকাগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হল, তারা অপবর্জন নীতি মানে না (exclusion principle)। এর অর্থ হল কতগুলি কণিকার বিনিময় হবে তার সংখ্যার কোনো সীমা নেই। সুতরাং তা থেকে একটি শক্তিশালী বল উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু বলবাহী কণিকাগুলির ভর বেশী হলে, সেগুলি তৈরী করা (produce) এবং বেশী দূরত্বে বিনিময় করা (exchange) খুব কঠিন হবে। সুতরাং তারা যে বল বহন করবে তার পাল্লা (range) হবে কম। অন্যদিকে যদি বলবাহী কণিকাগুলির নিজস্ব কোনো ভর না থাকে তাহলে বলগুলির পাল্লা (range) হবে বেশী। বলা হয় কণিকাগুলির অন্তর্বর্তী যে বলবাহী কণিকাগুলির বিনিময় হয় সেগুলি কল্পিত (virtual) কণিকা। কারণ কণিকা অভিজ্ঞাপক যন্ত্রে তাদের "বাস্তব (real)" কণিকার মতো প্রত্যক্ষভাবে সনাক্ত করা যায় না। কিন্তু তাদের অস্তিত্ব আমরা জানতে পারি। তার কারণ, তাদের একটা মাপনযোগ্য অভিক্রিয়া রয়েছে। তারা পদার্থ কণিকাগুলির অন্তর্বর্তী বল সৃষ্টি করে। কোনো কোনো অবস্থায় ০, ১ কিম্বা ২ চক্রণ (spin) বিশিষ্ট কণাগুলি বাস্তব কণিকারূপে বিদ্যমান থাকে। তখন তাদের প্রত্যক্ষভাবে সনাক্ত করা সম্ভব। চিরায়ত পদার্থবিদ্যায় যাকে তরঙ্গ বলে ঐ কণিকাগুলিকে তখন আমাদের সেই রকমই মনে হবে। যেমন, আলোক তরঙ্গ কিম্বা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। পদার্থ কণিকাগুলি কল্পিত (virtual) বলবাহী কণিকা বিনিময় দ্বারা যখন পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয় সেই সময় ওগুলি (অর্থাৎ ০, ১ কিম্বা ২ চক্রণ সম্পন্ন বাস্তব কণিকা—অনুবাদক) নির্গত হতে পারে। (উদাহরণ: দুটি ইলেকট্রনের মধ্যবর্তী বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ বলের কারণ দুটি কল্পিত ফোটন বিনিময়। এই ফোটনগুলিকে কখনোই প্রত্যক্ষভাবে সনাক্ত করা যায় না। কিন্তু একটি ইলেকট্রন যদি আর একটিকে অতিক্রম

করে তাহলে বাস্তব ফোটনও নিক্ষিপ্ত হতে পারে, সেগুলিকেই আমরা আলোক তরঙ্গ বলে সনাক্ত করতে পারি)।

বাহিত বলের শক্তি এবং যে সমস্ত কণিকার সঙ্গে তাদের প্রতিক্রিয়া হয় সেই অনুপাতে বলবাহী কণিকাগুলিকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। একটু জোরের সঙ্গেই বলা উচিত: এই চারটি শ্রেণীতে বিভাগ মনুষ্যকৃত। আংশিক তত্ত্ব গঠন করতে গেলে এই রকম বিভাজনে সুবিধা হয় কিন্তু গভীরতর কিছুর অনুরূপ এই বিভাজন নাও হতে পারে। অধিকাংশ পদার্থবিদেরই আশা তাঁরা শেষ পর্যন্ত এমন একটা ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আবিষ্কার করবেন, যার সাহায্যে বলের বিভিন্ন দিক রূপে চারটি বলকে ব্যাখ্যা করা যাবে। আসলে অনেকেই বলবেন আজকের পদার্থবিদ্যার প্রধান লক্ষ্য এটাই। ইদানীং চারটি বলের ভিতরে তিনটি বলকে ঐক্যবদ্ধ করার সফল প্রচেষ্টা হয়েছে। এ অধ্যায়ে আমি সে প্রচেষ্টাগুলির বিবরণ দেব। অবশিষ্ট শ্রেণীকে অর্থাৎ মহাকর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রশ্ন আমি পরবর্তী কালের জন্য রেখে দেব।

প্রথম শ্রেণী হল মহাকর্ষীয় বল। এই বল মহাবিশ্বব্যাপী অর্থাৎ প্রতিটি কণিকাই তার নিজস্ব ভর কিম্বা শক্তি অনুসারে মহাকর্ষীয় বল বোধ করে। চারটি বলের ভিতরে মহাকর্ষীয় বল দুর্বলতম এবং এবিষয়ে অন্য বলগুলির সঙ্গে তার পার্থক্য অনেকটা (by a long way)। এই বল এত দুর্বল যে দুটি বিশেষ ধর্ম না থাকলে এ বল আমাদের নজরেই আসত না। সে দুটি হল: বহু দূরত্বে এ বল ক্রিয়া করতে পারে এবং এ বল সব সময়েই আকর্ষণ করে। এর অর্থ: একটি বৃহৎ বস্তুপিণ্ডের অন্তর্বর্তী একত্র কণিকাগুলির অত্যন্ত দুর্বল মহাকর্ষীয় বল সংযুক্ত হয়ে একটি লক্ষণীয় বল উৎপাদন করতে পারে। উদাহরণ: পৃথিবী এবং সূর্য। অন্য তিনটি বলগুলির হয় পাল্লা (range) ছোট কিম্বা কখনো তারা আকর্ষণকারী, কখনো তারা বিকর্ষণকারী। সুতরাং তাদের পরস্পরকে বাতিল করার প্রবণতা রয়েছে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গিতে, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে দুটি পদার্থ কণার অন্তর্বর্তী বল বহন করে গ্র্যাভিটন (graviton) নামক দুটি চক্রণ (spin) বিশিষ্ট একটি কণিকা, এই কণিকার নিজস্ব কোনো ভর নেই, সে জন্য সে যে বল বহন করে তার পাল্লা দীর্ঘ। বলা হয়: সূর্য এবং পৃথিবীর অন্তর্বর্তী মহাকর্ষীয় বল পারস্পরিক গ্র্যাভিটন (graviton) বিনিময় থেকে উদ্ভূত। এই কণিকাগুলি যদিও কল্পিত (virtual) তবুও তারা নিশ্চিতভাবে একটি মাপনযোগ্য ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তারা পৃথিবীকে সূর্য প্রদক্ষিণ করায়। চিরায়ত পদার্থবিদরা যাকে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বলতেন, সেগুলি আসলে বাস্তব গ্র্যাভিটন (graviton)। মহাকর্ষীয় তরঙ্গগুলি খুব দুর্বল। সেগুলি সনাক্ত করা এত কঠিন যে কখনোই সেগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা যায় নি।

পরের শ্রেণীর নাম বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল। এই বলের ইলেকট্রন এবং কার্কের (quark) মতো বৈদ্যুতিক আধান বিশিষ্ট কণিকার সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া হয় কিন্তু গ্র্যাভিটনের (graviton) মতো আধান বিহীন কণিকার সঙ্গে কোনো পারস্পরিক ক্রিয়া হয় না। দুটি ইলেকট্রনের অন্তর্বর্তী বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল মহাকর্ষীয় বলের চাইতে মিলিয়ান মিলিয়ান মিলিয়ান মিলিয়ান মিলিয়ান মিলিয়ান (একের পিঠে সিয়াত্তরটা শূন্য) গুণ শক্তিশালী। বৈদ্যুতিক আধান কিন্তু দু রকমের পরা (positive) এবং অপরা (negative)। দুটি পরা আধানের অন্তর্বর্তী বল বিকর্ষণকারী তেমনি দুটি অপরা (negative) আধানের অন্তর্বর্তী বল বিকর্ষণকারী। কিন্তু একটি

পরা এবং একটি অপরা আধানের অন্তর্বর্তী বল আকর্ষণকারী। সূর্য কিম্বা পৃথিবীর মতো একটি বৃহৎ বস্তুপিণ্ডে প্রায় সম সংখ্যক পরা এবং অপরা আধান রয়েছে। সুতরাং একক বস্তুপিণ্ডগুলির অন্তর্বর্তী আকর্ষণকারী এবং বিকর্ষণকারী বলগুলি পরস্পরকে প্রায় বাতিল করে দেয় ফলে অবশিষ্ট (net) বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল থাকে সামান্যই। কিন্তু অণু পরমাণুর মতো ক্ষুদ্র মাত্রার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বলের প্রাধান্য থাকে। অপরা আধান বিশিষ্ট ইলেকট্রন এবং পরা আধান বিশিষ্ট কেন্দ্রকের (nucleus) অন্তর্বর্তী আকর্ষণই ইলেকট্রনকে পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করায়। ব্যাপারটা পৃথিবীকে যে রকম মহাকর্ষীয় বল সূর্যকে প্রদক্ষিণ করায় সেই রকম। বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় আকর্ষণকে মনে করা হয় ফোটন নামক ভরহীন কল্পিত (virtual) এক চক্রণ (spin) বিশিষ্ট বহু সংখ্যক কণিকার বিনিময়ের ফলশ্রুতি। যে সমস্ত ফোটন বিনিময় হয় সেগুলি কিন্তু কল্পিত কণিকা[১]। কিন্তু যখন একটি ইলেকট্রন একটি অনুমোদিত কক্ষ থেকে কেন্দ্রকের নিকটতর অন্য একটি কক্ষে গমন করে তখন শক্তি মুক্ত হয় এবং একটি বাস্তব ফোটন নির্গত হয়। যদি তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য সঠিক থাকে তা হলে সেটা মানুষের চোখে ধরা পড়ে। এছাড়া দেখা যায় ফোটোগ্রাফের ফিল্মের মতো কোনো ফোটন সংবেদক যন্ত্রের সাহায্যে। সেই রকম একটি বাস্তব ফোটনের সঙ্গে একটি পরমাণুর সংঘর্ষ হলে একটি ইলেকট্রনকে কেন্দ্রকের (nucleus) নিকটতর কক্ষ থেকে একটি দূরতর কক্ষে সরিয়ে নিতে পারে। ফলে ফোটনের শক্তি ব্যবহৃত হয় সুতরাং সে বিশোষিত হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর নাম দুর্বল কেন্দ্রকীয় বল (weak nuclear force)। তেজস্ক্রিয়তার কারণ এই বল। অর্ধেক চক্রণ বিশিষ্ট সমস্ত পদার্থ কণিকার উপরই এই বল ক্রিয়া করে কিন্তু ফোটন কিম্বা গ্রাভিটনের মতো ০, ১ কিম্বা ২ চক্রণ বিশিষ্ট কোনো কণিকার উপরে ক্রিয়া করে না। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এই দুর্বল কেন্দ্রকীয় বলকে ভাল করে বোঝা যায় নি। সেই সময় লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের আবদুস সালাম এবং হার্ভার্ডের স্টিভেন উইনবার্গ কয়েকটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। সেই তত্ত্বগুলি এই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াকে (interaction) বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ (unified) করে। প্রায় একশ বছর আগে ম্যাক্সওয়েল (Maxwell) বৈদ্যুতিক এবং চুম্বকীয় বলকে এইভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। সালাম এবং উইনবার্গের বক্তব্য ছিল ফোটন ছাড়া আরো তিনটি এক চক্রণ (spin) বিশিষ্ট কণিকার অস্তিত্ব আছে। একত্রে এগুলির নাম (? অধিক ভরযুক্ত) ভেক্টর বোসনস্ (massive vector bosons)[২]। এগুলি দুর্বল বলটিকে বহন করে। এগুলির নাম W^+ (উচ্চারণ— ডব্লু প্লাস), W^- (উচ্চারণ— ডব্লু মাইনাস) এবং Z^0 (উচ্চারণ— জেড্ নট) এবং প্রত্যেকটির ভর প্রায় ১০০ GeV (GeV —এর অর্থ giga electron-volt কিম্বা এক হাজার মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট)। উইনবার্গ-সালামের তত্ত্ব একটি ধর্ম প্রদর্শন করে তার নাম স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিসাম্য ভঙ্গ হওয়া (spontaneous symmetry breaking)। এর অর্থ, স্বল্প শক্তিতে (at low

১। অর্থাৎ এগুলি মানুষের চোখে দৃশ্যমান আলোকরূপে ধরা পড়ে।

২। বোসন নামটি হয়েছে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম থেকে—অনুবাদক

energy) যে সমস্ত কণিকাগুলিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মনে হয় সেগুলি আসলে একই জাতীয় কণিকা, তবে বিভিন্ন অবস্থায়। উচ্চ শক্তিতে (at high energy) এই সমস্ত কণিকার আচরণ সমরূপ। ব্যাপারটা অনেকটা রুলেট (roulette)[১] চক্রে অবস্থিত রুলেট বলের আচরণের মতো। উচ্চশক্তিতে (যখন চক্রটি খুব তাড়াতাড়ি ঘুরছে) বলটির আচরণ মূলত একই রকম। এটা ঘোরে আর ঘোরে। কিন্তু ঘূর্ণন ধীরতর হলে বলের শক্তি কমে যায়। শেষ পর্যন্ত বলটা চক্রের ৩৭টি গর্তের ভিতরকার যে কোনো একটা গর্তে পড়ে। অন্য কথায় কম শক্তির ক্ষেত্রে বলটি ৩৭টি অবস্থায় থাকতে পারে। কোনো কারণে যদি আমরা স্বল্প শক্তি সম্পন্ন অবস্থায় বলটিকে পর্যবেক্ষণ করতে পারতাম তা হলে আমরা ভাবতাম ৩৭টি বিভিন্ন ধরনের বল রয়েছে।

উইনবার্গ-সালাম তত্ত্ব অনুসারে ১০০ GeV-এর চাইতে অনেক বেশী উচ্চ শক্তিতে তিনটি নতুন কণিকা এবং ফোটন সবগুলিরই আচরণ হবে এক রকম। কিন্তু অধিকাংশ স্বাভাবিক অবস্থায় যে স্বল্পতর কণিকাশক্তির সৃষ্টি হয়, সেক্ষেত্রে কণিকাগুলির ভিতরকার প্রতিসাম্য (symmetry) ভেঙে যাবে। W^+, W^-, এবং Z^0 অনেক বেশী ভর যুক্ত হবে ফলে তারা যে বল বহন করে তার পাল্লাও (range) অনেক কমে যাবে। সালাম এবং উইনবার্গ যখন এই তত্ত্ব প্রস্তাব করেছিলেন, তখন এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেছিলেন খুব কম লোকই। তাছাড়া কণিকা ত্বরণ যন্ত্রগুলির (particle accelerators) ১০০ GeV শক্তিতে পৌঁছানোর মতো ক্ষমতা ছিল না। W^+, W^-, এবং Z^0 এই সমস্ত বাস্তব কণিকা উৎপন্ন হওয়ার জন্য ঐ পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু পরবর্তী প্রায় দশ বছরে স্বল্প শক্তির ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী পরীক্ষামূলক তথ্যের সঙ্গে এত ভালভাবে মিলে যায় যে ১৯৭৯ সালে সালাম এবং উইনবার্গকে পদার্থবিদ্যার নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। তাঁদের সঙ্গে নোবেল প্রাইজ পান হার্ভার্ডের শেলডন্ গ্লাশো (Sheldon Glashow)। তিনিও দুর্বল কেন্দ্রকীয় বল এবং বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বলের একই ধরনের ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব উপস্থিত করেছিলেন। ১৯৮৩ সালে CERN (European Centre for Nuclear Research)-এ ফোটনের তিনটি ভরযুক্ত (massive) অংশীদার আবিষ্কৃত হয়। এই সঙ্গে আবিষ্কৃত হয় ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ তাদের নির্ভুল ভর এবং অন্যান্য ধর্ম। নোবেল কমিটি একটি ভুল করে অপ্রস্তুত হওয়ার দায় থেকে বেঁচে যায়। কয়েক শ' পদার্থবিদের একটি দল এই আবিষ্কার করেন। তাঁদের নেতা ছিলেন কার্লো রুবিয়া (Carlo Rubbia)। তিনি ১৯৮৪ সালে নোবেল পুরস্কার পান। এই সঙ্গে নোবেল পুরস্কার পান CERN-এর ইঞ্জিনিয়ার সাইমন ভান্ দার মীর (Simon van der Meer)। তিনি পুরস্কার পান বিপরীত পদার্থ (anti matter) সঞ্চয়ের যে ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন সেইজন্য (আজকালকার দিনে আগে থাকতেই শ্রেষ্ঠ কর্মী বলে পরিচিতি না থাকলে পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করা খুবই কঠিন)।

(১) রুলেট : এক ধরনের জুয়া খেলা। একটা টেবিলের মাঝখানে একটা চক্র থাকে সেটা ঘোরানো যায়। তার উপরে একটা বল চালিয়ে দেওয়া হয়। বলটা শেষ পর্যন্ত টেবিলের একটা খাপে গিয়ে পড়ে। খাপগুলিতে একটা করে সংখ্যা লেখা থাকে। —অনুবাদক

শক্তিশালী কেন্দ্রকীয় বলকে (strong nuclear force) বলা হয় চতুর্থ শ্রেণীর বল। এই বল প্রোটন এবং নিউট্রনের কার্কগুলিকে একত্রে ধরে রাখে। তাছাড়া একত্রে ধরে রাখে পরমাণুর কেন্দ্রকের প্রোটন এবং নিউট্রনগুলিকে। বিশ্বাস করা হয় গ্লুয়ন (gluon) নামক

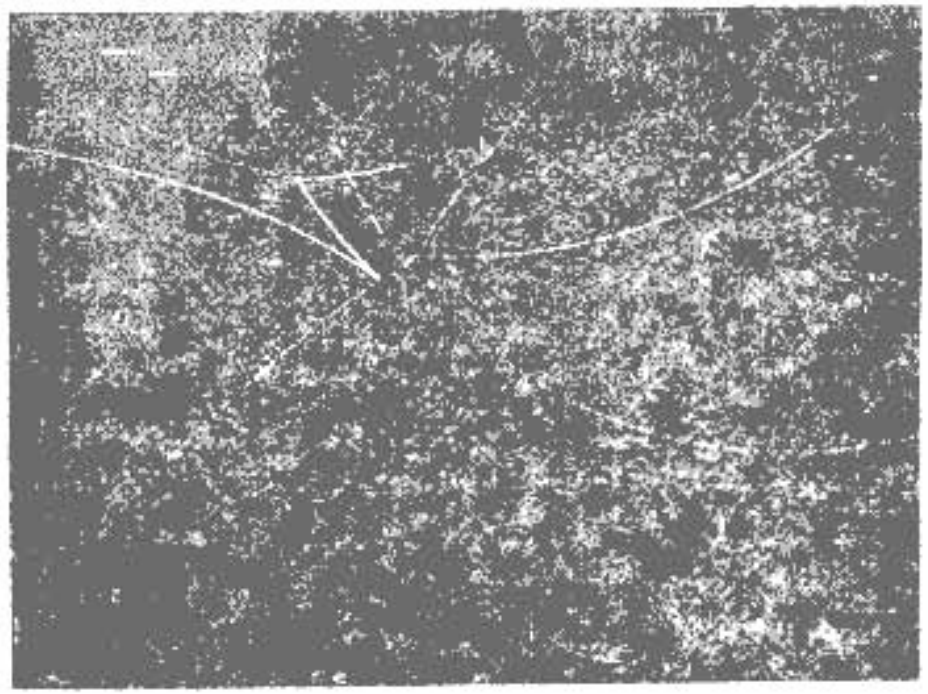

চিত্র ৫.২

উচ্চশক্তির একটি প্রোটন এবং একটি বিপরীত প্রোটনের সংঘর্ষ, ফলে প্রায় স্বাধীন একজোড়া কার্কের উৎপত্তি।

এক চক্রণ বিশিষ্ট মাত্র একটি কণিকা এই বল বহন করে। এই কণিকাগুলি পরস্পরকে প্রতিক্রিয়া হয় শুধুমাত্র নিজের সঙ্গে এবং কার্কের সঙ্গে। শক্তিশালী নিউক্লীয় বলের (strong nuclear force) একটি অদ্ভুত ধর্ম আছে, তার নাম অবরোধ (confinement)। এ বল সবসময়ই কণিকাগুলিকে বন্ধন করে এমনভাবে সংযুক্ত করে যার কোনো বল নেই। অনিঃশেষ একক কোনো কার্ক পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ তাহলেই এর কোনো না কোনো বল থাকবে (লাল, সবুজ কিম্বা নীল)। তার বদলে একটা লাল কার্ককে একটি গ্লুয়ন (gluon) "আলিঙ্গার (string)" সাহায্যে একটি সবুজ এবং একটি নীল কার্কের সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে (লাল + সবুজ + নীল = সাদা)। এইরকম একটি ত্রয়ীর (triplet) দ্বারা একটি প্রোটন কিম্বা নিউট্রন গঠিত হয়। আর একটি সম্ভাবনা কার্ক এবং বিপরীত কার্কের (anti quark) জোড় (লাল + লাল বিপরীত (anti red) কিম্বা সবুজ + সবুজ বিপরীত কিম্বা নীল + নীল বিপরীত = সাদা)।

এই রকম সমন্বয়ে মেসন (meson) নামক কণিকা গঠিত হয়। এই কণিকাগুলি অস্থির; কারণ কার্ক এবং বিপরীত কার্ক পরস্পরকে বিনাশ করে এবং উৎপন্ন করে ইলেক্ট্রন এবং অন্যান্য কণিকা। এইরকম কারণে অবরোধের (confinement) ফলে স্বকীয়ভাবে একক একটি গ্লুয়ন (gluon) পেতে বাধা সৃষ্টি হয়। কারণ, গ্লুয়নেরও নিজস্ব রঙ আছে। তার বদলে একাধিক গ্লুয়নের সমষ্টি পেতে হবে। সেগুলির রঙের যোগফল হবে সাদা। গ্লুয়নের এ রকম সংগ্রহে একটা অস্থির কণিকা গঠিত হয়, তার নাম গ্লুবল (glueball)।

অবরোধী ধর্ম গ্লুয়ন কিম্বা কার্ক পর্যবেক্ষণের প্রতিবন্ধক। এই তথ্যের ফলে কার্ক এবং গ্লুয়নকে কণিকারূপে বিচার সম্পর্কিত সমগ্র ধারণাকেই অধিবিদ্যাশ্রয়ী (metaphysical) মনে হতে পারে। শক্তিশালী নিউক্লীয় বলের (strong nuclear force) কিন্তু অনন্তস্পর্শী স্বাধীনতা (asymptotic freedom) নামক আর একটি ধর্ম আছে। এই ধর্মের অস্তিত্বের ফলে কার্ক এবং গ্লুয়ন সম্পর্কিত ধারণা আরও সুসংস্কৃত হয়েছে। স্বাভাবিক শক্তিস্তরে (at normal energies) শক্তিশালী নিউক্লীয় বল সত্যই শক্তিশালী। এই বল কার্কগুলিকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে রাখে। কিন্তু বৃহৎ কণিকাত্বরণ যন্ত্রের (large particle accelerator) সাহায্যে পরীক্ষার ফল থেকে নির্দেশ পাওয়া যায় : উচ্চশক্তির স্তরে শক্তিশালী বল খুবই কম শক্তিশালী হয়ে পড়ে এবং কার্ক ও গ্লুয়নের আচরণ হয় প্রায় স্বাধীন কণিকার মতো। (চিত্র ৫.২) তে একটি উচ্চশক্তি সম্পন্ন প্রোটন এবং অ্যান্টিপ্রোটনের সংঘর্ষের আলোকচিত্র দেখা যাচ্ছে। কয়েকটি প্রায় স্বাধীন কার্ক সৃষ্টি হয়েছিল এবং চিত্রদৃষ্ট একাধিক উৎসরণ পথ (jets of track) দেখা গিয়েছিল।

বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল এবং দুর্বল নিউক্লীয় বলের ঐক্য সাধনের সাফল্যের ফলে এ দুটি বলের সঙ্গে শক্তিশালী নিউক্লীয় বলের সমন্বয় করে একটি মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব গঠন করার একাধিক প্রচেষ্টা হয়েছে (GUT = Grand Unified Theory)। এই নামকরণ কিন্তু একটি অতিশয়োক্তি। এই সমস্ত প্রচেষ্টার ফলে যে তত্ত্বগুলি সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলি এমন কিছু মহান নয়। এমন কি তারা সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধও নয়, কারণ, মহাকর্ষ এ তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সেগুলি সম্পূর্ণ তত্ত্বও নয়। কারণ, সেগুলিতে এমন কতগুলি স্থিতিমাপ (parameter) রয়েছে, তত্ত্ব থেকে যার মূল্য (value) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না— বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মতো করে মূল্যগুলি (value) বেছে নিতে হয়। তবুও এগুলিকে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব সৃষ্টির পথে একটি পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। GUT (মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব)-এর মূলগত ধারণা : আগে উল্লেখ করা হয়েছিল শক্তিশালী নিউক্লীয় বল উচ্চশক্তির ক্ষেত্রে কম শক্তিশালী হয়ে পড়ে। অন্যদিকে আবার যে সমস্ত বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল এবং দুর্বল বলের অনন্তস্পর্শী (asymptotically) স্বাধীনতা নেই, সেগুলি উচ্চ শক্তিতে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কোনো কোনো অতি উচ্চশক্তির নাম দেওয়া হয়েছে ঐক্য সৃষ্টিকারী মহান শক্তি (grand unification energy)। এই শক্তিতে ৩টি বলের একই রকম শক্তি থাকে। সে অবস্থায় এগুলি একই শক্তির বিভিন্ন দিক হতে পারে (different aspect)। GUT-এর আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী : এই শক্তিতে কার্ক এবং ইলেকট্রনের মতো বিভিন্ন অর্ধচক্রণ বিশিষ্ট (spin 1/2 matter particle) পদার্থকণাগুলি মূলত একই হবে। এইভাবে তারা আর এক ধরনের ঐক্য লাভ করেছে।

মহান ঐক্য সৃষ্টিকারী শক্তির (grand unification energy) পরিমাণগত মূল্য সম্পর্কে খুব বেশী জানা যায় না। তবে যতদূর সম্ভব এর পরিমাণগত মূল্য অন্ততপক্ষে হতে হবে এক হাজার মিলিয়ান মিলিয়ান GeV। আধুনিক কণিকাত্বরণ যন্ত্রগুলি (particle accelerators) প্রায় একশ' GeV শক্তি সম্পন্ন কণিকাগুলির ভিতরে সংঘর্ষ ঘটাতে পারে। অনেক হাজার GeV শক্তি সম্পন্ন কণিকার সংঘর্ষ ঘটাতে পারে এ রকম যন্ত্রের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। মহান ঐক্যসৃষ্টিকারী শক্তিতে কণিকাগুলির ত্বরণ ঘটানোর মতো শক্তিশালী যন্ত্রের আয়তন হবে সৌরজগতের (solar system) মতো বিরাট। আধুনিক অর্থনৈতিক অবস্থায় এই পরিমাণ অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনাও কম। সুতরাং মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব গবেষণাগারে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করা অসম্ভব। কিন্তু বিদ্যুৎ চুম্বকীয় এবং দুর্বল ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের ক্ষেত্রের মতো এই তত্ত্বের স্বল্পশক্তি ফলশ্রুতিও রয়েছে। সেগুলি পরীক্ষা করা সম্ভব।

এগুলির ভিতরে সব চাইতে আকর্ষণীয় হল প্রোটন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। সাধারণ পদার্থের ভরের অনেকটাই প্রোটন দিয়ে তৈরী। এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রোটনগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবক্ষয় হয়ে এন্টিইলেকট্রনের মতো অপেক্ষাকৃত হাল্কা কণিকায় পরিণত হতে পারে। এ রকম ব্যাপার সম্ভব হওয়ার কারণ মহান ঐক্যসৃষ্টিকারী শক্তিতে কার্ক এবং এন্টিইলেকট্রনে কোনো মূলগত পার্থক্য নেই। সাধারণত একটি প্রোটনের ভিতরে যে তিনটি কার্ক থাকে তাদের এন্টিইলেকট্রনে পরিণত হওয়ার মতো শক্তি থাকে না। কিন্তু কখনো কখনো তারা হয়তো পরিবর্তিত হওয়ার মতো প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করতে পারে। এর যুক্তি: অনিশ্চয়তাবাদ অনুসারে প্রোটনের ভিতরকার কার্কের শক্তি নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায় না। এ রকম শক্তি সংগ্রহ করলে প্রোটনের অবক্ষয় হতে পারে। কার্কের এ রকম যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি সংগ্রহ করার সম্ভাবনাও এমন যে এ পরিবর্তন দেখতে হলে আপনাকে অপেক্ষা করতে হতে পারে অন্ততপক্ষে এক মিলিয়ান মিলিয়ান মিলিয়ান মিলিয়ান মিলিয়ান (অর্থাৎ একের পিঠে ত্রিশটি শূন্য) বৎসর। এই সময়ের পরিমাণ বৃহৎ বিস্ফোরণের সময় থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সময়ের পরিমাণের চাইতে অনেক বেশী। সে সময়ের পরিমাণ মাত্র দশ হাজার মিলিয়ান বছর কিম্বা তার কাছাকাছি (একের পিঠে দশটি শূন্য)। সুতরাং অনেকে ভাবতে পারেন প্রোটনের স্বতঃস্ফূর্ত অবক্ষয় পরীক্ষামূলকভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু অতি বৃহৎ সংখ্যায় প্রোটন আছে এই রকম বিরাট পরিমাণ পদার্থ পর্যবেক্ষণ করলে এই অবক্ষয় দেখার সম্ভাবনা থাকতে পারে (উদাহরণ: কেউ যদি একের পিঠে একত্রিশটি শূন্য পরিমাণ সংখ্যায় প্রোটনকে একবছরব্যাপী পর্যবেক্ষণ করে তা হলে সরলতম GUT অনুসারে তার একাধিক প্রোটনের অবক্ষয় দেখার সম্ভাবনা থাকতে পারে)।

এরকম কয়েকটি পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু কোনো পরীক্ষাতেই প্রোটন কিম্বা নিউট্রনের অবক্ষয় সম্পর্কে নিশ্চিত সাক্ষ্য পাওয়া যায় নি। একটি পরীক্ষা করা হয়েছিল ওহাইওর মর্টন লবণ খনিতে (Morton Salt Mine) [কারণ ছিল, মহাজাগতিক (cosmic) রশ্মির ক্রিয়ার ফলে যে সমস্ত ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা সেগুলি এড়িয়ে যাওয়া। কারণ, এই ক্রিয়া এবং প্রোটনের স্বতঃস্ফূর্ত অবক্ষয় নিয়ে একটা বিভ্রান্তি হতে পারে]। এই পরীক্ষাতে ৮০০০ টন জল ব্যবহার করা হয়েছিল। এই পরীক্ষার সময় প্রোটনের কোনো স্বতঃস্ফূর্ত অবক্ষয় দেখা যায় নি। সে

গণনা হিসাব করে বলা যেতে পারে প্রোটনের জীবনকাল দশ মিলিয়ান মিলিয়ান মিলিয়ান মিলিয়ান (একের পিঠে একত্রিশটা শূন্য) বৎসরেরও বেশী। সরলতম মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রোটনের জীবনকালের চাইতে এই সময়কাল বেশী। কিন্তু আরো বিস্তৃত অনেক তত্ত্ব আছে। সে তত্ত্বগুলি অনুসারে ভবিষ্যদ্বাণী করা জীবনকাল আরো অনেক বেশী। এ তত্ত্বগুলি পরীক্ষা করতে গেলে আরো অনেক বেশী পরিমাণ পদার্থ নিয়ে সূক্ষ্মতর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রয়োজন হবে।

স্বতঃস্ফূর্ত প্রোটন অবক্ষয় পর্যবেক্ষণ করা খুব শক্ত। কিন্তু আমাদের অস্তিত্বটাই হয়তো এর বিপরীত পদ্ধতির ফলশ্রুতি। অর্থাৎ প্রোটন উৎপাদনের ফলশ্রুতি। কিম্বা আরো সরলভাবে বলা যায়, যে প্রাথমিক অবস্থায় বিপরীত কার্কের চাইতে কার্ক বেশী ছিল না সেই অবস্থায় উৎপাদনের ফলশ্রুতি। মহাবিশ্বের শুরু সম্পর্কে এটাই সব চাইতে স্বাভাবিক কল্পন। পৃথিবীর পদার্থের বেশীর ভাগই তৈরী প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে। সেগুলি আবার তৈরী কার্ক দিয়ে। বৃহৎ কণিকা ত্বরণযন্ত্রে পদার্থবিদ্‌দের সৃষ্টি করা সামান্য কয়েকটি ছাড়া বিপরীত কার্ক (anti-quark) দিয়ে তৈরী বিপরীত প্রোটন (anti proton) এবং বিপরীত নিউট্রনের (anti--neutron) কোনো অস্তিত্ব নেই। মহাজাগতিক রশ্মিগুলির সাক্ষ্য অনুসারে আমাদের নীহারিকার সমস্ত পদার্থ সাপেক্ষ এ তথ্য সত্য: উচ্চশক্তিতে সংঘটিত সংঘর্ষের ফলে যে সামান্য সংখ্যক কণিকা (particle) বিপরীত কণিকা জোড় (anti particle pairs) সৃষ্টি হয় সেগুলি বাদ দিলে কোনো বিপরীত প্রোটন কিম্বা বিপরীত-নিউট্রনের অস্তিত্ব নেই। আমাদের নীহারিকাতে যদি বিপরীত পদার্থ দিয়ে গঠিত বৃহৎ অঞ্চল থাকত তা হলে পদার্থ এবং বিপরীত পদার্থ অঞ্চলের সীমান্ত থেকে বৃহৎ পরিমাণ বিকিরণ পর্যবেক্ষণ করার আশা আমরা করতে পারতাম। সেখানে বহু কণিকার সঙ্গে বিপরীত কণিকার সংঘর্ষ হেতু ফলে তারা পরস্পরকে বিনাশ করত এবং উচ্চশক্তি সম্পন্ন বিকিরণ নির্গত হোত।

অন্যান্য নীহারিকাতে পদার্থ প্রোটন এবং নিউট্রন অথবা বিপরীত প্রোটন এবং বিপরীত-নিউট্রন দ্বারা গঠিত কি না, এ সম্পর্কে আমাদের কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নেই। তবে হয় এ রকম না হয় ও রকম হওয়া আবশ্যিক: একই নীহারিকাতে দুইয়ের মিশ্রণ থাকতে পারে না। কারণ, সেরকম হলে আমরা বিনাশের ফলে উদ্ভূত প্রচুর বিকিরণ দেখতে পেতাম। সেজন্য আমরা বিশ্বাস করি সমস্ত নীহারিকাই কার্ক দিয়ে গঠিত, বিপরীত-কার্ক দিয়ে নয়। মনে হয় কতগুলি নীহারিকা পদার্থ দিয়ে গঠিত এবং কতগুলি নীহারিকা বিপরীত পদার্থ দিয়ে গঠিত—এ রকম সম্ভাবনা নেই।

বিপরীত কার্কের তুলনায় কার্কের সংখ্যা অত বেশী কেন? দুইয়েরই সংখ্যায় এক না হওয়ার কারণ কি? দুইয়ের সংখ্যা সমান না হওয়া আমাদের সৌভাগ্য। তার কারণ, সে রকম হলে সমস্ত কার্ক এবং বিপরীত-কার্ক মহাবিশ্বের আদিমকালে পরস্পরকে ধ্বংস করে ফেলত। মহাবিশ্ব বিকিরণে ভর্তি থাকত, কিন্তু বিশেষ কোনো পদার্থ থাকত না। মনুষ্যজীবন বিকাশ লাভ করার মতো কোনো নীহারিকা, কোনো তারকা, কোনো গ্রহ থাকত না। শুরুতে যদি দুইয়ের সংখ্যা সমান থেকেও থাকে, তা হলেও এখন কার্কের সংখ্যা এত বেশী কেন সৌভাগ্যক্রমে সে সম্পর্কে ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বগুলি একটি ব্যাখ্যা দিতে পারে। আমরা দেখেছি

উচ্চশক্তিতে কার্কের বিপরীত ইলেকট্রনে রূপান্তরিত হওয়ার অনুমোদন GUT-এর আছে। এর বিপরীত পদ্ধতি অর্থাৎ বিপরীত কার্কের ইলেকট্রনে রূপান্তর এবং ইলেকট্রন আর বিপরীত ইলেকট্রনের বিপরীত-কার্ক এবং কার্কে রূপান্তর তারা অনুমোদন করে। মহাবিশ্বের অতি আদিম যুগে একটা সময় ছিল যখন মহাবিশ্ব এত উত্তপ্ত হওয়ার ফলে কণিকা শক্তি এত উচ্চমানের হোত যে এই সমস্ত রূপান্তর সম্ভবপর ছিল কিন্তু তার ফলে কার্কের সংখ্যা বিপরীত-কার্কের চাইতে বেশী হবে কেন? তার কারণ পদার্থবিদ্যার বিধিগুলি কণিকা এবং বিপরীত কণিকার ক্ষেত্রে অভিন্ন নয়।

১৯৫৬ সাল অবধি বিশ্বাস ছিল পদার্থবিদ্যার বিধিগুলি তিনটি পৃথক প্রতিসাম্যের (symmetry) প্রত্যেকটিকে মেনে চলে। এদের নাম C, P এবং T। C প্রতিসাম্যের অর্থ: বিধিগুলি কণিকা এবং বিপরীত কণিকার ক্ষেত্রে অভিন্ন। প্রতিসাম্য P-এর অর্থ: বিধিগুলি যে কোনো পরিস্থিতি এবং তার দর্পণ প্রতিবিম্বের (mirror image) ক্ষেত্রে অভিন্ন হবে (দক্ষিণ দিকে ঘূর্ণায়মান একটি কণিকার দর্পণ প্রতিবিম্ব হবে বাম দিকে ঘূর্ণায়মান প্রতিবিম্ব)। প্রতিসাম্য T-এর অর্থ: আপনি যদি সমস্ত কণিকা এবং প্রতিকণিকার গতি বিপরীতমুখী করে দেন, তা হলে তন্ত্রটি (system) অতীত কালে যা ছিল সে অবস্থায় ফিরে যাবে। অর্থাৎ বিধিগুলি কালের সম্মুখ অভিমুখে এবং পশ্চাৎ অভিমুখে একই হবে।

১৯৫৬ সালে সুং-দাও লী (Tsung-Dao Lee) এবং চেন নিং ইয়াং (Chen Ning Yang)[1] নামে দুজন আমেরিকান পদার্থবিদ প্রস্তাবনা করেন যে, আসলে দুর্বল বল (weak force) প্রতিসাম্য P মানে না। অর্থাৎ দুর্বল বল (weak force) তার দর্পণ প্রতিবিম্বের যেভাবে বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল মহাবিশ্বকে তার তুলনায় অন্যভাবে বিকশিত করবে। সে বছরই চেন্-শিউং উ (Chien-Shiung Wu) নাম্নী আর একজন সহকর্মী তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করেন। সেই মহিলার পদ্ধতি ছিল: একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পরমাণুর কেন্দ্রকগুলিকে এক সারে (lining up) সাজিয়ে দেওয়া যার ফলে তারা সবগুলি একই অভিমুখে ঘূর্ণায়মান থাকে। তিনি দেখিয়েছিলেন এক অভিমুখের তুলনায় অন্য অভিমুখে বেশী সংখ্যক ইলেকট্রন নির্গত হয়। পরের বছর লী (Lee) এবং ইয়াং তাঁদের চিন্তাধারার জন্য নোবেল পুরস্কার পান। এও দেখা গিয়েছিল যে দুর্বল বল (weak force) প্রতিসাম্য-C মেনে চলে না। অর্থাৎ এর ফলে বিপরীত কণিকা দিয়ে গঠিত মহাবিশ্বের আচরণ আমাদের মহাবিশ্বের চাইতে পৃথক হবে। তবুও মনে হয়েছিল দুর্বল বল CP-এর যুক্ত প্রতিসাম্য মেনে চলে। অর্থাৎ এর উপরে যদি প্রতিটি কণিকাকে তার বিপরীত কণিকার সঙ্গে বদলে নেওয়া যায়, তা হলে মহাবিশ্ব তার দর্পণ প্রতিবিম্বের মতো একইভাবে বিকাশ লাভ করবে। কিন্তু ১৯৬৪ সালে জে. ডব্লিউ. ক্রোনিন (J. W. Cronin) এবং ভ্যাল ফিচ্ (Val Fitch) নামক আরো দুজন আমেরিকান আবিষ্কার করেন কয়েকটি কণিকা তাদের অবক্ষয়ের সময় CP প্রতিসাম্য মেনে চলে না। এগুলির নাম কে-মেসন্ (K-Meson)। পরিণামে ১৯৮০ সালে ক্রোনিন এবং ফিচ্ তাঁদের গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন (আমরা হয়তো যা ভেবেছি,

১: সঠিক চীনা উচ্চারণ অনুবাদকের জানা নেই— অনুবাদক।

মহাবিশ্বের গঠন যে অতটা সরল নয় সেটা প্রমাণ করার জন্য অনেক পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।)

একটা গাণিতিক উপপাদ্য অনুসারে যে তত্ত্ব কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এবং আপেক্ষবাদ মেনে চলে, সে তত্ত্বকে সব সময়ই CPT-এর সংযুক্ত প্রতিসাম্য মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ কণিকাগুলির স্থলে যদি বিপরীত কণিকা (anti particle) প্রতিস্থাপন করা যায় এবং তার দর্পণ প্রতিবিম্ব নেওয়া হয় আর কালের অভিমুখ বিপরীতগামী করা হয়, তা হলেও মহাবিশ্বের আচরণ একই রকম থাকবে। কিন্তু ক্রোনিন এবং ফিচ দেখালেন: যদি কণিকার স্থানে বিপরীত কণিকা (anti particle) স্থাপন করা যায় এবং সেটা যদি দর্পণ প্রতিবিম্বের রূপ গ্রহণ করে কিন্তু সময়ের অভিমুখ যদি বিপরীত না হয় তা হলে মহাবিশ্বের আচরণ অভিন্ন হবে না। সুতরাং সময়ের অভিমুখ বিপরীত হলে পদার্থবিদ্যার বিধির (law) পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তারা প্রতিসাম্য-T মেনে চলে না।

আদিম মহাবিশ্ব অবশ্যই প্রতিসাম্য-T মানে না: সময় এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হয়। সময়ের অভিমুখ পশ্চাদ্‌বর্তী হলে মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত হবে। এবং যেহেতু প্রতিসাম্য-T মেনে চলে না এ রকম একাধিক বল রয়েছে, সেজন্য মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গেই এই বলগুলি (force) যে সংখ্যায় ইলেকট্রনগুলি বিপরীত কার্কে রূপান্তরিত হয় তার তুলনায় অনেক বেশী বিপরীত ইলেকট্রনকে কার্কে রূপান্তরিত করবে। তারপর মহাবিশ্ব যখন সম্প্রসারিত হয়ে শীতল হবে তখন বিপরীত কার্কগুলি কার্কের সঙ্গে বিনষ্ট হবে কিন্তু যেহেতু বিপরীত কার্কগুলির তুলনায় কার্কের সংখ্যা সামান্য বেশী, সে জন্য সামান্য বেশী পরিমাণ কার্ক অবশিষ্ট থাকবে। আজকের দিনে যে পদার্থ আমরা দেখতে পাই এবং যা দিয়ে আমরা নিজেরাও তৈরী হয়েছি সে পদার্থ এই কার্ক দিয়েই তৈরী। সুতরাং আমাদের অস্তিত্বটাকেই মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বগুলির (grand unified theory) সপক্ষে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু এ প্রমাণ গুণগত (qualitive) মাত্র। অনিশ্চিতিগুলি এমনই যে বিনাশের পর অবশিষ্ট কার্কের সংখ্যা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়, এমন কি কার্ক অবশিষ্ট থাকবে না বিপরীত কার্ক অবশিষ্ট থাকবে সেটা বলা সম্ভব নয় (যদি বিপরীত কার্ক বেশী থাকত, তাহলে কিন্তু আমরা সোজাসুজি বিপরীত কার্কের নাম দিতাম কার্ক এবং কার্কের নাম দিতাম বিপরীত কার্ক)।

মহাকর্ষীয় বল মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। এতে খুব বেশী কিছু এসে যায় না। কারণ, মহাকর্ষীয় বল এত দুর্বল যে মৌলিক কণিকাগুলি কিম্বা পরমাণু নিয়ে বিচার করার সময় আমরা সাধারণভাবে মহাকর্ষীয় বলকে অগ্রাহ্য করতে পারি। কিন্তু যেহেতু এই বলের পাল্লা (range) দীর্ঘ এবং সবসময়ই আকর্ষণী, সে জন্য এই বলের ক্রিয়াগুলি পরস্পরের সঙ্গে যোগযুক্ত হয় (add up)। ফলে পদার্থ কণিকাগুলির সংখ্যা যথেষ্ট বৃহৎ হলে মহাকর্ষীয় বলগুলি অন্যান্য সমস্ত বলের উপরে প্রাধান্য লাভ করতে পারে। সেই জন্য মহাকর্ষ বিশ্বের বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে। এমন কি যে সমস্ত বস্তুপিণ্ডের আকার তারকার মতো সেগুলির ক্ষেত্রেও মহাকর্ষীয় ব অন্যান্য সমস্ত বলের উপরে প্রাধান্য লাভ করতে পারে। ফলে তারকাটি চুপ্‌সে যেতে পারে (collapse)। ১৯৭০-এর দশকে আমার গবেষণার বিষয় ছিল তারকা চুপ্‌সে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট ঐ ধরনের কৃষ্ণগহ্বর এবং সেগুলির সর্ব পার্শ্বের তীব্র মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র

সমূহ। এই গবেষণা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার তত্ত্ব এবং ব্যাপক অপেক্ষবাদ কিভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পারে সে বিষয়ে প্রথম ইঙ্গিতের পথিকৃৎ। এটা ছিল আগামী দিনের কোয়ান্টাম তত্ত্বীয় মহাকর্ষের রূপের একটি ছায়া (glimpse)।

৬

কৃষ্ণগহ্বর

(Black Holes)

কৃষ্ণগহ্বর (Black Holes) শব্দটার উৎপত্তি হয়েছে খুবই সম্প্রতি। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন হুইলার (John Wheeler) নামে একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক এই শব্দটি সৃষ্টি করেছিলেন। এটা আসলে একটি ধারণার বিবরণের নক্সা (graphic description)। এ চিন্তাধারার বয়স অন্তত দুশ' বছর। সে সময় আলোক সম্পর্কে দুটি তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। তার ভিতরে একটি তত্ত্ব নিউটন সমর্থন করতেন। সে তত্ত্ব অনুসারে আলোক কণিকা দিয়ে গঠিত। অন্য তত্ত্ব অনুসারে আলোক তরঙ্গ দিয়ে গঠিত। এখন আমরা জানি আসলে দুটি তত্ত্বই নির্ভুল। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার তরঙ্গ/কণিকার দ্বৈততার ভিত্তিতে আলোককে তরঙ্গ এবং কণিকা দুভাবেই বিচার করা যায়। আলোক তরঙ্গ দিয়ে গঠিত এই তত্ত্বের ভিত্তিতে মহাকর্ষ সাপেক্ষ আলোকের কি প্রতিক্রিয়া হবে সেটা স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু আলোক যদি কণিকা দিয়ে গঠিত হয়, তা হলে আশা করা যেতে পারে কামানের গোলা, রকেট এবং গ্রহগুলির মতো আলোকও মহাকর্ষ দিয়ে প্রভাবিত হবে। প্রথমে ধারণা ছিল আলোক কণিকাগুলির দ্রুতি অসীম। সুতরাং, মহাকর্ষ তার গতি মন্থর করতে পারবে না। কিন্তু রোমার (Roemer) আবিষ্কার করলেন আলোকের দ্রুতির সীমা আছে। এর অর্থ আলোকের উপর মহাকর্ষের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া থাকতে পারে।

এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে জন মিচেল (John Michell) নামে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডন (Don—অধ্যাপক) ১৮৮৩ সালে **ফিলোজফিক্যাল ট্রানজ্যাকশনস্ অব্ দি রয়াল সোসাইটি, লণ্ডন (Philosophical Transactions of the Royal Society of London)** পত্রিকায় একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন একটি তারকার

যদি যথেষ্ট ভর এবং ঘনত্ব থাকে তাহলে তার মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এত শক্তিশালী হবে যে আলোক সেখান থেকে নির্গত হতে পারবে না। সেই তারকার পৃষ্ঠ থেকে নির্গত আলোক বেশী দূর যাওয়ার আগেই তারকাটির মহাকর্ষীয় আকর্ষণ তাকে পিছনে টেনে নিয়ে আসবে। এরকম বহুসংখ্যক তারকা থাকতে পারে এই ধরনের ইঙ্গিত মিচেল দিয়েছিলেন। যদিও সেগুলির আলোক আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারবে না বলে আমরা সেগুলিকে দেখতে পাব না তবুও সেগুলির মহাকর্ষীয় আকর্ষণ আমাদের বোধগম্য হবে। এই সমস্ত বস্তুপিণ্ডকেই আমরা এখন কৃষ্ণগহ্বর বলি। তার কারণ, সত্যিই সেগুলি কৃষ্ণগহ্বর অর্থাৎ স্থানে (space) কৃষ্ণ শূন্যতা। কয়েক বছর পর ফরাসী বৈজ্ঞানিক মার্কুইস্ দ্য লাপ্লাস (Marquis de Laplace) এই রকম ইঙ্গিত করেছিলেন। মনে হয় তাঁর এই ইঙ্গিত ছিল আপাতদৃষ্টিতে মিচেলের ইঙ্গিতের সঙ্গে সম্পর্কহীন। তাঁর বই সিস্টেম অব্ দি ওয়ার্ল্ড (System of the World) এর প্রথম এবং দ্বিতীয় সংস্করণে এই ইঙ্গিত ছিল কিন্তু আকর্ষণীয় ব্যাপার হল: পরবর্তী সংস্করণগুলি থেকে এ ইঙ্গিত তিনি বাদ দিয়েছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন এরকম চিন্তাধারা একটা পাগলামি। (তাছাড়া, উনবিংশ শতাব্দীতে আলোকের কণিকাতত্ত্বের জনপ্রিয়তা চলে যায়, তখন মনে হয়েছিল তরঙ্গতত্ত্ব দিয়ে সব কিছুই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তাছাড়া, তরঙ্গতত্ত্ব মেনে নিলে মহাকর্ষ কি করে আলোককে প্রভাবিত করবে সেটা কোনোক্রমেই বোঝা যায় নি)।

আসলে নিউটনের মহাকর্ষীয় তত্ত্বে আলোককে যে কামানের গোলার মতো মনে করা হয়েছে সেটা সত্যিই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তার কারণ আলোক স্থির দ্রুতি সম্পন্ন। (পৃথিবী থেকে উর্দ্ধদিকে একটি কামানের গোলা ছুঁড়লে মহাকর্ষের প্রভাবে তার গতি মন্থরতর হবে এবং একসময় সেটা থেমে যাবে আর নিচের দিকে পড়তে থাকবে। ফোটন কিন্তু স্থির দ্রুতিতে উপর দিকে যেতেই থাকবে। তাহলে নিউটনীয় মহাকর্ষ কি করে আলোককে প্রভাবিত করবে?) ১৯১৫ সালে আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদ উপস্থাপনের আগে মহাকর্ষ কি করে আলোককে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে কোনো সঙ্গতিপূর্ণ তত্ত্ব উপস্থাপিত হয় নি এবং তারও অনেক পরে অতিবৃহৎ ভরসম্পন্ন তারকাগুলি সাপেক্ষ এই তত্ত্বের ফলশ্রুতি বোধগম্য হয়েছে।

কৃষ্ণগহ্বর কি করে তৈরী হয় সেটা বুঝতে হলে প্রথমে বোঝা দরকার একটি তারকার জীবনচক্র (life cycle)। যখন বৃহৎ পরিমাণ বায়ু (প্রধানত হাইড্রোজেন) নিজস্ব মহাকর্ষীয় আকর্ষণের চাপে নিজের উপরেই চুপসে যেতে থাকে তখন একটি তারকা সৃষ্টি হয়। তারকাটি সঙ্কুচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর পরমাণুগুলির ক্রমশ বেশী ঘন ঘন এবং বর্ধমান দ্রুতিতে পারস্পরিক সংঘর্ষ হতে থাকে, ফলে বায়ু উত্তপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত বায়ু এত উত্তপ্ত হয় যে, হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি সংঘর্ষের পর পরস্পর থেকে দূরে ছিটকে না গিয়ে সংযুক্ত হয়ে হিলিয়ামে (Helium) পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়া একটি নিয়ন্ত্রিত হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের মতো। এর ফলে যে তাপ নির্গত হয় তার জন্যই তারকাটি আলোক বিকিরণ করে। এই বাড়তি উত্তাপ বায়ুর চাপও বাড়াতে থাকে, যখন বায়ুর চাপ এবং মহাকর্ষীয় আকর্ষণ সমান হয় তখন বায়ুর সঙ্কোচন বন্ধ হয়। ব্যাপারটা প্রায় একটি বেলুনের মতো। বেলুনের ভিতরকার বায়ুর চাপ চেষ্টা করে সেটাকে ফোলাতে আর রবারের চাপ চেষ্টা করে বেলুনটাকে ক্ষুদ্রতর করতে। ফলে একটি ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। পারমাণবিক প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত তাপ এবং মহাকর্ষীয়

আকর্ষণে ভারসাম্যের ফলে তারকাগুলি বহুকাল পর্যন্ত সুস্থিত (stable) থাকে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তারকাটির হাইড্রোজেন এবং অন্যান্য পারমাণবিক জ্বালানী ফুরিয়ে যাবে। একটি স্ববিরোধী ব্যাপার হল: শুরুতে তারকাটির জ্বালানী যত বেশী থাকে জ্বালানী ফুরিয়ে যায় তত তাড়াতাড়ি। এর কারণ, তারকাটির ভর যত বেশী হয় মহাকর্ষীয় আকর্ষণের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষার জন্য তাকে তত বেশী উত্তপ্ত হতে হয়। আর তারকাটি যত উত্তপ্ত হবে তার জ্বালানীও তত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে। আমাদের সূর্যের বোধহয় আর পাঁচশো কোটি বছর কিম্বা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত চলবার মতো জ্বালানী আছে কিন্তু আরও ভরসম্পন্ন তারকাগুলি দশ কোটি বছরের মতো অল্প সময়েই তাদের জ্বালানী শেষ করে দিতে পারে। এই কাল মহাবিশ্বের বয়সের চাইতে অনেক কম। একটি তারকার জ্বালানী শেষ হয়ে গেলে সেটা শীতল হতে থাকে আর সঙ্কুচিত হতে থাকে। তখন সেটার কি হতে পারে সেটা বোঝা গিয়েছিল শুধুমাত্র উনিশশো কুড়ির দশকের শেষে।

১৯২৮ সালে সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর (Subrahmanyan Chandrashekhar) নামে একজন ভারতীয় গ্র্যাজুয়েট ছাত্র কেম্ব্রিজে স্যার আর্থার এডিংটনের (Sir Arthur Eddington) কাছে পড়বার জন্য ইংলণ্ডে রওনা হন। তিনি ছিলেন ব্যাপক অপেক্ষবাদ সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। (কোনো কোনো কাহিনী অনুসারে ১৯২০ সালের প্রথম দিকে একজন সাংবাদিক এডিংটনকে বলেছিলেন— পৃথিবীতে ব্যাপক অপেক্ষবাদ বোঝেন মাত্র তিনজন। এডিংটন একটু থেমে উত্তর দিয়েছিলেন— "আমি ভাবতে চেষ্টা করছি তৃতীয় ব্যক্তিটি কে?")। জাহাজে আসবার সময় চন্দ্রশেখর অঙ্ক কষে বার করেছিলেন—ব্যবহারের ফলে সমস্ত জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে নিজের মহাকর্ষের বিরুদ্ধে নিজেকে বহন করতে হলে একটি তারকার ভর কত হতে হবে। ভাবনাটি ছিল এইরকম: তারকাটি ক্ষুদ্র হয়ে গেলে পদার্থ কণিকাগুলি খুব কাছাকাছি এসে যায় সুতরাং পাউলির (Pauli) অপবর্জনতত্ত্ব (exclusion principle) অনুসারে তাদের অত্যন্ত বিভিন্ন গতিবেগ হওয়া আবশ্যক। এইজন্য তারা পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, ফলে তারকাগুলিতে প্রসারণের চেষ্টা দেখা দেয় (tend to make the star expand)। ঠিক যেমন তারকাটির জীবনের শুরুতে মহাকর্ষীয় তত্ত্বের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করেছিল উত্তাপ, তেমনি মহাকর্ষীয় আকর্ষণ এবং অপবর্জনতত্ত্বভিত্তিক (exclusion principle) বিকর্ষণের ভারসাম্য রক্ষিত হলেই তারকাটি তার নিজস্ব আয়তন অপরিবর্তিত রাখতে পারে।

কিন্তু চন্দ্রশেখর বুঝতে পেরেছিলেন অপবর্জনতত্ত্বভিত্তিক বিকর্ষণের একটি সীমা আছে। অপেক্ষবাদ তারকাটির ভিতরকার কণিকাগুলির গতিবেগের পক্ষেও সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিয়েছে। সে সীমা হল আলোকের দ্রুতি (speed of light)। এর অর্থ হল: তারকাটি যথেষ্ট ঘন হলে অপবর্জনতত্ত্বভিত্তিক বিকর্ষণ মহাকর্ষীয় আকর্ষণের চাইতে কম হবে। চন্দ্রশেখর হিসাব করে দেখেছিলেন শীতল তারকার ভর আমাদের সূর্যের ভরের দেড় গুণের চাইতে বেশী হলে সে নিজের মহাকর্ষ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না [এই ভর এখন চন্দ্রশেখরের সীমা (Chandrasekhar limit) নামে খ্যাত]। রুশ বৈজ্ঞানিক লেভ দেভিদোভিচ লান্ডাউ (Lev Davidovich Landau) প্রায় একই সময়ে একই ধরনের আবিষ্কার করেছিলেন।

উক্ত ভারসম্পন্ন তারকাগুলির অন্তিম দশা (ultimate fate) সম্পর্কে এই তত্ত্ব [illegible]

ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। একটি তারকার ভর যদি চন্দ্রশেখর সীমার চাইতে কম হয় তাহলে সেটা সম্ভাব্য অন্তিম দশায় "শ্বেত বামন" (white dwarf) রূপে স্থিতিলাভ করতে পারে। এগুলির ব্যাসার্ধ হয় কয়েক হাজার মাইল আর ঘনত্ব হয় প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে কয়েক শ' টন। নিজ পদার্থের ভিতরকার ইলেকট্রনগুলির অন্তর্বর্তী অপবর্জনতত্ত্বভিত্তিক বিকর্ষণই একটি শ্বেত বামনকে রক্ষা করে (is supported)। বহু সংখ্যক এইরকম শ্বেত বামন তারকা আমরা পর্যবেক্ষণ করে থাকি। প্রথম যে কটি এই ধরনের তারকা আবিষ্কৃত হয়েছিল তার ভিতরে একটি সিরিয়াস (Sirius) নামক তারকাকে প্রদক্ষিণ করে। সিরিয়াস রাতের আকাশের উজ্জ্বলতম তারকা।

ল্যান্ডো তারকার সম্ভাব্য আর একটি অন্তিম দশার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এগুলির ভরের সীমা (limiting mass) সূর্যের এক কিম্বা দুই গুণের ভিতরে কিন্তু আকারে এরা শ্বেত বামনের চাইতেও ছোট। এই তারকাগুলিকেও রক্ষা করে অপবর্জনতত্ত্বভিত্তিক বিকর্ষণ। কিন্তু এই বিকর্ষণ আছে নিউট্রন এবং প্রোটনের, তবে আছে ইলেকট্রনের নয়। সেইজন্য এগুলিকে বলা হোত নিউট্রন তারকা। এগুলির ব্যাসার্ধ হয় মাত্র দশ মাইলের মতো কিন্তু তাদের ঘনত্ব হয় প্রতি ঘন ইঞ্চিতে কোটি কোটি টন। এগুলি সম্পর্কে যখন প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন নিউট্রন তারকা পর্যবেক্ষণের কোনো উপায় ছিল না। আসলে সেগুলি সনাক্ত করা হয়েছে অনেক পরে।

অন্য দিকে আবার যে সমস্ত তারকার ভর চন্দ্রশেখর সীমার চাইতে বেশী, জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে সেগুলিকে বিরাট সমস্যায় পড়তে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেগুলিতে বিস্ফোরণ হয় আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা নিজেদের ভর সীমার ভিতরে নিয়ে আসবার মতো যথেষ্ট পদার্থ পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়। ফলে তারা মহাকর্ষের ক্রিয়ায় চুপ্‌সে যাওয়ার বিপর্যয় (catastrophic gravitational collapse) এড়াতে পারে। তারকাটি যত বড়ই হোক না কেন, এরকম যে সব সময়ই হবে সেটা বিশ্বাস করা বেশ শক্ত ছিল। তারকাটি কি করে জানবে যে তার ওজন কমাতে হবে? তাছাড়া প্রতিটি তারকাই যদি চুপ্‌সে যাওয়া এড়ানোর মতো যথেষ্ট পরিমাণ ভর পরিত্যাগ করতে সক্ষমও হয় তাহলে শ্বেত বামন কিম্বা নিউট্রন তারকার সঙ্গে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো অতিরিক্ত ভর যোগ করলে কি হবে? তাহলে কি সেটা চুপ্‌সে (collapse) অসীম ঘনত্ব (infinite density) প্রাপ্ত হবে? এই ফলশ্রুতির সম্ভাবনাতে এডিংটন প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পান (shocked)। তিনি চন্দ্রশেখরের গবেষণার ফল বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেন। এডিংটন ভেবেছিলেন, একটি তারকা চুপ্‌সে গিয়ে বিন্দুতে পরিণত হবে— এরকম ব্যাপার একেবারেই অসম্ভব। এটাই ছিল অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকের মত। আইনস্টাইন নিজে একটা প্রবন্ধে দাবী করেছিলেন তারকা সঙ্কুচিত হয়ে শূন্য আয়তনে পৌঁছাবে না। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধতা, বিশেষ করে তাঁর অতীতের শিক্ষক এবং তারকার গঠন সম্পর্কে অগ্রগণ্য পণ্ডিত এডিংটনের বিরুদ্ধতার ফলে চন্দ্রশেখর এই গবেষণার ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের (astronomy) অন্য ক্ষেত্রে গবেষণা শুরু করেন। তাঁর গবেষণার একটি ক্ষেত্র ছিল তারকাগুচ্ছের গতি (motion of star

clusters)। কিন্তু ১৯৮৩ সালে যখন তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় তখন অন্তত অংশত সে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল শীতল তারকার ভরের সীমা সম্পর্কীয় তাঁর আগেকার গবেষণার জন্য।

চন্দ্রশেখর দেখিয়েছিলেন অপবর্জনতত্ত্ব চন্দ্রশেখর সীমার চাইতে বেশী ভরসম্পন্ন তারকার চুপ্‌সে যাওয়া বন্ধ করতে পারে না। কিন্তু ব্যাপক অপেক্ষবাদ অনুসারে সেই তারকার কি হবে সেটা বোঝার সমস্যা ১৯৩৯ সালে প্রথম সমাধান করেছিলেন রবার্ট ওপেনহাইমার (Robert Oppenheimer) নামে এক তরুণ আমেরিকান। কিন্তু তাঁর গবেষণার ফলে মনে হয়েছিল তখনকার দিনে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করার মতো কোনো ফলশ্রুতি ঘটবে না। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসে পড়ে এবং ওপেনহাইমার পরমাণু বোমা প্রকল্পে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন। যুদ্ধের পর মহাকর্ষের ফলে চুপ্‌সে যাওয়ার সমস্যা প্রায় সবাই ভুলে যান। বেশীর ভাগ বৈজ্ঞানিকই তখন পরমাণু এবং কেন্দ্রকের (nucleus) মানের (scale) গবেষণায় জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬০ এর দশকে কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং বৃহৎমানে মহাবিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সমস্যা নিয়ে ঔৎসুক্য দেখা দেয়। তার কারণ, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণের সংখ্যা এবং বিস্তৃতি খুব বৃদ্ধি পায়। ওপেনহাইমারের গবেষণা তখন পুনরাবিষ্কৃত হয় এবং কয়েকজনের দ্বারা অরও বিস্তৃতি লাভ করে।

ওপেনহাইমারের গবেষণা থেকে এখন আমরা যে চিত্র পাই সেটা অনেকটা এইরকম: তারকার মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র স্থান-কালে আলোকরশ্মির গতিপথের পরিবর্তন করে। অর্থাৎ তারকাটি না থাকলে যে গতিপথ হওয়ার কথা ছিল তার তুলনায় অন্যরকম হয়। যে আলোক শঙ্কুগুলি (light cones) স্থান-কালে তাদের অগ্রভাগ থেকে নির্গত আলোকের গতিপথ নির্দেশ করে তারকার পৃষ্ঠের (surface) কাছাকাছি সেগুলি ভিতরদিকে সামান্য বেঁকে যায়। সূর্যগ্রহণের সময় দূরস্থিত তারকা থেকে নির্গত আলোকের বেঁকে যাওয়া থেকে এটা বোঝা যায়। তারকাটি যেমন সঙ্কুচিত হয় তার পৃষ্ঠের (surface) মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রও তেমনি শক্তিশালী হতে থাকে এবং আলোক শঙ্কুগুলি ভিতরদিকে আরো বেশী বেঁকে যায়। এর ফলে আলোকের নির্গত হওয়া আরো কঠিন হয়ে পড়ে এবং দূরস্থিত একজন পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে সে আলোক ক্ষীণতর এবং লোহিততর মনে হয়। শেষ পর্যন্ত তারকাটি যখন সঙ্কুচিত হয়ে একটি বিশেষ ক্রান্তিক ব্যাসার্ধ প্রাপ্ত হয় তখন পৃষ্ঠের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এমন শক্তিশালী হয় যে আলোক শঙ্কু ভিতরদিকে বেঁকে যায়। সে বক্রতা এত বেশী হয় যে আলোক আর সেখান থেকে নির্গত হতে পারে না (চিত্র—৬.১)। অপেক্ষবাদ অনুসারে আলোকের চাইতে দ্রুতগামী কিছু হতে পারে না। সুতরাং আলোক যদি নির্গত হতে না পারে তাহলে অন্য কিছুও নির্গত হতে পারে না। মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র সবকিছুকেই পিছন দিকে টেনে রাখে। সুতরাং একগুচ্ছ ঘটনা রইল: স্থান-কালের একটি অঞ্চল যেখান থেকে নির্গত হয়ে দূরস্থিত কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়। এই অঞ্চলেরই আমরা নাম দিয়েছি কৃষ্ণগহ্বর। এর সীমানার নাম ঘটনাদিগন্ত (event horizon)। যে আলোক কৃষ্ণগহ্বর থেকে নির্গত হতে পারেনি সেই আলোকের গতিপথের সঙ্গে এই সীমানার সমাপতন (coincide) ঘটে।

একটি তারকার চুপ্‌সে গিয়ে কৃষ্ণগহ্বর হওয়া পর্যবেক্ষণ করতে গেলে আপনি কি দেখবেন সেটা বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে আপেক্ষবাদে কোনো পরম কালের (absolute time) অস্তিত্ব নেই । প্রত্যেক পর্যবেক্ষকেরই কাল সম্পর্কে তার নিজস্ব মাপন রয়েছে। একটি তারকার উপর অবস্থিত একটি ব্যক্তিসাপেক্ষ কাল দূরে অবস্থিত অন্য একটি ব্যক্তিসাপেক্ষ কালের চাইতে পৃথক হবে। এর কারণ, তারকাটির মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র। অনুমান করা যাক একজন সাহসী মহাকাশচারী একটি তারকার পৃষ্ঠে রয়েছেন। তারকাটি চুপ্‌সে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষটিও চুপ্‌সে ভিতর দিকে চলে যাচ্ছে। তার মহাকাশযান তারকাটিকে প্রদক্ষিণ করছে আর সে নিজের ঘড়ি অনুসারে নিজের মহাকাশযানকে প্রতি সেকেন্ডে একটি করে সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। ধরা যাক তারকাটি কোনো এক সময়ে-- ধরুন ১১টার সময়-- সঙ্কুচিত হতে হতে ক্রান্তিক ব্যাসার্ধ (critical radius) অতিক্রম করে ক্ষুদ্রতর হয়ে যাবে। এই অবস্থায় মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এত শক্তিশালী হয় যে কোনো কিছুই সেখান থেকে নির্গত হতে পারে না। অতএব তার সঙ্কেতগুলিও আর মহাকাশযানে পৌঁছাবে না। এগারোটার কাছাকাছি সময়ে মহাকাশযান থেকে তার পর্যবেক্ষণকারী সঙ্গীরা দেখতে পাবে মহাকাশচারীর কাছ থেকে আসা ধারাবাহিক সঙ্কেতগুলির অন্তর্বর্তী সময় ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে। কিন্তু দশটা বেজে উনষাট মিনিট উনষাট সেকেন্ড পর্যন্ত এই ক্রিয়া হবে অতি অল্প। মহাকাশচারীর প্রেরিত দশটা উনষাট মিনিট আটান্ন সেকেন্ডের সঙ্কেত এবং তার নিজের ঘড়িতে যখন দশটা উনষাট মিনিট উনষাট সেকেন্ড হয়েছে তখনকার প্রেরিত সঙ্কেতের অন্তর্বর্তী সময় সামান্য দীর্ঘতর হবে। কিন্তু এগারোটার সঙ্কেতের জন্য তাকে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে। মহাকাশযান থেকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে মহাকাশচারীর ঘড়ির দশটা উনষাট মিনিট উনষাট সেকেন্ড এবং এগারোটার মধ্যবর্তী সময়ে তারকার পৃষ্ঠ থেকে প্রেরিত আলোকসঙ্কেত অসীমকালে বিস্তৃত। ধারাবাহিক তরঙ্গগুলির মহাকাশযানে আগমনের অন্তর্বর্তী সময় ক্রমশ দীর্ঘতর হবে সুতরাং তারকা থেকে আগমনশীল আলোকও ক্রমশ বেশী লাল হবে এবং ক্ষীণতর হতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত তারকাটি এত ক্ষীণপ্রভ হবে যে সেটা আর মহাকাশযান থেকে দেখা যাবে না। অবশিষ্ট থাকবে শুধু স্থানে একটি কৃষ্ণগহ্বর। তারকাটি কিন্তু মহাকাশযানটির উপর একই রকম মহাকর্ষীয় বল প্রয়োগ করতে থাকবে এবং মহাকাশযানটিও কৃষ্ণগহ্বর প্রদক্ষিণ করতে থাকবে।

নিম্নলিখিত সমস্যার জন্য এই দৃশ্যপটও কিন্তু সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ নয়। তারকা থেকে যত দূরে যাবেন মহাকর্ষও তত দুর্বল হবে। সুতরাং আমাদের সাহসী মহাকাশচারীর পায়ের উপরে মহাকর্ষীয় বল মাথার উপরকার মহাকর্ষীয় বলের চাইতে সব সময়েই বেশী হবে। বলের এই পার্থক্যের ফলে তারকাটি সঙ্কুচিত হয়ে যে ক্রান্তিক ব্যাসার্ধে (critical radius) ঘটনা দিগন্ত (event horizon) সৃষ্টি হয়েছিল সে অবস্থায় পৌঁছানোর আগেই আমাদের মহাকাশচারীকে হয় টেনে সেমাইয়ের মতো লম্বা করে দেবে নয়তো ছিঁড়ে ফেলবে। আমাদের কিন্তু বিশ্বাস মহাবিশ্বে ছায়াপথগুলির কেন্দ্রের মতো বৃহত্তর বস্তু রয়েছে। সেগুলিও মহাকর্ষের

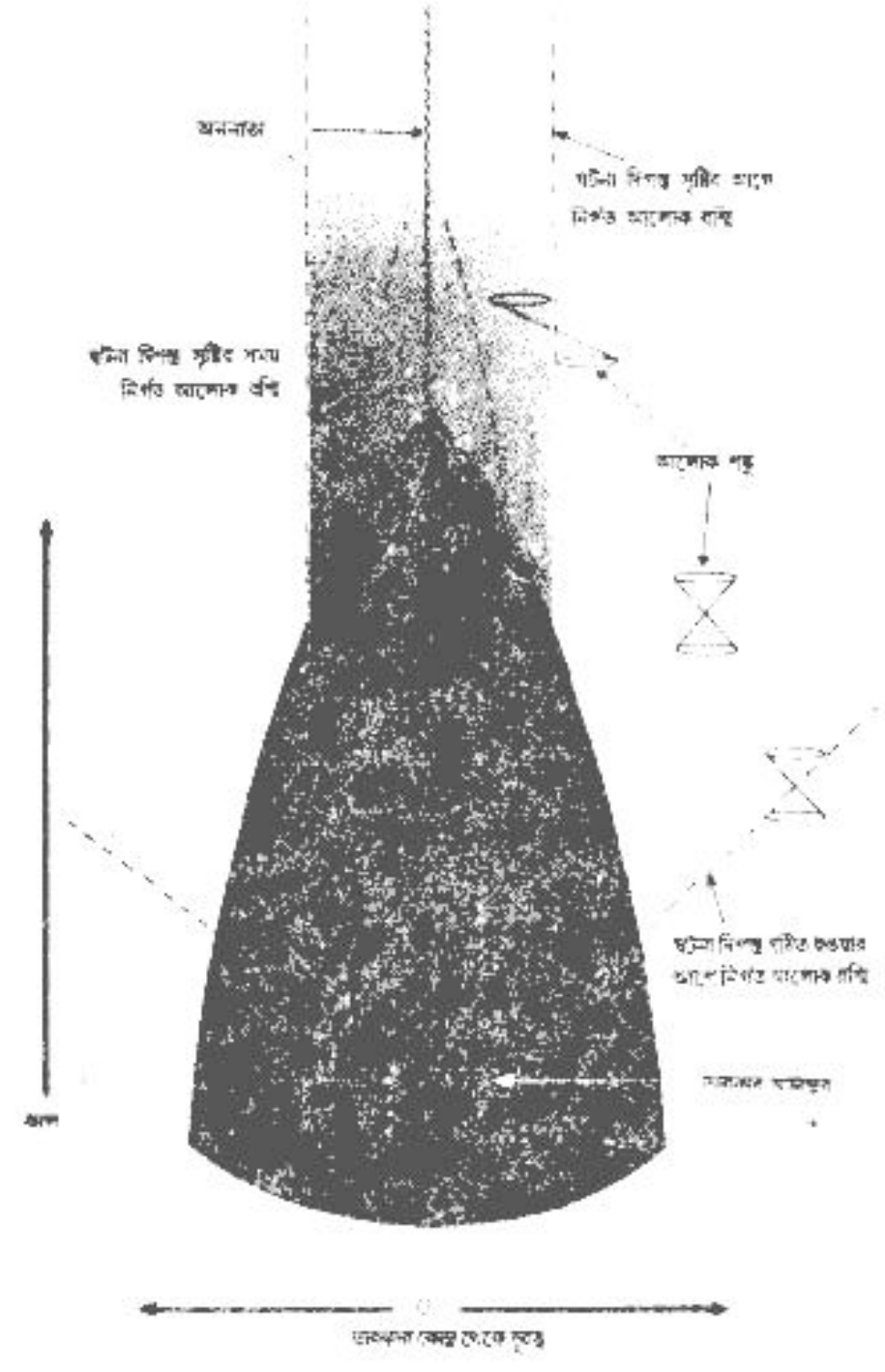

চিত্র - ৬.১

ফলে চুপ্‌সে কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হতে পারে। এগুলির উপরে কোনো মহাকাশচারী থাকলে কৃষ্ণগহ্বর হওয়ার আগে সে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে না। ক্রান্তিক ব্যাসার্ধে পৌঁছানোর আগে তার কোনো বিশেষ অনুভূতি হবে না। যে বিন্দু থেকে ফেরা যায় না সে বিন্দুও সে অতিক্রম করতে পারে কোনো কিছু লক্ষ্য না করেই। তবে অঞ্চলটা যখন চুপ্‌সে যেতে থাকবে তখন কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই পায়ের সঙ্গে মাথার মহাকর্ষীয় বলের পার্থক্য এত বেশী হবে যে, সে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭০ সালের ভিতরে আমি এবং রজার পেনরোজ যে গবেষণা করেছিলাম তা থেকে দেখা গিয়েছে আপেক্ষবাদ অনুসারে কৃষ্ণগহ্বরের ভিতরে অসীম ঘনত্ব এবং স্থান-কাল বক্রতার অনন্যতা (singularity) থাকতেই হবে। এটা অনেকটা কালের আরম্ভের সময়কার বৃহৎ বিস্ফোরণের (big bang) মতো। শুধুমাত্র মহাকাশচারী আর যে বস্তুপিণ্ড চুপ্‌সে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে এ সময়টা হবে কালান্ত। এই অনন্যতায় (singularity) বিজ্ঞানের বিধি এবং আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা ভেঙে পড়বে। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরের বাইরে অবস্থিত কোনো পর্যবেক্ষকের ক্ষেত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণী করার অক্ষমতায় কিছু এসে যায় না। তার কারণ কোনো আলোক কিম্বা অন্য কোনো সঙ্কেতই এই অনন্যতা থেকে তার কাছে পৌঁছাতে পারে না। এই উল্লেখযোগ্য তথ্যই রজার পেনরোজ (Roger Penrose) মহাজাগতিক প্রহরতা প্রকল্পের (cosmic censorship hypothesis) পথিকৃৎ। এ কথাই অন্যভাবে বলা যায় : "ঈশ্বর নিরাবরণ অনন্যতাকে ঘৃণার সঙ্গে পরিহার করেন।" অন্য কথায় বলা যায় : মহাকর্ষের জন্য চুপ্‌সে যাওয়ার মতো অনন্যতা শুধুমাত্র কৃষ্ণগহ্বরের মতো স্থানেই হয়। সেখানে ঘটনা দিগন্ত দিয়ে বাইরের দৃষ্টি থেকে ঘটনাগুলিকে সুষ্ঠুভাবে লুকিয়ে রাখা হয়। সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা যায় এটাই দুর্বল মহাজাগতিক প্রহরতা (weak cosmic censorship) প্রকল্প বলে পরিচিত। যে সমস্ত পর্যবেক্ষক কৃষ্ণগহ্বরের বাইরে থাকেন এই অনন্যতার ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা ভেঙে পড়ার ফলশ্রুতি থেকে তাঁদের রক্ষা করে এই দুর্বল মহাজাগতিক প্রহরতা প্রকল্প। তবে যে হতভাগ্য মহাকাশচারী গহ্বরে পড়ে যায় সে বেচারার জন্য কিন্তু এ প্রকল্প কিছুই করে না।

ব্যাপক আপেক্ষবাদের সমীকরণগুলির এমন কতগুলি সমাধান আছে যেগুলি অনুসারে আমাদের মহাকাশচারীর নিরাবরণ অনন্যতা (naked singularity) দেখা সম্ভব। সে হয়তো অনন্যতায় ঠোক্কর খাওয়া এড়াতে সক্ষম হয়ে একটি সরু ছিদ্র (worm hole) দিয়ে ঢুকে মহাবিশ্বের অন্য অঞ্চলে বেরিয়ে আসতে পারে। এর ফলে স্থান-কালে পরিভ্রমণের একটা বিরাট সুযোগ হতে পারে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মনে হয় এ সমাধানগুলি খুবই অস্থির হওয়া সম্ভব। সবকিছু গোলমাল, এমন কি একজন মহাকাশচারীর উপস্থিতিও পরিস্থিতির এমন পরিবর্তন আনতে পারে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ঠোক্কর খেয়ে তার ভাল শেষ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত হয়তো সে অনন্যতা দেখতেই পেল না। অন্য কথায়, অনন্যতা সব সময়েই থাকবে তার ভবিষ্যতে, অতীতে নয়। মহাজাগতিক প্রহরতা প্রকল্পের শক্তিশালী রূপের (version) বক্তব্য বাস্তব সমাধানের ক্ষেত্রে অনন্যতাগুলি হয় সব সময়ই থাকবে সম্পূর্ণভাবে ভবিষ্যতে (যেমন মহাকর্ষীয় ক্রিয়ায় চুপ্‌সে যাওয়ার মতো অনন্যতা) কিম্বা থাকবে সম্পূর্ণভাবে অতীতে (যেমন বৃহৎ

বিস্ফোরণ)। খুবই আশা করা যায় প্রহরতা প্রকল্পের কোনো কোনো রূপ সত্য হবে, তার কারণ নিরাবরণ অনন্যতার সন্নিকটে অতীতে পরিভ্রমণ করা সম্ভব হতে পারে। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লেখকদের পক্ষে ব্যাপারটা খুবই ভাল কিন্তু কারো জীবনই নিরাপদ হবে না। যে কোনো লোক অতীতে প্রবেশ করে আপনাকে গর্ভে ধারণ করার আগেই আপনার বাবা মাকে হত্যা করতে পারে!

ঘটনা দিগন্ত (event horizon) অর্থাৎ স্থান-কালের যে অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা সম্ভব নয় সেই অঞ্চলের সীমান্ত কৃষ্ণগহ্বরের চারপাশে একটা একমুখী (one way) ঝিল্লির (membrane) মতো কাজ করে। অসতর্ক মহাকাশচারীর মতো কোনো বস্তু ঘটনা দিগন্ত ভেদ করে কৃষ্ণগহ্বরে পতিত হতে পারে কিন্তু ঘটনা দিগন্ত ভেদ করে কোনো কিছুই কৃষ্ণগহ্বর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না (মনে রাখবেন, যে আলোক কৃষ্ণগহ্বর থেকে পলায়ন করতে চাইছে স্থান-কালে সেই আলোকের গতিপথকেই বলে ঘটনা দিগন্ত এবং কোনো কিছুই আলোকের চাইতে দ্রুত পরিভ্রমণ করতে পারে না)। নরকের প্রবেশদ্বার সম্পর্কে কবি দান্তে বলেছিলেন "যারা এখানে প্রবেশ করছো, তারা পরিত্যাগ করো সমস্ত আশা"। ঘটনা দিগন্ত সম্পর্কেও এরকম কথা বলা চলে। যে কোনো লোক কিম্বা যে কোনো বস্তু ঘটনা দিগন্ত ভেদ করে পড়লে অচিরে অসীম ঘনত্ব এবং কালান্তের অঞ্চলে পৌঁছে যাবে।

ব্যাপক আপেক্ষবাদের ভবিষ্যদ্বাণী হল : শুদ্ধভাবে বস্তুপিণ্ড চলমান হলে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সৃষ্টি করবে। এই তরঙ্গগুলি স্থানের বক্রতায় সৃষ্ট তরঙ্গ। এগুলি পরিভ্রমণ করে আলোকের দ্রুতিতে। এগুলি আলোক তরঙ্গের অনুরূপ। আলোক তরঙ্গগুলিও বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের তরঙ্গ তবে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সন্ধান করে সনাক্ত করা আরো কঠিন। আলোক তরঙ্গের মতো এই তরঙ্গগুলিও যে সমস্ত বস্তুপিণ্ড থেকে নির্গত হয় সেগুলি থেকে শক্তি বহন করে দূরে নিয়ে যায়। সুতরাং আশা করা যায় ভারী বস্তুপিণ্ডসম্পন্ন একটি তন্ত্র শেষ পর্যন্ত স্থিরাবস্থা প্রাপ্ত হবে। তার কারণ, মহাকর্ষীয় তরঙ্গ নির্গত হওয়ার ফলে যে কোনো গতির শক্তি দূরে পরিবাহিত হয়। (ব্যাপারটা অনেকটা একটি কর্ককে জলে ফেলার মতো। প্রথমে কর্কটি খুব খানিকটা ওঠানামা করে কিন্তু ঢেউগুলি তার শক্তি বহন করে দূরে নিয়ে যায়, ফলে শেষ পর্যন্ত সেটা স্থিরাবস্থা প্রাপ্ত হয়)। উদাহরণ : পৃথিবী নিজ কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলমান হলে তা থেকে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। শক্তিক্ষয়ের ফলে পৃথিবীর কক্ষের পরিবর্তন হয়, সুতরাং ধীরে ধীরে পৃথিবীটা সূর্যের নিকটতর হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সূর্যের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়ে স্থিরাবস্থায় স্থিতিলাভ করবে। সূর্য এবং পৃথিবীর ক্ষেত্রে শক্তিক্ষয়ের হার অত্যন্ত অল্প— একটি ছোট ইলেকট্রিক ইস্ত্রির জ্বালাতে যতটা শক্তি প্রয়োজন প্রায় ততটা। এর অর্থ হল পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের সংঘর্ষ হতে প্রায় এক হাজার মিলিয়ান মিলিয়ান মিলিয়ান মিলিয়ান বৎসর লাগবে। সুতরাং আশু দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। পৃথিবীর কক্ষের পরিবর্তন এত ধীরে হয় যে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। তবে PSR ১৯১৩+১৬ নামে তন্ত্রটি গত কয়েক বছর পরীক্ষা করে এই একই ক্রিয়া দেখা গিয়েছে (PSR এর অর্থ Pulsar পালসার, এগুলি একটি বিশেষ ধরনের নিউট্রন তারকা। এ থেকে নিয়মিত বেতার তরঙ্গস্পন্দন পাওয়া যায়)। এই তন্ত্রে রয়েছে দুটি নিউট্রন তারকা। এরা পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ

নির্গত হওয়ার দরুন এদের যে শক্তিক্ষয় হয় তার ফলে এরা পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে সর্পিল গতিতে (spiral in) পরস্পরের নিকটতর হয়।

মহাকর্ষের ফলে একটি তারকার চুপ্‌সে গিয়ে কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি হওয়ার সময় গতি অনেক দ্রুততর হবে, সুতরাং তাদের শক্তিক্ষয়ের হারও দ্রুততর হবে। সুতরাং এদের স্থিরাবস্থায় স্থিত হতে খুব বেশী সময় লাগবে না। এই অন্তিম অবস্থা দেখতে কি রকম হবে? অনুমান করা যেতে পারে যে সমস্ত উপাদান দিয়ে তারকাটি গঠিত হয়েছে সেগুলির সমস্ত জটিল অবয়বের উপর এটা নির্ভর করবে— শুধুমাত্র তার ভর এবং ঘূর্ণনের হারই নয়, এটা নির্ভর করবে তারকাটির বিভিন্ন অংশের ঘনত্ব এবং তারকাটির অভ্যন্তরের বায়বীয় পদার্থগুলির (gases) জটিল গতির উপর। যে সমস্ত বস্তুগুলি চুপ্‌সে গিয়ে কৃষ্ণগহ্বরগুলি হয়েছে, কৃষ্ণগহ্বরগুলির নিজেদেরও যদি সেরকম নানা রূপ হয় তাহলে সেগুলি সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্য করা সত্যিই খুব কঠিন হতে পারে।

কিন্তু ১৯৬৭ সালে ওয়ার্নার ইজরায়েল (Werner Israel) নামে কানাডার একজন বৈজ্ঞানিক কৃষ্ণগহ্বর গবেষণায় বিপ্লব এনেছেন (ভদ্রলোকের জন্ম বার্লিনে, তিনি মানুষ হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছেন আয়ার্ল্যান্ড থেকে)। ইজরায়েল দেখিয়েছেন ব্যাপক অপেক্ষবাদ অনুসারে যে সমস্ত কৃষ্ণগহ্বর ঘূর্ণায়মান নয়, সেগুলির গঠন অবশ্যই খুব সরল (simple)। সেগুলি নিখুঁতভাবে গোলীয়। তাদের আয়তন নির্ভর করে শুধুমাত্র তাদের ভরের উপর এবং যে কোনো দুটি কৃষ্ণগহ্বরের ভর যদি এক হয় তাহলে রূপে তারা অভিন্ন। আসলে আইনস্টাইনের সমীকরণগুলির একটি বিশেষ সমাধানের সাহায্যে এগুলির বিবরণ দেওয়া সম্ভব। এ সমাধানগুলি ১৯১৭ সাল থেকেই জানা। ব্যাপক অপেক্ষবাদ আবিষ্কারের স্বল্পকাল পরেই কার্ল সোয়ার্জচাইল্ড (Karl Schwarzschild) এই সমাধান আবিষ্কার করেন। প্রথমদিকে অনেকেরই, এমনকি ইজরায়েলের নিজেরও যুক্তি ছিল: যেহেতু কৃষ্ণগহ্বরগুলির নিখুঁত গোলীয় হতে হবে সুতরাং কৃষ্ণগহ্বর শুধুমাত্র নিখুঁত গোলীয় বস্তু চুপ্‌সে গিয়েই হতে পারে। কোনো বাস্তব তারকা কখনোই নিখুঁত গোলীয় নয়। সুতরাং একটি তারকা শুধুমাত্র নিরাবরণ অনন্যতাই (naked singularity) গঠন করতে পারে।

কিন্তু ইজরায়েলের গবেষণাফলের অন্য একটি ব্যাখ্যাও ছিল। এই ব্যাখ্যা প্রস্তাব করেন রজার পেনরোজ (Roger Penrose) এবং বিশেষ করে জন হুইলার (John Wheeler)। তাঁদের যুক্তি ছিল: একটি তারকার চুপ্‌সে যাওয়ার সঙ্গে গতির যে ত্রুটি জড়িত তার ফলে যে মহাকর্ষীয় তরঙ্গগুলি নির্গত হবে সেগুলি ক্রমশই তারকাটিকে আরো বেশী বেশী গোলীয় (spherical) করে তুলবে এবং যখন স্থিরাবস্থা প্রাপ্ত হবে তখন এটা হবে নিখুঁত ভাবে গোলীয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে যে কোনো ঘূর্ণনবিহীন তারকা মহাকর্ষের ফলে চুপ্‌সে গেলে নিখুঁত গোলীয় কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হবে। তারকাটির আকার এবং অন্তর্বর্তী গঠন যাই হোক না কেন, ঘটনাটি এই রকমই দাঁড়াবে। এই কৃষ্ণগহ্বরের আয়তন নির্ভর করবে শুধুমাত্র তার ভরের উপর। পরবর্তী গণনা এই দৃষ্টিভঙ্গিই সমর্থন করেছে এবং খুবই তাড়াতাড়ি এই মত সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছে।

ইজরায়েলের গবেষণাফল শুধুমাত্র ঘূর্ণনহীন বস্তুপিণ্ড থেকে সৃষ্ট কৃষ্ণগহ্বর নিয়েই বিচার

করেছে। ১৯৬৩ সালে নিউজিল্যান্ডের রয় কের (Roy Kerr) ব্যাপক অপেক্ষবাদের কয়েকটি সমীকরণের সমাধান আবিষ্কার করেন। সেগুলি ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণগহ্বরের বিবরণ দিয়েছে। এই সমস্ত 'কের' কৃষ্ণগহ্বরের ঘূর্ণনের হার স্থির। তাদের আকার এবং অবয়ব নির্ভর করে শুধুমাত্র তাদের ভর এবং ঘূর্ণনের হারের উপর। ঘূর্ণনের হার যদি শূন্য হয় তাহলে কৃষ্ণগহ্বর হয় নিখুঁতভাবে গোল। এই সমাধান এবং সোয়ার্জচাইল্ড সমাধান অভিন্ন। ঘূর্ণন যদি শূন্য না হয় তাহলে কৃষ্ণগহ্বর নিজ বিষুবরেখা (equator) বরাবর স্ফীতি লাভ করে (ঠিক যেমন সূর্য এবং পৃথিবী তাদের নিজস্ব ঘূর্ণনের ফলে স্ফীতিলাভ করে) এবং ঘূর্ণন যত দ্রুত হবে স্ফীতিও তত বেশী হবে। সুতরাং ইজরায়েলের গবেষণাফল ঘূর্ণায়মান বস্তুপিণ্ডগুলির ক্ষেত্রে বিচার করতে হলে অনুমান করতে হয় যে কোনো ঘূর্ণায়মান বস্তুপিণ্ড চুপ্‌সে গিয়ে কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি করলে শেষ পর্যন্ত কের (Kerr) সমাধানে বিবৃত স্থিরাবস্থায় স্থিত হবে।

১৯৭০ সালে ব্রাণ্ডন কার্টার (Brandon Carter) নামে আমার একজন সহকর্মী এবং গবেষক ছাত্র এই অনুমান প্রমাণ করার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি দেখিয়েছিলেন একটি ঘূর্ণায়মান স্থির কৃষ্ণগহ্বরের অক্ষ যদি ঘূর্ণায়মান লাট্টুর মতো প্রতিসম (symmetrical) হয় তাহলে তার আকার এবং গঠন নির্ভর করবে শুধুমাত্র তার ভর এবং ঘূর্ণনের হারের উপর। তারপর ১৯৭১ সালে আমি প্রমাণ করলাম: যে কোনো স্থির ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণগহ্বরের সত্যই ঐরকম একটি প্রতিসম অক্ষ (axis of symmetry) থাকবে। শেষে ১৯৭৩ সালে লণ্ডনের কিংস কলেজের ডেভিড রবিনসন (David Robinson) আমার এবং কার্টারের (Carter) গবেষণাফল ব্যবহার করে দেখালেন অনুমানটা সঠিক ছিল। এরকম একটি কৃষ্ণগহ্বরকে সত্যিই কের সমাধানের অনুগামী হতে হবে। সুতরাং মহাকর্ষের ক্রিয়ায় চুপ্‌সে যাওয়ার ফলে কৃষ্ণগহ্বরটিকে এমন একটি অবস্থায় স্থিত হতে হবে যে অবস্থায় এটা ঘূর্ণায়মান হতে পারে কিন্তু স্পন্দনশীল (pulsating) হবে না। তাছাড়া এটার আয়তন এবং গঠন নির্ভর করবে শুধুমাত্র এর ভর এবং ঘূর্ণনের হারের উপর— যে বস্তুপিণ্ড চুপ্‌সে গিয়ে কৃষ্ণগহ্বরটি তৈরী হয়েছে তার প্রকৃতির (nature) উপর নয়। গবেষণাফলটি পরিচিত হয় এই প্রবচন দিয়ে "একটি কৃষ্ণগহ্বরের কোনো লোম নেই"। "লোম নেই" উপপাদ্যটির ব্যবহারিক গুরুত্ব বিরাট। কারণ এ উপপাদ্য কৃষ্ণগহ্বরগুলির সম্ভাব্য রূপগুলিকে অতীব সীমিত করে। সুতরাং যে সমস্ত বস্তুপিণ্ডের ভিতর কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব সম্ভব সেগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিরূপ গঠন করে সেগুলির ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে পর্যবেক্ষণফলের তুলনা করা যায়। এ তথ্যের অন্য অর্থ হল: যে বস্তুপিণ্ড চুপ্‌সে কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি হয়েছে, কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি হওয়ার সময় সেই বস্তুপিণ্ডটি সম্পর্কে অনেক সংবাদ নিশ্চয়ই হারিয়ে গিয়েছে। কারণ, পরবর্তীকালে আমাদের পক্ষে শুধুমাত্র সেটার ভর এবং ঘূর্ণনের হার মাপাই সম্ভব। পরের অধ্যায়ে এ তথ্যের গুরুত্ব বোঝা যাবে।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বল্পসংখ্যক এমন কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্র আছে যেখানে পর্যবেক্ষণ দ্বারা সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার আগেই বিস্তৃত গাণিতিক প্রতিরূপ (mathematical model) রূপে একটি তত্ত্ব (theory) বিকাশলাভ করেছে। কৃষ্ণগহ্বর তত্ত্ব সেগুলির ভিতরে একটি। আসলে কৃষ্ণগহ্বর বিরোধীদের এটাই ছিল একটি প্রধান যুক্তি: যে বস্তুর একমাত্র সাক্ষ্য ব্যাপক

অপেক্ষবাদ নামক একটি সন্দেহজনক তত্ত্বের ভিত্তিতে গণনা সে বস্তুতে কি করে বিশ্বাস করা যেতে পারে? কিন্তু ১৯৬৩ সালে মার্টেন শ্মিড্ট (Maarten Schmidt) নামে ক্যালিফোর্নিয়ার পালোমার অবজারভেটরীর (Palomar Observatory) একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্বল্পপ্রভ (faint) তারকার মতো একটি বস্তুর আলোকের লোহিত বিচ্যুতি (red shift) মাপেন। বিচ্যুতিটা ছিল 3 সি ২৭৩ নামক বেতার তরঙ্গের উৎস অভিমুখে (অর্থাৎ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতার উৎসের তৃতীয় তালিকার ২৭৩ নম্বর)। তিনি দেখলেন মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ফলে বিচ্যুতির তুলনায় এ বিচ্যুতি অনেক বেশী। এটা মহাকর্ষীয় লোহিত বিচ্যুতি হলে বস্তুটি এত বৃহৎ এবং আমাদের এত নিকটে হোত যে সৌরজগতের গ্রহগুলির কক্ষের গোলমাল (disturb) সৃষ্টি করত। এর থেকে মনে হয়েছিল লোহিত বিচ্যুতির কারণ মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ। তার অর্থ বস্তুপিণ্ডটি বহু দূরে অবস্থিত। অত দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হতে হলে বস্তুপিণ্ডটিকে খুবই উজ্জ্বল হতে হবে। অন্য কথায় তা থেকে বিরাট পরিমাণ শক্তি নির্গত হওয়া আবশ্যিক। এই বিরাট পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করার যে একমাত্র প্রক্রিয়া মানুষের মনে আসতে পারে সেটা হল : মহাকর্ষের ক্রিয়ায় শুধু একটি তারকার চুপসে যাওয়া (gravitational collapse) নয়, চুপসে যাওয়া একটি নীহারিকার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের সমস্তটা। এইরকম— প্রায় তারকার মতো— কয়েকটি বস্তুপিণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলির নাম কোয়াসার (quasistellar objects প্রায় তারকার মতো বস্তু)। এগুলির প্রত্যেকটিরই বৃহৎ পরিমাণ লোহিত বিচ্যুতি আছে। কিন্তু সেগুলি এত বেশী দূরে অবস্থিত যে সেগুলি পর্যবেক্ষণ করে কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কে সিদ্ধান্তমূলক প্রমাণ সংগ্রহ করা খুবই শক্ত।

জোসেলিন বেল (Jocelyn Bell) নামে কেম্ব্রিজের একজন গবেষক ছাত্রী ১৯৬৭ সালে আকাশে এমন কতগুলি বস্তু আবিষ্কার করেন যা থেকে নিয়মিত বেতার তরঙ্গের স্পন্দন নির্গত হয়। এই ঘটনায় কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কে উৎসাহ আরও বাড়ে। প্রথমে বেল এবং তাঁর তত্ত্বাবধায়ক (supervisor) অ্যান্টনি হিউইস (Antony Hewish) ভেবেছিলেন তাঁরা হয়তো নীহারিকার ভিতরে অন্য একটি সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছেন। আমার মনে আছে যে সেমিনারে (seminar— শিক্ষাকেন্দ্রের আলোচনা সভা) তাঁরা তাঁদের আবিষ্কার ঘোষণা করেছিলেন সেখানে আবিষ্কৃত প্রথম চারটি উৎসের নাম দিয়েছিলেন LGM 1-4, LGM এর অর্থ Little Green Men (ছোট সবুজ মানুষ)। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাঁরা এই বস্তুগুলি সম্পর্কে অনেক কম রোমাঞ্চকর সিদ্ধান্তে আসেন। এগুলির নাম দেওয়া হয় পালসার (pulsar–স্পন্দমান) এগুলি ছিল আসলে ঘূর্ণায়মান নিউট্রন তারকা। এগুলি থেকে নিয়মিত বেতার তরঙ্গের স্পন্দন (pulse) নির্গত হয়। এর কারণ চৌম্বক ক্ষেত্র এবং পরিবেষ্টনীর পদার্থের (surrounding) ভিতর জটিল পারস্পরিক ক্রিয়া। যাঁরা স্পেস্ (space–স্থান) সম্পর্কে রোমাঞ্চকর উপন্যাস লেখেন তাঁদের কাছে এটি ছিল দুঃসংবাদ। কিন্তু আমাদের মতো যে ক'জন স্বল্পসংখ্যক লোক সে সময় কৃষ্ণগহ্বরে বিশ্বাস করত তাদের কাছে এ সংবাদ ছিল অতীব আশাপ্রদ। নিউট্রন তারকার অস্তিত্ব সম্পর্কে এটাই ছিল প্রথম ইতিবাচক সাক্ষ্য। একটি নিউট্রন তারকার ব্যাসার্ধ হবে প্রায় দশ মাইল। যে ক্রান্তিক ব্যাসার্ধে একটি তারকা কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হয় এই ব্যাসার্ধ

ছিল তার চাইতে মাত্র কয়েক গুণ বেশি। একটি তারকা যদি চুপসে অত ক্ষুদ্রাকার হতে পারে তাহলে অন্য অনেক তারকাও যে চুপসে কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হতে পারে এ রকম আশা করা অযৌক্তিক নয়।

সংজ্ঞা অনুসারে কৃষ্ণগহ্বর থেকে কোনো আলোক নির্গত হয় না। তাহলে আমরা কৃষ্ণগহ্বর খুঁজে বার করার আশা করব কি করে? ব্যাপারটি প্রায় কয়লা গুদামে কালো বেড়াল খোঁজার মতো। সৌভাগ্যক্রমে উপায় একটি আছে। ১৭৮৩ সালের জন মিচেলের (John Michell) গবেষণাপত্র এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেছে (pioneering)। কৃষ্ণগহ্বর হলেও তারা নিকটবর্তী বস্তুগুলির উপর মহাকর্ষীয় বল প্রয়োগ করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এমন বহু তন্ত্র (system) পর্যবেক্ষণ করেছেন যেখানে একটি তারকা অন্য একটি তারকাকে প্রদক্ষিণ করে। এর কারণ পারস্পরিক মহাকর্ষীয় আকর্ষণ। এমন তন্ত্রও দেখা যায় যেখানে একটি তারকাই দৃশ্যমান। সে তারকাটি প্রদক্ষিণ করছে একটি অদৃশ্য সঙ্গীকে। সঙ্গীটি একটি কৃষ্ণগহ্বর এ রকম তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত করা যায় না। এটা এমন তারকা হতে পারে যেটা এত স্বল্পপ্রভ যে দেখা যায় না। কিন্তু এইরকম কিছু কিছু তন্ত্র শক্তিশালী এক্স-রের উৎস। সিগনাস X-১ (Cygnus X-1, চিত্র–৬.২) এইরকম একটি তন্ত্র। এর সবচাইতে ভাল ব্যাখ্যা হল: দৃশ্যমান তারকাটির উপরের স্তর থেকে পদার্থ উড়ে বেরিয়ে গিয়েছে (blown off)। অদৃশ্য সঙ্গীর দিকে পতনের সময় দৃশ্যমান তারকাটিতে একটি সর্পিল গতি (spiral motion) সৃষ্টি হয় (স্নানের টব থেকে জল বেরিয়ে যাওয়ার সময় যে রকম হয়, অনেকটা সেইরকম) এবং অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে তা থেকে এক্স-রে নির্গত হতে থাকে (চিত্র-৬.৩)। এই প্রক্রিয়া হতে হলে অদৃশ্য বস্তুটিকে শ্বেত বামন (white dwarf) নিউট্রন তারকা কিম্বা কৃষ্ণগহ্বরের মতো অত্যন্ত ক্ষুদ্র হতে হবে। দৃশ্যমান তারকাটির কক্ষ পর্যবেক্ষণ করে অদৃশ্য বস্তুটির সম্ভাব্য সর্বনিম্ন ভর নির্ধারণ করা যায়। সিগনাস এক্স–১-এর ক্ষেত্রে এই ভর সূর্যের ভরের ছয়গুণ। চন্দ্রশেখরের গবেষণাফল অনুসারে অদৃশ্য বস্তুটির শ্বেত বামন হওয়ার পক্ষে এই ভর অত্যধিক (too great)। নিউট্রন তারকা হওয়ার পক্ষেও এই ভর অত্যধিক (too large)। সুতরাং মনে হয় অবশ্যই এটা কৃষ্ণগহ্বর।

কৃষ্ণগহ্বর ছাড়াও সিগনাস এক্স-১ ব্যাখ্যা করার মতো অন্যান্য প্রতিরূপ আছে কিন্তু সেগুলির সবকটিই কষ্টকল্পিত। কৃষ্ণগহ্বরই মনে হয় এই সমস্ত পর্যবেক্ষণের সত্যিকারের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা। এ সত্ত্বেও ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিট্যুট অব টেকনোলজির কিপ থর্নের (Kip Thorne) সঙ্গে আমার একটি বাজি আছে। বাজির বিষয় : আসলে সিগনাস এক্স-১-এ কোনো কৃষ্ণগহ্বর নেই। বাজিটা আমার কাছে একটি ইনস্যুরেন্স পলিসির মতো। কৃষ্ণগহ্বরের উপর আমি অনেক গবেষণা করেছি। যদি দেখা যায় কৃষ্ণগহ্বর বলে কিছু নেই তাহলে আমার সমস্ত গবেষণাকর্মই নিষ্ফল হবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমার সান্ত্বনা হবে বাজি জেতা। বাজি জিতলে আমি চার বছর প্রাইভেট আই (Private Eye) পত্রিকাটি পাব। আর যদি কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব থাকে তাহলে কিপ এক বছর পেন্টহাউস ((Penthouse) পত্রিকা পাবে। ১৯৭৫ সালে যখন আমরা বাজি ধরেছিলাম তখন আমরা প্রায় শতকরা আশিভাগ নিশ্চিত ছিলাম যে সিগনাস

একটি কৃষ্ণগহ্বর। এখন আমরা প্রায় শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ নিশ্চিত কিন্তু বাকিটার নিষ্পত্তি হওয়া এখনও বাকি।

আমাদের নীহারিকার সিগনাস এক্স-১ এর মতো একাধিক তন্ত্রে এবং আমাদের প্রতিবেশী ম্যেগালেনিক ক্লাউড (Magellanic Clouds) নামক দুটি নীহারিকাতে কয়েকটি কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্বের সাক্ষ্য আমরা পেয়েছি। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরের সংখ্যা নিশ্চয়ই অনেক বেশী। মহাবিশ্বের দীর্ঘ ইতিহাসে বহু তারকা নিশ্চয়ই তাদের পারমাণবিক জ্বালানী পুড়িয়ে শেষ করেছে এবং চুপ্‌সে যেতে বাধ্য হয়েছে। কৃষ্ণগহ্বরের সংখ্যা দৃশ্যমান তারকার চাইতে বেশীও হতে পারে। শুধুমাত্র আমাদের নীহারিকাতেই দৃশ্যমান তারকার সংখ্যা প্রায় দশ হাজার কোটি। এই বিরাট সংখ্যক কৃষ্ণগহ্বরজাত অতিরিক্ত মহাকর্ষীয় আকর্ষণ আমাদের নীহারিকার বাস্তব ঘূর্ণনের হার ব্যাখ্যা করতে পারে। দৃশ্যমান তারকার ভর এ ব্যাখ্যার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। আমাদের নীহারিকার কেন্দ্রে এর চাইতে অনেক বেশী বড় একটি কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্বের কিছু সাক্ষ্য আমাদের আছে। সেই কৃষ্ণগহ্বরের ভর আমাদের সূর্যের ভরের চাইতে প্রায় এক লক্ষ গুণ বেশী। কোনো তারকা কৃষ্ণগহ্বরের খুব কাছাকাছি এলে তার নিকটতর এবং দূরতর অংশে মহাকর্ষীয় আকর্ষণের পার্থক্যের জন্য তারকাটি ছিন্ন হয়ে যাবে। তাদের অবশিষ্টাংশ এবং অন্যান্য তারকা থেকে যে সমস্ত বায়বীয় পদার্থ নির্গত হয়েছে সবই গিয়ে পড়বে ঐ কৃষ্ণগহ্বরের দিকে। সিগনাস এক্স-১ এর ক্ষেত্রের মতো এ ক্ষেত্রেও বায়বীয় পদার্থগুলি সর্পিল গতিতে ভিতরে ঢুকবে আর উত্তপ্ত হবে। তবে সে ক্ষেত্রে যতটা উত্তপ্ত হয়েছিল ততটা নয়। এটা এক্স-রে নির্গত হওয়ার মতো উত্তপ্ত হবে না। কিন্তু আমাদের নীহারিকার কেন্দ্রে অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট বেতার তরঙ্গ এবং অবলোহিত রশ্মির উৎসের ব্যাখ্যা এর ভিত্তিতে দেওয়া যেতে পারে।

মনে হয় কোয়াসারগুলির কেন্দ্রে এইরকম কিন্তু এর চাইতেও বড় কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে। সেগুলির ভর আমাদের সূর্যের ভরের চাইতে প্রায় দশ কোটি গুণ বেশী। এই বস্তুগুলি থেকে যে বিশাল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় তার উৎসের একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে ঐ বিশাল ভরসম্পন্ন কৃষ্ণগহ্বরের ভিতর পতনশীল পদার্থ। কৃষ্ণগহ্বরের ভিতর পদার্থের সর্পিল গতি (spiral) কৃষ্ণগহ্বরটিকেও একই অভিমুখে ঘূর্ণায়মান করে, ফলে অনেকটা পৃথিবীরই মতো চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। ভিতরে পতনশীল পদার্থ কৃষ্ণগহ্বরের নিকটে অতি উচ্চশক্তি সম্পন্ন কণিকা সৃষ্টি করবে। এর চৌম্বক ক্ষেত্র এত শক্তিশালী হবে যে এই কণিকাগুলিকে কেন্দ্রীভূত করে কৃষ্ণগহ্বরের ঘূর্ণনের অক্ষ বরাবর ফোয়ারার মতো নিক্ষেপ করতে পারবে। অর্থাৎ নিক্ষেপ করবে কৃষ্ণগহ্বরের উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু অভিমুখে। কয়েকটি নীহারিকা এবং কোয়াসারে সত্যিই এরকম ফোয়ারা (jets) দেখা যায়।

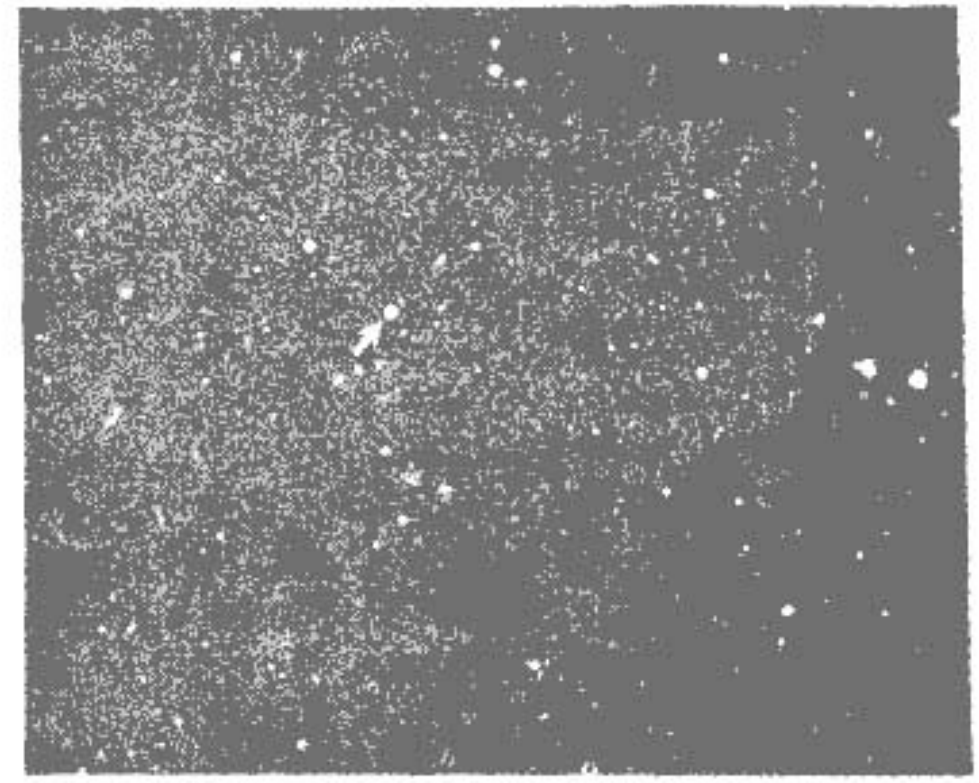

চিত্র - ৬.২

আলোকচিত্রের কেন্দ্রে দুটি উজ্জ্বলতর তারকা Signus X-1, মনে হয় এতে রয়েছে একটি কৃষ্ণগহ্বর এবং একটি স্বাভাবিক তারকা, এরা পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করছে।

সূর্যের চাইতে অনেক কম ভরসম্পন্ন কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা বিচার করা যেতে পারে। মহাকর্ষের দরুন চুপ্‌সে যাওয়ার (gravitational collapse) ফলে এরকম কৃষ্ণগহ্বর গঠিত হতে পারে না। কারণ এগুলির ভর চন্দ্রশেখর ভর সীমার চাইতে কম। স্বল্প ভরসম্পন্ন এই কৃষ্ণগহ্বরগুলির নিজস্ব পারমাণবিক জ্বালানী ফুরিয়ে গেলেও তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে। শুধুমাত্র অত্যন্ত বৃহৎ বহিরাগত চাপের ফলে পদার্থ বিরাট ঘনত্ব সম্পন্ন হলেই স্বল্প ভরসম্পন্ন কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। অতিবৃহৎ হাইড্রোজেন বোমাতেও এরকম অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। পদার্থবিদ্যাবিদ জন হুইলার (John Wheeler) একবার হিসাব করে বলেছিলেন পৃথিবীর সমস্ত সাগরের সবটা ভারী জল দিয়ে যদি একটি হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করা যায় তাহলে তার কেন্দ্রে একটি কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি হওয়ার মতো চাপ সৃষ্টি হতে পারে। (অবশ্য সেটা পর্যবেক্ষণ করার মতো কোনো লোক অবশিষ্ট থাকবে না!) আরো একটি বাস্তব সম্ভাবনা হল, মহাবিশ্বের অতি আদিম অবস্থার প্রচণ্ড চাপ ও তাপে এই রকম স্বল্প ভরসম্পন্ন কৃষ্ণগহ্বর গঠিত হয়ে থাকতে পারে। আদিম মহাবিশ্ব যদি নিখুঁত মসৃণ না থেকে থাকে একমাত্র তাহলেই কৃষ্ণগহ্বর গঠিত হওয়ার সম্ভাবনার অস্তিত্ব সম্ভব। তার কারণ

শুধুমাত্র এমন একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল যদি থাকে, যেখানকার ঘনত্ব গড় ঘনত্বের চাইতে বেশী

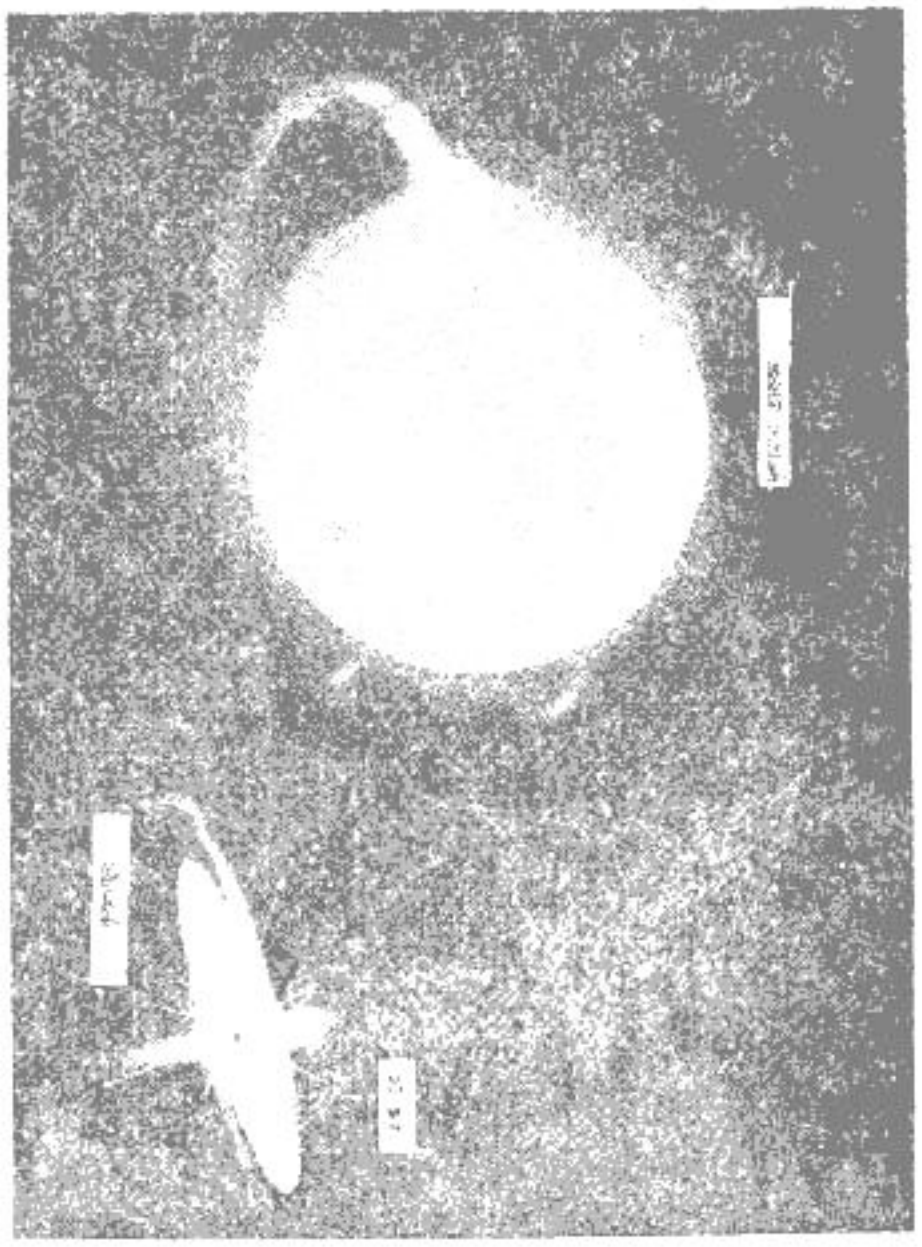

চিত্র - ৬.৩

তাহলে চাপের ফলে সেখানে কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু আমরা জানি কিছু অসমাঙ্গতা ছিল, তাছাড়া বর্তমান যুগেও তারকা এবং নীহারিকা রূপে জমে না গিয়ে মহাবিশ্বের পদার্থ নিখুঁত সমরূপে বণ্টিত থাকত।

তারক এবং নীহারিকা গঠনের জন্য যে পরিমাণ অসমাঙ্গতা (irregularity) প্রয়োজন তার ফলে লক্ষণীয় সংখ্যায় "আদিম (primordial)" কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি হতে পারত কিনা সেটা স্পষ্টতই নির্ভর করবে আদিম মহাবিশ্বের অবস্থার খুঁটিনাটির উপর। সুতরাং বর্তমানে কতগুলি

আদিম কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে সেটা যদি নির্ধারণ করতে পারি তাহলে আমরা মহাকাশের প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারব। শুধুমাত্র অন্য দৃশ্যমান পদার্থের উপর এবং মহাবিশ্বে সম্প্রসারণের উপর মহাকর্ষীয় প্রভাবের সাহায্যে একশ' কোটি টনের (একটি বড় পাহাড়ের ভরের সমান) বেশী ওজনের আদিম কৃষ্ণগহ্বরের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। যাই হোক, পরের অধ্যায়ে আমরা দেখব কৃষ্ণগহ্বরগুলি সত্যিই কৃষ্ণ নয়। তারা উত্তপ্ত বস্তুপিণ্ডের মতো তাপদীপ্ত হয়। এগুলি যত ছোট হয় দীপ্তিও এদের তত বেশী হয়। সুতরাং তথ্যটা স্ববিরোধী হলেও ক্ষুদ্রতর কৃষ্ণগহ্বরগুলির সন্ধান পাওয়া হয়তো সহজতর হবে।

৭

banglainternet

কৃষ্ণগহ্বর অত কালো নয়

(Black Holes Ain't So Black)

১৯৭০ সালের আগে আমার ব্যাপক অপেক্ষবাদ সম্পর্কীয় গবেষণার প্রধান বিষয়গুলি ছিল বৃহৎ বিস্ফোরণের অনন্যতা (big bang singularity) ঘটেছিল কিনা সেই প্রশ্ন নিয়ে। কিন্তু সেই বছর নভেম্বরে আমার মেয়ে লুসির জন্মের অল্পদিন পর এক বিকেলবেলা শুতে যাবার সময় আমি কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কে ভাবতে শুরু করি। অসুস্থতার দরুন আমার শুতে যেতে সময় লাগে সুতরাং আমি প্রচুর সময় পেয়েছিলাম। সেই সময় স্থান-কালের কোন কোন বিন্দু কৃষ্ণগহ্বরের বাইরে এবং কোনগুলি ভিতরে এ সম্পর্কে কোনো সঠিক সংজ্ঞা ছিল না। কৃষ্ণগহ্বর এমন এক কেতা ঘটনা (set of events) যেখান থেকে বেশী দূরে পলায়ন সম্ভব নয়— কৃষ্ণগহ্বরের এই রকম একটি সংজ্ঞার ধারণা নিয়ে এর আগেই আমি রজার পেনরোজের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। বর্তমানে এই সংজ্ঞাই সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ হল কৃষ্ণগহ্বরের সীমানা অর্থাৎ ঘটনা দিগন্ত (event horizon) গঠিত হয় সেই সমস্ত আলোকরশ্মির পথরেখা নিয়ে যে রশ্মিগুলি কৃষ্ণগহ্বর থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পারেনি। সেগুলি অনন্তকাল ধরে সীমানায় ঘোরাফেরা করে (চিত্র — ৭.১)। ব্যাপারটা অনেকটা পুলিশের হাত থেকে পালানোর চেষ্টার মতো, লোকটি পুলিশের হাত থেকে এক পা এগিয়ে আছে কিন্তু একেবারে পালিয়ে যেতে পারছে না।

হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম এই আলোকরশ্মিগুলির পথ কখনোই পরস্পরের অভিমুখে যেতে পারে না। যদি যায় তাহলে শেষ পর্যন্ত একটি অপরটির গায়ে গিয়ে পড়বে। এটা অনেকটা এমন লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া যে পুলিশের কাছ থেকে পালাচ্ছে কিন্তু বিপরীত অভিমুখে— তোমরা দুজনেই ধরা পড়বে! (কিম্বা এক্ষেত্রে কৃষ্ণগহ্বরে পতিত হওয়া)। কিন্তু

এই আলোকরশ্মিগুলিকে যদি কৃষ্ণগহ্বর গ্রাস করত তাহলে তারা কখনোই কৃষ্ণগহ্বরের সীমানায় যেতে পারত না। সুতরাং ঘটনা দিগন্তে আলোকরশ্মির গতিপথ হতে হোত সব সময়ই

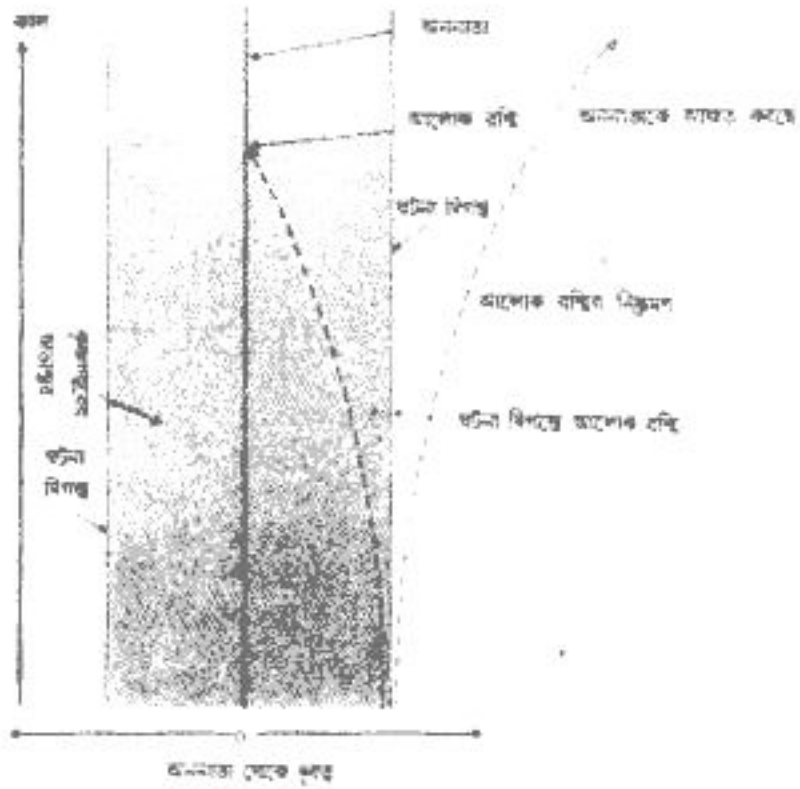

চিত্র– ৭.১

হয় সমান্তরাল, নয়তো পরস্পর থেকে দূরগামী। অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখা যায়, সেটা হল: ঘটনা দিগন্ত অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরের সীমানা অনেকটা ছায়ার কিনারার মতো–ছায়াটি আসন্ন মৃত্যুর। সূর্যের মতো বহুদূরে অবস্থিত একটি উৎসের আলোকে যে ছায়া পড়ে তার দিকে তাকালে আপনি দেখতে পাবেন কিনারার আলোকরশ্মিগুলি পরস্পর অভিমুখগামী নয়।

ঘটনা দিগন্ত থেকে নির্গত আলোকরশ্মিগুলি অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বরের সীমানা যদি কখনোই পরস্পর অভিমুখী না হয় তাহলে ঘটনা দিগন্তের ক্ষেত্রের আয়তন (area) হয় একই থাকবে নয়তো কালের সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে কিন্তু কখনোই হ্রাস পাবে না। কারণ হ্রাস পাবার অর্থ: সীমানার কিছু আলোকরশ্মিকে অন্তত পরস্পরের অভিমুখগামী হতে হবে। আসলে যখনই পদার্থ কিম্বা বিকিরণ কৃষ্ণগহ্বরে পতিত হবে তখনই তার ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পাবে (চিত্র– ৭.২), কিম্বা যদি দুটি কৃষ্ণগহ্বর পরস্পর সংঘর্ষের পর মিলিত হয়ে একটি কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হয় তাহলে অন্তিম কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্তের ক্ষেত্রের আয়তন প্রথমের দুটি কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্তের আয়তনের যোগফলের সমান হবে কিম্বা তার চাইতে বেশী হবে (চিত্র–৭.৩)। ঘটনা দিগন্তের ক্ষেত্রের আয়তনের হ্রাসপ্রাপ্তি না হওয়া ধর্মটি কৃষ্ণগহ্বরের সম্ভাব্য আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ গণ্ডী বেঁধে দিল (important restriction)। এই আবিষ্কারে আমি এমনই

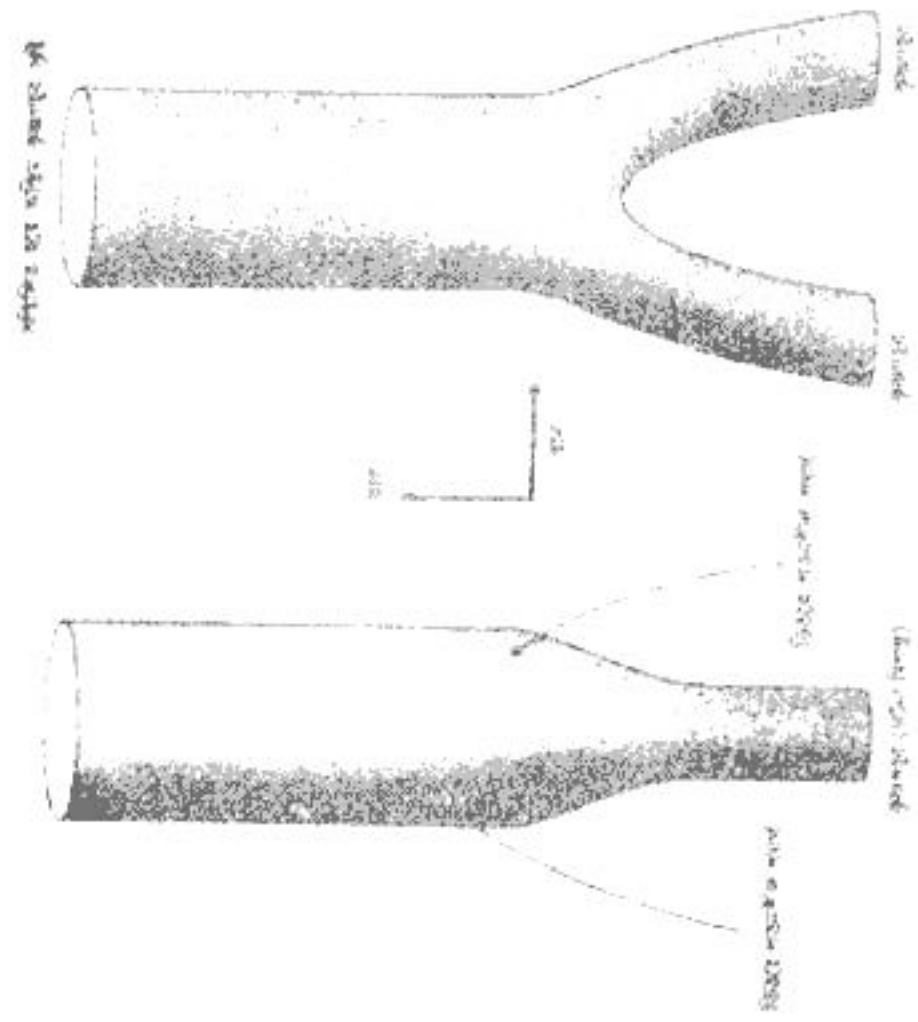

চিত্র– ৭.২ এবং চিত্র– ৭.৩

উত্তেজিত হয়েছিলাম যে সে রাতে আমার ঘুম খুব বেশী হয়নি। পরের দিন আমি বন্ধুবর পেনরোজকে টেলিফোন করি। তিনি আমার সঙ্গে একমত হন। আমার মনে হয় আসলে ক্ষেত্রের (area) এই ধর্ম তাঁর আগে থেকেই জানা ছিল। কিন্তু তিনি কৃষ্ণগহ্বরের সীমানা পৃথক একটি সংজ্ঞা ব্যবহার করছিলেন। তিনি বুঝতে পারেন নি যে দুটি সংজ্ঞা অনুসারেই কৃষ্ণগহ্বরের সীমানা অভিন্ন হবে। সুতরাং তার ক্ষেত্রফলও হবে অভিন্ন— অবশ্য কৃষ্ণগহ্বরটি যদি এমন অবস্থায় স্থিতিলাভ করে যে কালের সঙ্গে সে আর পরিবর্তিত হচ্ছে না।

কৃষ্ণগহ্বরের আয়তনের হ্রাস প্রাপ্তি না হওয়া এনট্রপি (entropy) নামক একটি ভৌতরাশিকে বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয়। এনট্রপি একটি তন্ত্রের (system) বিশৃঙ্খলার মাপ। সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় কোনো জিনিষকে নিজের উপর ছেড়ে দিলে তার ভিতরে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধির প্রবণতা বাড়ে। (বাড়ীর মেরামত বন্ধ করে দিলেই সেটা বোঝা যায়) আমরা বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারি (উদাহরণ: বাড়ীটা রঙ করা যেতে পারে) কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন চেষ্টা করা কিম্বা শক্তি ব্যয় করা। ফলে প্রাপ্তব্য সুশৃঙ্খল শক্তির পরিমাণ হ্রাস পায়।

এ চিন্তনের যথাযথ বিবরণের নাম তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় বিধি (second law of thermodynamics)। এই বিধি অনুসারে একটি বিচ্ছিন্নতন্ত্রের এনট্রপি সর্বদা বৃদ্ধি পায়। যখন দুটি তন্ত্র সংযুক্ত হয় তখন সংযুক্ত তন্ত্রের এনট্রপি একক দুটি তন্ত্রের এনট্রপির যোগফলের চাইতে বেশী। উদাহরণ: একটি বাক্সের ভিতরকার বায়বীয়পদার্থ-অণুতন্ত্রের (system of gas molecules) কথা বিচার করুন। অণুগুলিকে ছোট ছোট বিলিয়ার্ড বলের মতো ভাবা যেতে পারে। সেগুলির অবিচ্ছিন্নভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছে এবং বাক্সের দেওয়ালে ঠোক্কর খেয়ে তারা ফিরে আসছে। বায়বীয় পদার্থের তাপমাত্রা যত বাড়বে, অণুগুলিও তত দ্রুত চলমান হবে। বাক্সের দেওয়ালের সঙ্গে সংঘর্ষও হবে কঠিনতর এবং তত বেশী ঘন ঘন আর দেওয়ালের উপর তাদের প্রদত্ত বহির্মুখী চাপও বৃদ্ধি পাবে। অনুমান করা যাক শুরুতে সবকটা অণুই বাক্সের বাঁদিকে আবদ্ধ রয়েছে এবং সে দিকটা একটি পার্টিশন (partition— বিভাজক দেওয়াল) দিয়ে পৃথক করা। পার্টিশনটা সরিয়ে নিলে অণুগুলি ছড়িয়ে পড়তে চাইবে এবং বাক্সের দুটি অংশই দখল করে নেবে। কোনো এক পরবর্তী সময়ে আপতনের ফলে (by chance) সবকটি অণুই ডানদিকের অর্ধাংশে থাকতে পারে কিম্বা বাম দিকের অর্ধাংশে ফিরে যেতে পারে কিন্তু সর্বাধিক সম্ভাবনা দুটি দিকেই মোটামুটি একই সংখ্যক অণু থাকবে। প্রাথমিক অবস্থায় যখন সমস্ত অণুই বাম দিকে ছিল তার তুলনায় এই ধরনের অবস্থায় শৃঙ্খলা কম— অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা বেশী। সুতরাং বলা হয় বায়বীয় পদার্থের এনট্রপি বেড়েছে। অনুরূপভাবে অনুমান করা যাক: শুরু করা হয়েছে দুটি বাক্স নিয়ে— একটিতে রয়েছে অক্সিজেন অণু, অন্যটিতে নাইট্রোজেন অণু। দুটি বাক্স জুড়ে যদি মাঝখানের দেওয়ালটি সরিয়ে নেওয়া যায় তাহলে অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন অণু মিশতে শুরু করবে। পরবর্তীকালে যে অবস্থার সম্ভাবনা সব চাইতে বেশী সেই অবস্থায় দুটি বাক্সের সর্বত্রই অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন অণুগুলি প্রায় সমানভাবে মিশ্রিত থাকবে। এই অবস্থায় প্রথমাবস্থার দুটি বাক্সের তুলনায় শৃঙ্খলা থাকবে কম, সুতরাং এনট্রপি থাকবে বেশী।

নিউটনের মহাকর্ষীয় বিধির মতো বিজ্ঞানের অন্যান্য বিধির তুলনায় তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় বিধির স্থান একটু অন্যরকম। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় বিধি বিরাট সংখ্যাগুরু ক্ষেত্রে সত্য— কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সত্য নয়। প্রথম বাক্সটির সমস্ত বায়বীয় পদার্থের অণু পরবর্তীকালে অর্ধেক বাক্সে পাওয়ার সম্ভাবনা বহু কোটি বারের ভিতর একবার। তবে এরকম ঘটনা ঘটা সম্ভব। কিন্তু কাছাকাছি একটি কৃষ্ণগহ্বর থাকলে দ্বিতীয় বিধি অমান্য করার একটি সহজতর পথ আছে বলে মনে হয়। বায়বীয় পদার্থের বাক্সে যেরকম ছিল সেইরকম প্রচুর এনট্রপিসম্পন্ন খানিকটা পদার্থ কৃষ্ণগহ্বরে ফেলে দিন। কৃষ্ণগহ্বরের বাইরে অবস্থিত পদার্থের মোট এনট্রপি হ্রাস পাবে। তবুও অবশ্য বলা যেতে পারে কৃষ্ণগহ্বরের অভ্যন্তরের এনট্রপি সমেত মোট এনট্রপি হ্রাস পায়নি। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরের ভিতরটা দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, সেইজন্য অভ্যন্তরস্থ পদার্থে কতটা এনট্রপি আছে সেটা আমরা বুঝতে পারব না। খুব ভাল হত যদি কৃষ্ণগহ্বরের এমন কোনো অবয়ব থাকত যার সাহায্যে কৃষ্ণগহ্বরের বাইরের পর্যবেক্ষক কৃষ্ণগহ্বরের এনট্রপি বলতে পারত এবং যখনই পদার্থ এনট্রপি বহন করে কৃষ্ণগহ্বরে পড়ত, ঐ অবয়বও তখন বাড়ত। যখনই কৃষ্ণগহ্বরের ভিতর পদার্থ পতিত হয় তখনই ঘটনা দিগন্তের ক্ষেত্রফল (area) বৃদ্ধি পায়—উপরে লিখিত এই আবিষ্কারের পর জেকব বেকেনস্টাইন (Jacob Bekenstein) নামে প্রিন্সটনের একজন গবেষণাকারী ছাত্র প্রস্তাবনা করেন, ঘটনা দিগন্তের ক্ষেত্রফল কৃষ্ণগহ্বরের এনট্রপির একটি মাপ। এনট্রপি বহনকারী পদার্থ যেমন যেমন কৃষ্ণগহ্বরে পতিত হয়, ঘটনা দিগন্তের ক্ষেত্রফলও তেমন বৃদ্ধি পায়। সুতরাং কৃষ্ণগহ্বরের বাইরের পদার্থ এবং ঘটনাদিগন্তের ক্ষেত্রফলের যোগফল কখনোই হ্রাস পায় না।

মনে হয়েছিল এই প্রস্তাবনা (suggestion) অধিকাংশ পরিস্থিতিতেই তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় বিধি লঙ্ঘন করাকে বাধা দেবে। কিন্তু একটি মারাত্মক দোষ থেকে গিয়েছিল। কৃষ্ণগহ্বরের যদি এনট্রপি থাকে তাহলে তার উষ্ণতাও থাকা উচিত। কিন্তু যে কোনো বস্তু একটি বিশেষ তাপমাত্রায় একটি বিশেষ হারে বিকিরণ করবে। সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় আগুনে একটি লৌহদণ্ড গরম করলে লৌহদণ্ডটি লাল হয় এবং তা থেকে বিকিরণ নির্গত হতে থাকে। কিন্তু উষ্ণতা কম হলেও বস্তুপিণ্ড থেকে বিকিরণ হয়। সাধারণ অবস্থায় সেটা নজরে পড়ে না কারণ পরিমাণটা খুবই কম। দ্বিতীয় বিধি ভঙ্গ করা বন্ধ করার জন্যই এই বিকিরণ প্রয়োজন। সুতরাং কৃষ্ণগহ্বর থেকে বিকিরণ নির্গত হওয়া উচিত কিন্তু সংজ্ঞা অনুসারে কৃষ্ণগহ্বরগুলি এমন বস্তু যা থেকে কোনো কিছু নির্গত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং মনে হয়েছিল একটি কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্তের ক্ষেত্রফলকে তার এনট্রপি বলে বিচার করা ঠিক নয়। ১৯৭২ সালে আমি, ব্রান্ডন কার্টার (Brandon Carter) এবং জিম্ বার্ডিন (Jim Bardeen) নামে একজন আমেরিকান সহকর্মীর সঙ্গে একটি প্রবন্ধ লিখি। সেই প্রবন্ধে আমরা দেখিয়েছিলাম এনট্রপি এবং ঘটনা দিগন্তের ক্ষেত্রফলের ভিতরে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও এই আপাতদৃষ্ট সর্বনাশা সঙ্কট (fatal difficulty) রয়েছে। এ কথাটা আমার স্বীকার করা অবশ্যই উচিৎ: এই প্রবন্ধ লেখার আংশিক কারণ ছিল বেকেনস্টাইন (Bekenstein) সম্পর্কে আমার বিরক্তি। আমার মনে হয়েছিল ঘটনা দিগন্তের ক্ষেত্রফল সম্পর্কে আমার আবিষ্কারের তিনি

অপব্যবহার করেছেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু দেখা গেল তিনি ছিলেন মূলত সঠিক তবে সঠিক এমনভাবে যা তিনি নিশ্চয়ই আশা করেন নি।

১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি মস্কো পরিদর্শনে যাই। সেই সময় আমি ইয়াকভ্ জেল্ডোভিচ্ (Yakov Zeldovich) এবং আলেকজান্ডার স্টারোবিন্স্কি (Alexander Starobinsky) নামে দুই প্রধান সোভিয়েট বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কে আলোচনা করি। তাঁরা আমাকে বোঝালেন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অনিশ্চয়তার নীতি অনুসারে ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণগহ্বরগুলি কণিকা সৃষ্টি করবে এবং বিকিরণ করবে। তাঁদের ভৌত যুক্তিভিত্তিক মত আমি মেনে নিয়েছিলাম কিন্তু তাঁদের বিকিরণ গণনার গাণিতিক পদ্ধতি আমার পছন্দ হয়নি। সুতরাং আমি একটি উন্নততর গাণিতিক পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু করলাম। ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে অক্সফোর্ডে একটি বেসরকারী সেমিনারে (শিক্ষাকেন্দ্রে আলোচনা সভা– seminar) আমি সেই পদ্ধতির বিবরণ দান করি। সে সময় কতটা বিকিরণ হবে সেটা আমি গণনা করে নির্ধারণ করিনি। আমার আশা ছিল জেল্ডোভিচ্ এবং স্টারোবিন্স্কির পূর্বাভাস অনুসারে ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণগহ্বর থেকে যে বিকিরণ হয় শুধুমাত্র সেটাই আবিষ্কার করা। কিন্তু গণনার পর আমি বিরক্তি আর বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম এমনকি অঘূর্ণায়মান কৃষ্ণগহ্বরগুলিও আপাতদৃষ্টিতে কণিকা সৃষ্টি করতে পারে এবং স্থির হারে বিকিরণ করতে পারে। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম এই বিকিরণের নির্দেশ হল আমার ব্যবহৃত একটি আসন্নতা (approximation) সিদ্ধ নয় (not valid)। আমার ভয় ছিল বেকেনস্টাইন ব্যাপারটা জানলে এটাকেই কৃষ্ণগহ্বরের এনট্রপি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার সপক্ষে যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করবেন, এ ব্যাপারটি আমার তখনও পছন্দ ছিল না। কিন্তু আমি যতই ভেবেছি ততই আমার মনে হয়েছে আসন্নতাগুলি প্রকৃতই সিদ্ধ হওয়া উচিত (ought to hold)। নির্গত কণিকাগুলির বর্ণালী একটি উত্তপ্ত বস্তুপিণ্ডের যে বর্ণালী হওয়া উচিত তার সঙ্গে অভিন্ন এবং কৃষ্ণগহ্বর থেকে কণিকা নির্গমনের হার এমন যে সে হার নির্ভুলভাবে দ্বিতীয় বিধি ভঙ্গ হওয়া প্রতিরোধ করে। নির্গমন যে বাস্তব সে সম্পর্কে উপরোক্ত তথ্যগুলিই শেষ পর্যন্ত আমার বিশ্বাস উৎপাদন করে। তারপর থেকে অন্য অনেকে নানাভাবে এই গণনার পুনরুক্তি (repeated) করেছেন। উষ্ণতা (temperature) যুক্ত একটি উত্তপ্ত বস্তুপিণ্ডেরই মতো কৃষ্ণগহ্বর থেকে কণিকা নির্গত হওয়া উচিৎ এবং সেটা থেকে বিকিরণও হওয়া উচিৎ। এই তাপমাত্রা (temperature) নির্ভর করবে শুধুমাত্র কৃষ্ণগহ্বরটির ভরের উপর : ভর যত বেশী হবে তাপমাত্রা হবে তত কম। উপরে উল্লিখিত প্রতিটি গণনাতেই এই তথ্য সমর্থিত হয়েছে।

আমরা জানি কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্ত থেকে কোনো কিছুই নির্গত হতে পারে না, তাহলে কৃষ্ণগহ্বর থেকে কণিকা নির্গত হওয়া কি করে সম্ভব? উত্তরটি দিচ্ছে কোয়ান্টাম তত্ত্ব : কণিকাগুলি কৃষ্ণগহ্বরের ভিতর থেকে আসে না, আসে কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্তের ঠিক বাইরে "শূন্য" (empty) স্থান থেকে। এটা আমরা বুঝতে পারি নিম্নলিখিত উপায়ে : আমরা যাকে শূন্য স্থান বলে ভাবি সেটা সম্পূর্ণ শূন্য হতে পারে না, কারণ তা যদি হয় তাহলে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র, বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের মতো সমস্ত ক্ষেত্রকেই নির্ভুলভাবে শূন্য

হতে হবে। কিন্তু একটি ক্ষেত্রের মান (value) এবং কালের সঙ্গে তার পরিবর্তনের হার প্রায় একটি কণিকার অবস্থান এবং গতিবেগের মতো : অনিশ্চয়তার নীতির (uncertainty principle) নিহিতার্থ অনুসারে এই সমস্ত রাশিগুলির একটিকে যত নিখুঁতভাবে জানা যায় অপরটি সম্পর্কে জ্ঞান ততই কম নিখুঁত হয়। সুতরাং শূন্যস্থানে ক্ষেত্রকে ঠিক নিখুঁতভাবে শূন্য বলে স্থির করা যায় না। কারণ, তাহলে এর একটি নিখুঁত মান (শূন্য) এবং পরিবর্তনের নিখুঁত হার (এ ক্ষেত্রেও শূন্য) এই দুটিই থেকে যাবে। ক্ষেত্রের (field) মানের (value) একটি সর্বনিম্ন পরিমাণ অনিশ্চয়তা অর্থাৎ কোয়ান্টাম হ্রাসবৃদ্ধি (quantum fluctuation) থাকতেই হবে। এই হ্রাসবৃদ্ধিকে মহাকর্ষ কণিকা কিম্বা আলোক কণিকার জোড় হিসাবে ভাবা যেতে পারে–এরা কোনো সময়ে একসঙ্গে দেখা দেয়, আলাদা হয়ে যায়, আবার একত্র হয় এবং পরস্পরকে বিনাশ করে। সূর্যের মহাকর্ষীয় বল যারা বহন করে এগুলিও সেগুলির মতো কল্পিত (virtual) কণিকা। বাস্তব কণিকাগুলিকে যেরকম কণিকা অভিজ্ঞাপক যন্ত্র (particle detector) দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়, এগুলিকে সেরকম পর্যবেক্ষণ করা যায় না। পরমাণুর ভিতরকার ইলেক্ট্রনের কক্ষের পরিবর্তনে শক্তির যে সামান্য পরিবর্তন হয় তাই দিয়ে কিন্তু এগুলির পরোক্ষ চিহ্ন মাপা যায় এবং এর সঙ্গে তাত্ত্বিক ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মিল রয়েছে। অনিশ্চয়তার নীতির আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী হল : পদার্থ কণিকার সমরূপ কল্পিত (virtual pair) জোড় আরো দেখা যাবে, যেমন ইলেক্ট্রন কিম্বা কার্কের (quark) জোড়। এক্ষেত্রে কিন্তু জোড়ের একটি হবে কণিকা এবং অপরটি হবে বিপরীত কণিকা (আলোক এবং মহাকর্ষের বিপরীত কণিকা এবং কণিকা অভিন্ন)।

যেহেতু শূন্যতা থেকে শক্তি সৃষ্টি হতে পারে না সেইজন্য কণিকা/বিপরীত কণিকার জোড়ের একটি অংশীদারের থাকবে পরা (positive) শক্তি এবং অপর অংশীদারের থাকবে অপরা (negative) শক্তি। অপরা শক্তিসম্পন্ন কণিকা অভিশপ্ত স্বল্পায়ু কল্পিত কণিকা, কারণ বাস্তব কণিকাগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় সব সময় পরা শক্তিসম্পন্ন হয়। একে সেইজন্য অবশ্যই নিজের অংশীদার খুঁজে বার করে তার সঙ্গে বিনষ্ট হতে হবে। তবে বৃহৎ ভরসম্পন্ন একটি বস্তুপিণ্ডের নিকটবর্তী কণিকার শক্তি সেই বস্তুপিণ্ড থেকে দূরবর্তী অবস্থার তুলনায় কম হবে। তার কারণ, বস্তুপিণ্ডটির মহাকর্ষীয় আকর্ষণ থেকে কণিকাটিকে দূরে নিয়ে যেতে শক্তি তখনো প্রয়োজন হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় কণিকার শক্তি হবে পরা (positive), কিন্তু একটি কৃষ্ণগহ্বরের ভিতরকার মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এত বেশী শক্তিশালী যে, সেখানে বাস্তব কণিকাগুলিরও অপরা শক্তি (negative) থাকতে পারে। কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব থাকলে অপরা শক্তিসম্পন্ন কল্পিত কণিকার কৃষ্ণগহ্বরে পতিত হয়ে বাস্তব কণিকা কিম্বা বিপরীত কণিকায় পরিণত হওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে তাকে আর অংশীদারের সঙ্গে বিনষ্ট হতে হবে না। এর পরিত্যক্ত অংশীদারও কৃষ্ণগহ্বরে পতিত হতে পারে। কিম্বা পরাশক্তি থাকার ফলে বাস্তব কণিকা কিম্বা বিপরীত কণিকারূপে কৃষ্ণগহ্বরের নিকট থেকে অপসরণ করতে পারে (চিত্র–৭.৪)। দূরস্থিত একজন পর্যবেক্ষকের মনে হবে এগুলি কৃষ্ণগহ্বর থেকে নির্গত হয়েছে। কৃষ্ণগহ্বরটি যত ছোট হবে, অপরা শক্তিসম্পন্ন একটি কণিকার বাস্তব কণিকায় রূপান্তরিত হওয়ার আগে তত কম দূরত্ব অতিক্রম করতে

banglainternet.com

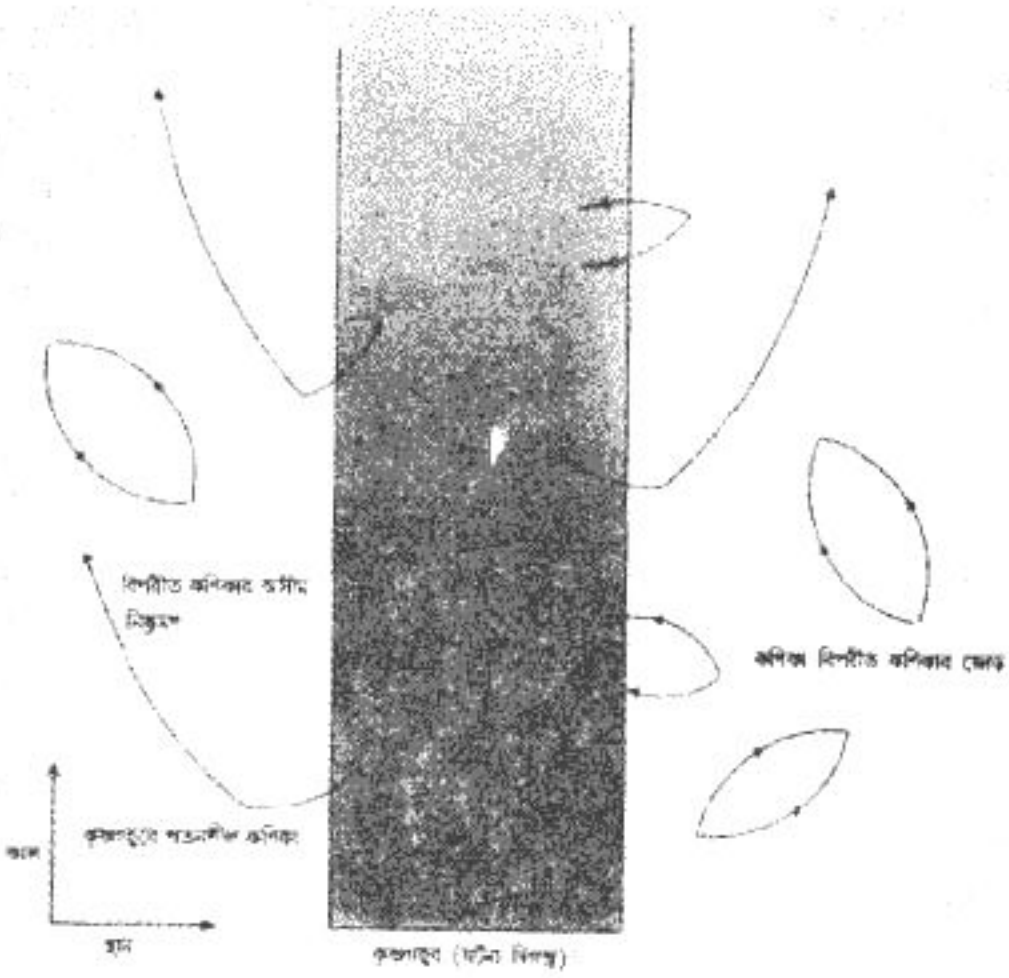

চিত্র - ৭.৪

হবে। সুতরাং নির্গত হওয়ার হারও তত বেশী হবে এবং কৃষ্ণগহ্বরের আপাতদৃষ্ট তাপমাত্রাও তত বেশী হবে।

বহির্গামী বিকিরণের পরা শক্তির সঙ্গে সমতা রক্ষা করবে কৃষ্ণগহ্বরের অপরা শক্তিসম্পন্ন কণিকাগুলির স্রোত। আইনস্টাইনের সমীকরণ $E = mc^2$ অনুসারে (E–শক্তি, m–ভর এবং c আলোকের দ্রুতি) শক্তি ভরের আনুপাতিক (proportional), সুতরাং কৃষ্ণগহ্বরের অন্তর্গামী অপরা শক্তির স্রোত তার ভর কমিয়ে দেবে। কৃষ্ণগহ্বরের ভর কমলে তার ঘটনা দিগন্তের ক্ষেত্রফলও (area) ক্ষুদ্রতর হয়। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরের এনট্রপির এই হ্রাসপ্রাপ্তির ক্ষতিপূরণ হতে পারে নির্গত বিকিরণের এনট্রপি দ্বারা, এমন কি, তার চাইতেও বেশী হতে পারে। সুতরাং দ্বিতীয় বিধি কখনো লঙ্ঘিত হয় না।

তাছাড়া কৃষ্ণগহ্বরের ভর যত কম হয় তার তাপমাত্রা তত বেশী হয়। সুতরাং কৃষ্ণগহ্বরের ভর হ্রাস পেলে তার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে, বৃদ্ধি পাবে সেটা থেকে নির্গত হওয়ার (emission) হার–অতএব তার ভর আরও দ্রুত হ্রাস পাবে। কৃষ্ণগহ্বরের ভর যখন শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত অল্প হয়ে যায় তখন ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় সেটা খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু সবচাইতে যুক্তিসঙ্গত

অনুমান হল : অন্তিমে নির্গত হওয়ার এক বিরাট বিস্ফোরণের ফলে কৃষ্ণগহ্বরটি সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবে। এই বিস্ফোরণটি হতে পারে বহু মিলিয়ান হাইড্রোজেন বোমার সমান।

সূর্য থেকে কয়েকগুণ বেশী ভরসম্পন্ন একটি কৃষ্ণগহ্বরের তাপমাত্রা হবে চরম শূন্য (absolute zero) থেকে এক ডিগ্রীর এক কোটি ভাগের এক ভাগ বেশী। যে মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ (microwave radiation) সমগ্র মহাবিশ্বে ব্যাপ্ত তার তাপমাত্রা (চরম শূন্য থেকে প্রায় ২.৭ ডিগ্রী বেশী) থেকে এই তাপমাত্রা অনেক কম। সুতরাং এই সমস্ত কৃষ্ণগহ্বর যা বিশোষণ করে তার তুলনায় তা থেকে নির্গত হবে (emit) অনেক কম। অনন্তকাল ধরে সম্প্রসারিত হওয়াই যদি মহাবিশ্বের নিয়তি হয় তাহলে এক সময় মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের তাপমাত্রা এই ধরনের কৃষ্ণগহ্বরের তাপমাত্রার চাইতে কমে যাবে। সুতরাং কৃষ্ণগহ্বরটি ক্রমশ ভর পরিত্যাগ করতে থাকবে। কিন্তু তবুও এর তাপমাত্রা এত কম হবে যে কৃষ্ণগহ্বরটি উবে যেতে প্রায় মিলিয়ান মিলিয়ান মিলিয়ান মিলিয়ান মিলিয়ান মিলিয়ান মিলিয়ান মিলিয়ান মিলিয়ান মিলিয়ান (একের পিঠে ছেষট্টিটি শূন্য) বৎসর লাগবে। এই কাল মহাবিশ্বের বয়সের চাইতে অনেক বেশী। মহাবিশ্বের বয়স মাত্র দশ থেকে কুড়ি হাজার মিলিয়ান বৎসর (এক কিম্বা দু-এর পিঠে দশটা শূন্য)। এদিকে আবার একাধিক আদিম কৃষ্ণগহ্বর থাকতে পারে। সেগুলির ভরও হতে পারে অনেক কম। এগুলি উৎপন্ন হওয়ার কারণ ছিল মহাবিশ্বের অতি আদিম অবস্থায় যে সমস্ত অংশের সুষম বিকাশের সঙ্গে অসঙ্গতি ছিল, সেগুলির চুপসে যাওয়া। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এই রকম কৃষ্ণগহ্বরের তাপমাত্রা অনেক বেশী হবে আর সেগুলি থেকে বিকিরণ নির্গত হওয়ার হারও হবে অনেক বেশী। আদিম একটি কৃষ্ণগহ্বরের (primordial black hole) শুরুতে যদি ভর থাকে একশ কোটি টন তাহলে তার আয়ু হবে মোটামুটি আমাদের মহাবিশ্বের আয়ুর সমান। যে সমস্ত আদিম কৃষ্ণগহ্বরের প্রাথমিক ভর এর চাইতে কম ছিল সেগুলি ইতিপূর্বে সম্পূর্ণ উবে গিয়েছে (completely evaporated), কিন্তু যেগুলির ভর এর চাইতে সামান্য বেশী ছিল সেগুলি থেকে এখনো এক্স-রে এবং গামা-রে (X-Ray & Gamma Ray) রূপে বিকিরণ নির্গত হচ্ছে। এই এক্স-রে এবং গামা-রে গুলি আলোক তরঙ্গের মতো কিন্তু সেগুলির তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেক কম। এই গহ্বরগুলির কৃষ্ণ বিশেষণের বিশেষ কোনো অর্থ নেই। এগুলি আসলে উত্তপ্ত হয়ে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে এবং এগুলি থেকে দশ হাজার মেগাওয়াট হারে শক্তি নির্গত হয়।

এইরকম একটি কৃষ্ণগহ্বর দশটি বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালাতে পারে—অবশ্য যদি তার শক্তিকে এই কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। ব্যাপারটা একটু শক্ত হবে–পর্বতপ্রমাণ একটি কৃষ্ণগহ্বর সঙ্কুচিত (compressed) হয়ে এক ইঞ্চির এক মিলিয়ান ভাগের এক মিলিয়ান ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ তার আকার হবে একটি পরমাণুর কেন্দ্রকের সমান! এরকম একটি কেন্দ্রক যদি ভূপৃষ্ঠে থাকে তাহলে সেটা পৃষ্ঠ ভেদ করে পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছে যাবে। তাকে বাধা দেওয়ার কোনো উপায় থাকবে না। এটা পৃথিবীর ভিতর দিয়ে দোলকের মতো যাতায়াত করতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর কেন্দ্রে গিয়ে স্থিতিলাভ করবে। সুতরাং এ থেকে নির্গত শক্তি ব্যবহার করা যাবে, একে স্থাপন করার সেরকম স্থান হতে পারে শুধু এটাকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে এরকম কোনো কক্ষপথে স্থাপন করলে। এটাকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ

করার মতো কক্ষপথে স্থাপন করার একমাত্র উপায় একটি বিরাট ভরসম্পন্ন বস্তুপিণ্ডকে টেনে এনে এর সামনে স্থাপন করা। ব্যাপারটা অনেকটা গাধার সামনে গাজর ঝোলার মতো। প্রস্তাবটা খুব বাস্তব বলে মনে হয় না অন্তত নিকট ভবিষ্যতে তো নিশ্চয়ই নয়।

কিন্তু যদি এই আদিম কৃষ্ণগহ্বরগুলি থেকে নির্গত শক্তিকে কাজে লাগানো সম্ভব নাও হয় তাহলে এগুলি পর্যবেক্ষণ করার সম্ভাবনা কতটা? এই আদিম কৃষ্ণগহ্বরগুলি থেকে তাদের জীবনকালের অধিকাংশ সময় যে গামা রশ্মি নির্গত হয় আমরা সেই রশ্মি দেখতে পারি। এই কৃষ্ণগহ্বরগুলি বহুদূরে অবস্থিত, সুতরাং অধিকাংশ কৃষ্ণগহ্বর থেকে বিকিরণ হবে অত্যন্ত

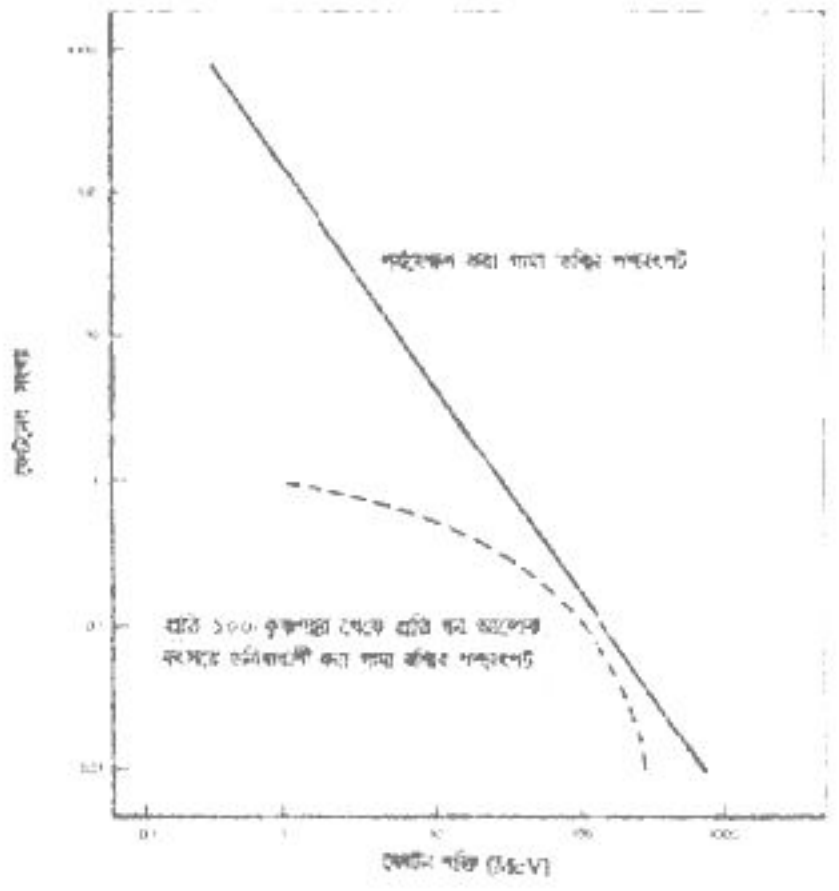

চিত্র— ৭.৫

দুর্বল। কিন্তু সবগুলি একত্র হলে হয়তো সনাক্ত করাও যেতে পারে। গামা রশ্মির এরকম একটি পশ্চাৎপট আমরা সত্যিই দেখতে পাই। চিত্র— ৭.৫ থেকে দেখা যায় পর্যবেক্ষণ করা তীব্রতার বিভিন্ন স্পন্দাঙ্কে (frequency–প্রতি সেকেণ্ডে তরঙ্গের সংখ্যা) কি রকম পার্থক্য হয়। কিন্তু এই পশ্চাৎপট আদিম কৃষ্ণগহ্বর ছাড়া অন্য কোনোভাবেও সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে— হয়তো হয়েছেও তাই। চিত্র—৭.৫-এ বিন্দুরেখা দিয়ে দেখানো হয়েছে, যদি প্রতি ঘন আলোকবৎসরে (cubic light year) গড়ে তিনশ থাকে তাহলে কিভাবে আদিম কৃষ্ণগহ্বর থেকে নির্গত গামা রশ্মির স্পন্দাঙ্ক অনুসারে তীব্রতা পরিবর্তিত হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে

গামা রশ্মির পশ্চাৎপট পর্যবেক্ষণ করে কৃষ্ণগহ্বরের সপক্ষে কোনো ইতিবাচক সাক্ষ্য (positive evidence) পাওয়া যায় না। কিন্তু তা থেকে এ সংবাদ আমরা পাই যে মহাবিশ্বের প্রতি ঘন আলোকবৎসরে এর সংখ্যা গড়ে তিনশ'-এর বেশী হতে পারে না। এই সীমার অর্থ হল: আদিম কৃষ্ণগহ্বরের ভর মহাবিশ্বের মোট পদার্থের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগের বেশী হবে না।

আদিম কৃষ্ণগহ্বরগুলি এত বিরল হওয়ার ফলে মনে হতে পারে— আমরা গামা রশ্মির একক উৎস হিসাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারি— আমাদের এত নিকটে কোনো কৃষ্ণগহ্বর পাওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু মহাকর্ষ কৃষ্ণগহ্বরগুলিকে যে কোনো পদার্থের দিকে আকর্ষণ করবে, সুতরাং নীহারিকার ভিতরে এবং তার কাছাকাছি কৃষ্ণগহ্বরগুলির অনেক বেশী সংখ্যায় থাকা উচিৎ। যদিও গামা রশ্মির পশ্চাৎপট থেকে আমরা জানতে পারি প্রতি ঘন আলোকবর্ষে গড়ে তিনশ'র বেশী কৃষ্ণগহ্বর থাকতে পারে না তবুও আমাদের নিজেদের নীহারিকায় এগুলির সংখ্যা কি রকম হতে পারে সে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারি না। তাদের সংখ্যা যদি এর চাইতে দশ লক্ষ গুণ বেশী হোত তাহলে আমাদের নিকটতম কৃষ্ণগহ্বর হয়তো প্রায় একশ' কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হোত— অর্থাৎ আমাদের জানা দূরতম গ্রহ প্লুটোর কাছাকাছি হোত। এই দূরত্বে থাকলেও একটি কৃষ্ণগহ্বর থেকে অবিচ্ছিন্ন বিকিরণ সনাক্ত করা কঠিন হোত— এমনকি সেই বিকিরণ দশ হাজার মেগাওয়াট হলেও। একটি আদিম কৃষ্ণগহ্বর পর্যবেক্ষণ করতে হলে একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের ভিতরে (ধরা যাক এক সপ্তাহ) একই অভিমুখ থেকে আগমনশীল কয়েকটি গামা রশ্মির কোয়ান্টা সনাক্ত করতে হবে। তা না হলে সেগুলি শুধুমাত্র পশ্চাৎপটের অংশমাত্র হতে পারে। কিন্তু প্লাঙ্কের (Planck) কোয়ান্টাম নীতি আমাদের বলছে প্রতিটি গামা রশ্মির কোয়ান্টাম অতিশয় উচ্চশক্তিসম্পন্ন তার কারণ গামা রশ্মিগুলির স্পন্দাঙ্ক খুবই বেশী। সুতরাং এমনকি দশহাজার মেগাওয়াট বিকিরণ করতেও খুব বেশী কোয়ান্টা প্রয়োজন হবে না। প্লুটোর দূরত্ব থেকে আগমনশীল কয়েকটি কোয়ান্টা পর্যবেক্ষণ করতে এত বড় গামা রশ্মি অভিজ্ঞাপক যন্ত্র (detector) দরকার যা এখনও তৈরী হয়নি। তাছাড়া যন্ত্রটিকে থাকতে হবে স্থানে (space), কারণ গামা রশ্মি আবহমণ্ডল (atmosphere) ভেদ করতে পারে না।

অবশ্য প্লুটোর দূরত্বের মতো নিকটবর্তী একটি কৃষ্ণগহ্বর যদি তার জীবনকালের শেষ প্রান্তে এসে বিস্ফোরিত হয় তাহলে তার অন্তিম বিকিরণ সনাক্ত করা সহজ হবে। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরটি যদি গত এক হাজার কিম্বা দু'হাজার কোটি বছর বিকিরণ করে থাকে তাহলে তার অন্তিম সময় কয়েক মিলিয়ান বছর আগে পরে না হয়ে আগামী কয়েক বছরের ভিতর হওয়ার সম্ভাবনা একটু কম! সুতরাং আপনার গবেষণার জন্য বরাদ্দ টাকা ফুরিয়ে যাওয়ার আগে এরকম একটি বিস্ফোরণ দেখবার একটি যুক্তিপূর্ণ সম্ভাবনা চাইলে প্রায় এক আলোকবর্ষ দূরত্বের ভিতরে যে কোনো বিস্ফোরণ সনাক্ত করার উপায় বার করতে হবে। তারপরেও আপনার সমস্যা থাকবে: বিস্ফোরণ থেকে নির্গত কয়েকটি গামা রশ্মি কোয়ান্টা ধরা পড়বার মতো একটি বৃহৎ গামা রশ্মি অভিজ্ঞাপক যন্ত্র। তবে এক্ষেত্রে সবকটি কোয়ান্টা যে একই অভিমুখ থেকে আসছে সেটা নির্ধারণ করার প্রয়োজন হবে না। সবকটি কোয়ান্টা অতি অল্পকালের

ব্যবধানে পৌঁছেছে– এটা পর্যবেক্ষণ করতে পারলেই মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যাবে যে ওরা সবকটি একই বিস্ফোরণ থেকে এসেছে।

আদিম কৃষ্ণগহ্বরের নির্দেশ দিতে পারে এরকম একটি অভিজ্ঞাপক যন্ত্র (detector) হল পৃথিবীর সম্পূর্ণ আবহমণ্ডল (যাই হোক না কেন, এর চাইতে বড় অভিজ্ঞাপক যন্ত্র নির্মাণের সম্ভাবনা আমাদের খুবই কম)। একটি উচ্চশক্তি সম্পন্ন গামা রশ্মি কোয়ান্টাম একটি পরমাণুকে আঘাত করলে সেটা ভেঙে জোড়ায় জোড়ায় ইলেক্ট্রন আর পজিট্রন (বিপরীত ইলেক্ট্রন) সৃষ্টি করে। এগুলি পরমাণুকে আঘাত করলে সেগুলিও আবার ইলেক্ট্রন পজিট্রনের জোড়া সৃষ্টি করে। সুতরাং পাওয়া যায় একটি ইলেক্ট্রন বর্ষণ। এর ফলে এক রকম আলোক সৃষ্টি হয় যার নাম চেরেনকভ (Cerenkov) বিকিরণ। সুতরাং রাতের আকাশে আলোর ঝলক দেখে গামা রশ্মি বিস্ফোরণের নির্দেশ পাওয়া যায়। অবশ্য অন্য কয়েকটি পরিঘটনা থেকেও আকাশে আলোর ঝলক দেখা যেতে পারে। যেমন, বিদ্যুৎ চমকানো, পড়ন্ত (tumbling) কৃত্রিম উপগ্রহে প্রতিফলিত সূর্যালোক এবং কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত কৃত্রিম উপগ্রহের ধ্বংসাবশেষ। যথেষ্ট দূরত্বে দুটি স্থানে দুই কিংবা ততোধিক আলোর ঝলক যুগপৎ পর্যবেক্ষণ করে গামা রশ্মির বিস্ফোরণ এবং উপরে উল্লিখিত অভিক্রিয়াগুলির (effects) ভিতর পার্থক্য বোঝা সম্ভব। নীল পোর্টার (Neil Porter) এবং ট্রেভর উইকস (Trevor Weekes) নামে ডাবলিনের দুই বৈজ্ঞানিক আরিজোনাতে (Arizona) টেলিস্কোপের সাহায্যে এই ধরনের অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁরা অনেকগুলি আলোর ঝলক দেখতে পেয়েছিলেন কিন্তু কোনোটিকে আদিম কৃষ্ণগহ্বর থেকে নির্গত গামা রশ্মি বিস্ফোরণের ফলে হয়েছে বলে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করতে পারেন নি।

আদিম কৃষ্ণগহ্বর অনুসন্ধানের চেষ্টা হয়তো বিফল হবে বলে মনে হয় কিন্তু তাহলেও এই প্রচেষ্টার ফলে মহাবিশ্বের আদিম অবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আমরা পাব। আদিম অবস্থায় মহাবিশ্ব যদি বিশৃঙ্খল কিংবা নিয়মহীন থাকত কিংবা যদি পদার্থের চাপ খুব কম থাকত তাহলে গামা রশ্মির পশ্চাৎপট সম্পর্কে আমাদের পর্যবেক্ষণ থেকে আদিম কৃষ্ণগহ্বরের সংখ্যার যে সীমা আগে নির্ধারণ করা হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী সংখ্যক আদিম কৃষ্ণগহ্বর উৎপাদন আশা করা যেত। শুধুমাত্র আদিম মহাবিশ্ব যদি মসৃণ ও সমরূপ হোত এবং যদি তার উচ্চচাপ থাকত, একমাত্র তাহলেই পর্যবেক্ষণযোগ্য কৃষ্ণগহ্বরের অভাব ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

• • • • •

কৃষ্ণগহ্বর থেকে বিকিরণ বিষয়ক চিন্তাধারা মূলগতভাবে এ শতাব্দীর দুটি মহান তত্ত্ব—ব্যাপক অপেক্ষবাদ (general relativity) এবং কণাবাদী বলবিদ্যার (quantum mechanics) উপর নির্ভরশীল ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম উদাহরণ। তদানীন্তন প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত হওয়ার জন্য শুরুতে এই মতবাদ প্রচুর বিরুদ্ধতা সৃষ্টি করে। "কৃষ্ণগহ্বর থেকে কিছু নির্গত হওয়া কি করে সম্ভব?" অক্সফোর্ডের কাছে রদারফোর্ড অ্যাপলটন (Rutherford Appleton) লাবরেটরীতে একটি কনফারেন্সে যখন আমি প্রথম আমার গণনার ফল ঘোষণা করেছিলাম তখন সাধারণভাবে সবাই আমাকে অবিশ্বাস করেছে। আমার বক্তৃতার পর ঐ অধিবেশনের চেয়ারম্যান লণ্ডনের কিংস কলেজের জন জি. টেলর (John G. Taylor)

দাবী করলেন পুরো ব্যাপারটাই অর্থহীন। এই মতের ভিত্তিতে তিনি একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত জন টেলর সমেত অধিকাংশ লোকই এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, ব্যাপক অপেক্ষবাদ এবং কণাবাদী বলবিদ্যা সম্পর্কিত অন্যান্য ধারণা যদি সঠিক হয় তাহলে অন্যান্য উত্তপ্ত বস্তুপিণ্ডের মতো কৃষ্ণগহ্বরকেও বিকিরণ করতেই হবে। সুতরাং আমরা যদিও একটিও আদিম কৃষ্ণগহ্বর খুঁজে পাইনি, তবুও কৃষ্ণগহ্বর খুঁজে পেলে তা থেকে যে প্রচুর পরিমাণ গামা রশ্মি এবং এক্স-রে নির্গত হতে দেখা যাবে সে বিষয়ে সাধারণ মতৈক্য রয়েছে।

মনে হয়, কৃষ্ণগহ্বর থেকে বিকিরণের অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত অর্থ হল মহাকর্ষের ফলে চুপসে যাওয়াই কৃষ্ণগহ্বরের চরম এবং অপরিবর্তনীয় পরিণতি নয়। কিন্তু আগে ঐ রকম চিন্তাধারাই ছিল। কোনো মহাকাশচারী যদি কৃষ্ণগহ্বরে পতিত হন তাহলে কৃষ্ণগহ্বরটির ভর বৃদ্ধি পাবে কিন্তু ঐ বাড়তি ভরের তুল্য মানের শক্তি বিকিরণ রূপে মহাবিশ্বে ফিরে আসবে। সুতরাং এক অর্থে মহাকাশচারীটি চক্রাকারে আবার ফিরে আসবে (recycle); কিন্তু এই অমরত্ব হবে একটু মন্দ ধরনের। কারণ, মহাকাশচারীটি কৃষ্ণগহ্বরের ভিতর ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার সময় তার ব্যক্তিগত কালবোধ যে লোপ পাবে সেটা প্রায় নিশ্চিত। এমন কি, শেষ পর্যন্ত যে ধরনের কণা কৃষ্ণগহ্বর থেকে নির্গত হবে সেগুলিও মহাকাশচারী যে কণাগুলি দিয়ে গঠিত হয়েছিল সাধারণত তার চাইতে পৃথক হবে। একমাত্র যা বেঁচে থাকবে সেটি হল মহাকাশচারীটির ভর বা শক্তি।

যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণগহ্বরটির ভর এক গ্রামের ভগ্নাংশের চাইতে বেশী থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণগহ্বর থেকে বিকিরণ (emission) নির্ণয় করার জন্য যে আসন্নতাগুলি (approximations) আমি ব্যবহার করেছি সেগুলি ভালই কার্যকর হবে। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরের জীবনকালের শেষে যখন তার ভর অতিক্ষুদ্র হয়ে যাবে তখন এই আসন্নতাগুলি ভেঙে পড়বে। সবচাইতে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ মনে হয়: কৃষ্ণগহ্বরটি অদৃশ্য হয়ে যাবে– অন্ততপক্ষে মহাকাশের আমাদের অঞ্চল থেকে। তার সঙ্গে নিয়ে যাবে ওই মহাকাশচারীটিকে এবং গতিটি যদি আর কোনো অনন্যতা (singularity) তার ভিতরে থেকে থাকে তাহলে সেটিকেও। ব্যাপক অপেক্ষবাদ যে অনন্যতাগুলি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল কণাবাদী বলবিদ্যা যে সেগুলিকে দূর করতে পারে এটাই ছিল তার প্রথম ইঙ্গিত। কিন্তু ১৯৭৪ সালে আমি এবং অন্যান্য অনেকে যে পদ্ধতি ব্যবহার করছিলাম, তা থেকে কণাবাদী মহাকর্ষে অনন্যতাগুলি দেখা দেবে কি না– এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর মেলে না। সুতরাং ১৯৭৫ সালের পর থেকে আমি রিচার্ড ফেনম্যানের (Richard Feynman) ইতিহাসের যোগফলের (sum of histories) চিন্তাধারার ভিত্তিতে আরো জোরের সঙ্গে কণাবাদী মহাকর্ষের সমীপবর্তী হতে শুরু করেছি। এই পদ্ধতিতে মহাবিশ্ব এবং মহাকাশচারীর মতো তার আধেয়র (contents) উৎপত্তি এবং পরিণতি সম্পর্কে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার বিবরণ দেওয়া হবে পরবর্তী দুই অধ্যায়ে। আমরা দেখব যদিও অনিশ্চয়তাবাদ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর নির্ভুলতাকে সীমিত করে তবুও এ তত্ত্ব একই সঙ্গে স্থান-কালের অনন্যতার মূলগত অনিশ্চয়তা (unpredictability) হয়তো দূরীভূত করে।

মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও পরিণতি

(The Origin and Fate of the Universe)

আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে স্থান-কালের শুরু বৃহৎ বিস্ফোরণের অনন্যতায় এবং শেষ হবে হয় বৃহৎ সঙ্কোচনের (big crunch) অনন্যতায় (যদি সমগ্র মহাবিশ্ব আবার চুপসে যায়) কিম্বা একটি কৃষ্ণগহ্বরের ভিতরকার অনন্যতায় (যদি তারকার মতো স্থানীয় একটি অঞ্চল চুপসে যায়)। যে কোনো পদার্থ ঐ গহ্বরে পড়লে ঐ অনন্যতায় সেটা ধ্বংস হয়ে যাবে। বাইরে থেকে শুধুমাত্র ঐ ভরের মহাকর্ষীয় অভিক্রিয়াই (gravitational effect) বোধগম্য হতে থাকবে। অন্যদিকে যখন আবার কণাবাদী অভিক্রিয়া (quantum effect) বিচার করা হল তখন মনে হল ঐ পদার্থের ভর কিম্বা শক্তি শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বের অবশিষ্টাংশে ফিরে যাবে এবং কৃষ্ণগহ্বরটি উবে যাবে এবং তার ভিতরে যদি কোনো অনন্যতা থাকে তাহলে সেটা সমেত উবে যাবে (evaporate) এবং শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে (disappear)। কণাবাদী বলবিদ্যার কি বৃহৎ বিস্ফোরণ কিম্বা বৃহৎ সঙ্কোচনের অনন্যতার মতো একই রকম একটি নাটকীয় অভিক্রিয়া থাকতে পারে? মহাবিশ্বের অতি প্রাথমিক অবস্থায় কিম্বা শেষ অবস্থায় যখন মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এত শক্তিশালী যে কণাবাদী অভিক্রিয়াকে (quantum effect) অগ্রাহ্য করা যায় না– তখন আসলে কি ঘটে? মহাবিশ্বের কি সত্যিই কোনো শুরু কিম্বা শেষ আছে? যদি থাকে, তাহলে তারা কি রকম?

১৯৭০ দশকের পুরোটাই আমি কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে গবেষণা করেছি কিন্তু ১৯৮১ সালে জেসুইটদের ভ্যাটিক্যানে (Vatican) সংগঠিত সৃষ্টিতত্ত্বের (cosmology) উপর একটি আলোচনা সভায় যোগদানের পর মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং পরিণতি বিষয়ক প্রশ্নে আমার আবার নতুন করে আকর্ষণ জেগে ওঠে। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আইন বানাতে গিয়ে ক্যাথলিক চার্চ গ্যালিলিওর ব্যাপারে একটি বিশ্রী ভুল করেছিল। তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন সূর্য পৃথিবীকে

প্রদক্ষিণ করে। এখন কয়েক শতাব্দী পর তাঁরা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে উপদেশ দেওয়ার জন্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। সম্মেলন শেষ হওয়ার পর সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের পোপ দর্শন দান করেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন, বৃহৎ বিস্ফোরণের পর মহাবিশ্বের বিবর্তন নিয়ে গবেষণায় কোনো দোষ নেই কিন্তু বৃহৎ বিস্ফোরণ সম্পর্কে কোনো গবেষণা করা উচিৎ হবে না। কারণ সেটা ছিল সৃষ্টির মুহূর্ত এবং সৃষ্টিটা ঈশ্বরের কর্ম। সেই সম্মেলনে তখনই আমি যে বক্তৃতা করে এসেছি সেটা ছিল স্থান-কালের সীমিত অথচ সীমাহীন হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে। অর্থাৎ এর কোনো শুরুও নেই, কোনো সৃষ্টি-মুহূর্তও নেই। তিনি যে আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু জানতেন না তাতে আমি খুশী। গ্যালিলিও-র সঙ্গে বেশ একাত্মতা বোধ করি কিন্তু আমার পরিণতি তাঁর মতো হোক এরকম কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না। এই একাত্মতা বোধের আংশিক কারণ আমি জন্মেছি তাঁর মৃত্যুর ঠিক তিনশ বছর পর।

মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং পরিণতি বিষয়ে কণাবাদী বলবিদ্যা কিরকম প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে বিষয়ে আমার এবং অন্যান্য কয়েকজনের চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করতে হলে প্রথম জানা দরকার "উত্তপ্ত বৃহৎ বিস্ফোরণ প্রতিরূপ" (hot big bang model) নামে পরিচিত মহাবিশ্বের স্বীকৃত ইতিহাস বোঝা। এই তত্ত্ব অনুসারে অনুমান করা হয়: একদম শুরু থেকে মহাবিশ্বের বিবরণ পাওয়া যায় একটি ফ্রিডম্যান প্রতিরূপে (Friedmann's model)। এই সমস্ত প্রতিরূপে দেখা যায় মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ হলে তার ভিতরের যে কোনো পদার্থ কিম্বা বিকিরণ শীতলতর হয়। (মহাবিশ্বের আকার দ্বিগুণ হলে তার তাপমাত্রা হয়ে যায় অর্ধেক)। তাপমাত্রা কণাগুলির গড় শক্তি কিম্বা দ্রুতির পরিমাপ। সুতরাং মহাবিশ্বের শীতলতর হওয়ার ফলে তার অন্তর্ভুক্ত পদার্থের উপর ক্রিয়া হবে বৃহৎ (major effect)। তাপমাত্রা খুব বেশী হলে কণাগুলি এত দ্রুত চলাচল করতে থাকবে যে পারমাণবিক কিম্বা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় যে কোনো বলজাত পারস্পরিক আকর্ষণ থেকে তারা মুক্ত হতে পারবে কিন্তু তারা শীতলতর হলে, আশা করা যায়, যে সমস্ত কণা পরস্পরকে আকর্ষণ করে তারা সংযুক্ত হতে শুরু করবে (clump together)। তাছাড়া মহাবিশ্বে কি রকম কণার অস্তিত্ব থাকবে সেটাও নির্ভর করবে তাপমাত্রার উপর। তাপমাত্রা যথেষ্ট উচ্চ হলে কণাগুলির শক্তি এত বেশী হবে যে তাদের ভিতর সংঘর্ষ হলে নানারকম কণা এবং বিপরীত কণার জোড়া (particle/antiparticle pair) উৎপন্ন হবে। বিপরীত কণাগুলিকে আঘাত করার ফলে এগুলির কিছু কিছু ধ্বংস হবে। কিন্তু কণাগুলি যত দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে উৎপন্ন হবে তার চাইতে দ্রুত। তাপমাত্রা নিম্নতর হলে কিন্তু সংঘর্ষমান কণাগুলির শক্তি হবে কম এবং কণিকা/বিপরীত কণিকার জোড় উৎপন্ন হবে স্বল্প দ্রুত এবং ধ্বংসের হার হবে উৎপাদনের হারের চাইতে বেশী।

মনে করা হয় বিস্ফোরণের সময় মহাবিশ্বের আয়তন ছিল শূন্য সুতরাং উত্তাপ ছিল অসীম। কিন্তু মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকিরণের তাপমাত্রা কমতে থাকে। বৃহৎ বিস্ফোরণের এক সেকেণ্ড পর তাপমাত্রা নেমে এসেছিল প্রায় এক হাজার কোটি ডিগ্রীতে। এ তাপ সূর্যের কেন্দ্রের তাপের চাইতে প্রায় এক হাজার গুণ বেশী কিন্তু হাইড্রোজেন বোমা

বিস্ফোরণের সময় উত্তাপ এই মাত্রায় পৌঁছায়। এই অবস্থায় মহাবিশ্বের ভিতরে প্রায় সবটাই থাকত ফোটন, ইলেকট্রন এবং নিউট্রিনো (অত্যন্ত হাল্কা কণিকা, এগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে শুধুমাত্র দুর্বল বল এবং মহাকর্ষ) এবং তাদের বিপরীত কণিকা — তাছাড়া থাকে কিছু প্রোটন এবং নিউট্রন। মহাবিশ্ব যেমন সম্প্রসারিত হচ্ছিল তাপমাত্রা তেমনি কমছিল। সংঘর্ষের ফলে ইলেক্ট্রন/বিপরীত ইলেক্ট্রনের জোড় তৈরীর হার— সেগুলি ধ্বংসের হারের অনেক নিচে নেমে আসছিল। সুতরাং অধিকাংশ ইলেক্ট্রন আর বিপরীত ইলেক্ট্রন পরস্পরকে ধ্বংস করে আরো ফোটন উৎপন্ন করল — অবশিষ্ট রইল কিছু ইলেকট্রন। নিউট্রিনো এবং বিপরীত নিউট্রিনো পরস্পরকে ধ্বংস করতে পারল না, কারণ এই কণিকাগুলির নিজেদের ভিতরে পারস্পরিক ক্রিয়া এবং অন্য কণিকার সঙ্গে ক্রিয়া খুবই দুর্বল। সুতরাং এখনও এগুলির বর্তমান থাকা উচিৎ। এগুলিকে যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারতাম তাহলে প্রথম যুগের উত্তপ্ত মহাবিশ্ব পরীক্ষার একটি ভাল সুযোগ পাওয়া যেত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে তাদের শক্তি এত কম হবে যে তাদের প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করা হবে অসম্ভব। ১৯৮১ সালের একটি রুশ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়—এগুলির সামান্য নিজস্ব ভর রয়েছে। এই পরীক্ষাফল এখনও সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। এটা যদি সত্য হয় তাহলে হয়তো পরোক্ষভাবে এর অস্তিত্বের নিদর্শন আমরা পেতে পারি। আগে যেরকম উল্লেখ করা হয়েছে সেরকম আলোকহীন পদার্থ (dark matter) তারা হতে পারে। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ বন্ধ করা এবং পুনর্বার চুপ্‌সে দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত মহাকর্ষীয় আকর্ষণ তাদের থাকতে পারে।

বৃহৎ বিস্ফোরণের প্রায় একশ সেকেণ্ড পর তাপমাত্রা হয়তো একশ কোটি ডিগ্রীতে নেমে এসেছে। সব চাইতে উত্তপ্ত তারকাগুলির অভ্যন্তরে এই তাপমাত্রা পাওয়া যায়। এই উত্তাপে শক্তিশালী কেন্দ্রকীয় বলের (strong nuclear force) আকর্ষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট শক্তি প্রোটন নিউট্রনের থাকে না— তখন তারা মিলিত হয়ে হয়তো ডুয়েটেরিয়াম (deuterium- ভারী হাইড্রোজেন) গঠন করতে শুরু করতে পারে। এই পরমাণুতে থাকে একটি প্রোটন এবং একটি নিউট্রন। তখন ডুয়েটেরিয়াম কেন্দ্রক হয়তো আরো প্রোটন এবং নিউট্রনের সঙ্গে মিলিত হয়ে হিলিয়াম কেন্দ্রক তৈরী করবে। হিলিয়ামে থাকে দুটি প্রোটন আর দুটি নিউট্রন, তাছাড়া হয়তো তৈরী হবে অল্প পরিমাণে অপেক্ষাকৃত ভারী দুটি মৌলিক পদার্থ লিথিয়াম (lithium) এবং বেরিলিয়াম (beryllium)। হিসাব করে বলা যায় উত্তপ্ত বৃহৎ বিস্ফোরণ প্রতিরূপে প্রোটন এবং নিউট্রনের প্রায় এক চতুর্থাংশ পরিবর্তিত হবে অল্প পরিমাণ— ভারী হাইড্রোজেনে এবং অন্যান্য মৌলিক পদার্থে। অবশিষ্ট নিউট্রনের অবক্ষয়ের ফলে তৈরী হবে প্রোটন। এগুলি সাধারণ হাইড্রোজেনের কেন্দ্রক।

বৈজ্ঞানিক জর্জ গ্যামো (George Gamow) তাঁর একজন ছাত্র র‍্যাল্‌ফ অ্যালফারের (Ralph Alpher) সঙ্গে ১৯৪৮ সালে লিখিত একটি বিখ্যাত গবেষণাপত্রে মহাবিশ্বের উত্তপ্ত প্রাথমিক অবস্থার একটি চিত্র প্রকাশ করেন। গ্যামো বেশ রসিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিউক্লীয় বিজ্ঞানী হান্স বেথেকে (Hans Bethe) ওই গবেষণাপত্রের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত করতে রাজী করান। ফলে লেখকদের তালিকা হয় "আলফার, বেথে, গ্যামো"। এই তিনটি নামের আদ্যক্ষর গ্রীক অক্ষর আলফা, বিটা, গামার অনুরূপ। মহাবিশ্বের আদি পর্ব সম্পর্কে প্রবন্ধে এই তিনটি

অক্ষর বিশেষভাবে উপযুক্ত। এই প্রবন্ধে তাঁরা একটি উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: মহাবিশ্বের আদিপর্বের অতি উত্তপ্ত অবস্থার বিকিরণ (ফোটন রূপে) এখনও থাকা উচিৎ। তবে তার তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে চরম শূন্যের (—২৭৩ ডিগ্রী) কয়েক ডিগ্রী বেশী হতে পারে। ১৯৬৫ সালে এই বিকিরণই পেঞ্জিয়াস (Penzias) এবং উইলসন (Wilson) আবিষ্কার করেন। আলফার, বেথে এবং গ্যামো যখন তাঁদের গবেষণাপত্রটি লিখেছিলেন, তখন প্রোটন এবং নিউট্রনের নিউক্লীয় প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে খুব বেশী জানা ছিল না। আদিম মহাবিশ্বে বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের অনুপাত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী সেইজন্য খুব নিশ্চিত হয়নি। কিন্তু উন্নততর জ্ঞানের আলোকে এই গণনা আবার করা হয়েছে এবং এখন আমাদের পর্যবেক্ষণফলের সঙ্গে তার যথেষ্ট মিল রয়েছে। তাছাড়া, মহাবিশ্বে এত বেশি পরিমাণে হিলিয়ামের অস্তিত্ব অন্য কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা খুবই শক্ত। অন্ততপক্ষে বৃহৎ বিস্ফোরণের এক সেকেণ্ড পর পর্যন্ত আমাদের চিত্রটি যে নির্ভুল সে বিষয়ে আমাদের মোটামুটি বিশ্বাস রয়েছে।

বৃহৎ বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই হিলিয়াম এবং অন্যান্য মৌলিক উপাদানের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তারপর প্রায় দশ লক্ষ বছর পর্যন্ত মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ছাড়া আর বিশেষ কিছু ঘটেনি। শেষে তাপমাত্রা যখন কয়েক হাজার ডিগ্রীতে নেমেছে এবং ইলেক্ট্রন ও কেন্দ্রকগুলির পারস্পরিক বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় আকর্ষণ অতিক্রম করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি আর থাকেনি, তখন তাদের মিলিত হয়ে পরমাণু গঠন করার সম্ভাবনা হয়। সম্পূর্ণ মহাবিশ্বই সম্প্রসারিত এবং শীতলতর হতে থাকত কিন্তু যে সমস্ত অঞ্চলের ঘনত্ব গড় ঘনত্বের চাইতে সামান্য বেশী সেই সমস্ত অঞ্চলের অতিরিক্ত মহাকর্ষীয় আকর্ষণের দরুন সম্প্রসারণ ধীরতর হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এইজন্য অবশেষে কোনো কোনো অঞ্চলে সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে নতুন করে চুপ্‌সে যাওয়া শুরু হওয়ার কথা। চুপ্‌সে যাওয়ার সময় এই সমস্ত অঞ্চলের বাইরের পদার্থের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের ফলে এগুলির সামান্য ঘূর্ণন শুরু হতে পারে। চুপ্‌সে যাওয়ার ফলে অঞ্চলগুলি যেমন ক্ষুদ্রতর হবে ঘূর্ণনও তত দ্রুত হবে। ব্যাপারটা অনেকটা যারা বরফের উপর স্কেটিং করে তাদের মতো— হাত দুটি গুটিয়ে নিলে তাদের ঘূর্ণনও দ্রুততর হয়। শেষে অঞ্চলটি যখন যথেষ্ট ক্ষুদ্র হবে তখন মহাকর্ষীয় আকর্ষণের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করার মতো পর্যাপ্ত দ্রুতি হবে ঘূর্ণনের। এই ভাবেই ঘূর্ণায়মান চাকতির মতো নীহারিকাগুলির জন্ম হয়েছে। অন্যান্য যে সমস্ত অঞ্চল ঘূর্ণন শুরু করতে পারেনি সেগুলি ডিম্বাকৃতি বস্তুপিণ্ডে (oval shaped objects) পরিণত হয়। এগুলির নাম উপবৃত্তাকার নীহারিকা। এগুলিতে অঞ্চলটির চুপ্‌সে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু নীহারিকার অংশগুলি কেন্দ্রকে স্থির গতিতে প্রদক্ষিণ করবে তবে সম্পূর্ণ নীহারিকাটির কোনো চক্রাকার গতি থাকবে না।

কালের গতির সঙ্গে নীহারিকাগুলির হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম গ্যাস ক্ষুদ্রতর মেঘ খণ্ডে ভেঙে যাবে এবং সেগুলি নিজেদের মহাকর্ষের চাপে চুপ্‌সে যেতে থাকবে। এগুলির সঙ্কোচন এবং ভিতরকার পরমাণুগুলির পরস্পর সংঘর্ষের ফলে গ্যাসের তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে। শেষে যথেষ্ট উত্তপ্ত হলে কেন্দ্রকীয় সংযোজন অভিক্রিয়া (neuclear fusion reaction) শুরু হয়ে যাবে। এর ফলে হাইড্রোজেনগুলি আরো হিলিয়ামে পরিণত হবে। এর দরুন যে উত্তাপ সৃষ্টি হবে তার ফলে চাপ বৃদ্ধি পাবে এবং সেইজন্য মেঘগুলির অধিকতর

সঙ্কোচন বন্ধ হয়ে যাবে। এগুলি স্থির অবস্থায় বহুকাল পর্যন্ত আমাদের সূর্যের মতো তারকা হয়ে থাকতে পারে। তারা হাইড্রোজেন পুড়িয়ে হিলিয়াম তৈরী করে এবং তার ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় সেটা আলোক ও তাপ রূপে বিকিরণ করে। আরও বৃহৎ তারকাগুলির নিজেদের বৃহত্তর মহাকর্ষীয় আকর্ষণের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষার জন্য উত্তপ্ত হতে হয়, ফলে কেন্দ্রকীয় সংযোজন প্রক্রিয়া এত দ্রুত হতে থাকে যে মাত্র দশ কোটি বছরেই তাদের হাইড্রোজেন শেষ হয়ে যায়। তখন তাদের সামান্য সঙ্কোচন হয় এবং তাদের উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হিলিয়াম, অক্সিজেন এবং অঙ্গারের (carbon—কার্বন) মতো আরো ভারী মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। কিন্তু তার ফলে খুব বেশী শক্তি মুক্ত হয় না, সুতরাং একটা সঙ্কট ঘনিয়ে আসে। কৃষ্ণগহ্বরের অধ্যায়ে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তারপর কি ঘটে সেটা সম্পূর্ণ বোঝা যায় না, কিন্তু মনে হয় তারকাটির কেন্দ্রীয় অঞ্চল চুপ্‌সে নিউট্রন তারকা কিম্বা কৃষ্ণগহ্বরের মতো খুব ঘন অবস্থায় পৌঁছায়। তারকাটির বাইরের অঞ্চল অনেক সময় বিরাট এক বিস্ফোরণের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে যায়। এর নাম সুপারনোভা (supernova)। নীহারিকাটির সমস্ত তারকার তুলনায় এটা হয় সবচাইতে উজ্জ্বল। তারকার জীবনকালের শেষ দিকে উৎপন্ন কিছু কিছু ভারী মৌলিক পদার্থ নীহারিকার বায়ুর (gas) ভিতরে নিক্ষিপ্ত হয়। এগুলি পরিণত হয় পরের প্রজন্মের তারকাদের ব্যবহৃত কাঁচামালের একটি অংশে। আমাদের সূর্য দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় প্রজন্মের তারকা। অতীতের সুপারনোভার ধ্বংসাবশেষযুক্ত ঘূর্ণায়মান বায়বীয় পদার্থের মেঘ থেকে প্রায় পাঁচশ কোটি বছর আগে আমাদের সূর্য গঠিত হয়েছে। সেইজন্য আমাদের সূর্যে অধিকতর ভারী মৌলিক পদার্থের অনুপাত প্রায় শতকরা দুই ভাগ। ঐ বায়বীয় পদার্থের অধিকাংশই লেগেছে সূর্যকে তৈরী করতে আর বাকিটা উড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। অবশিষ্ট অল্প পরিমাণ কিছু ভারী মৌলিক পদার্থ সংযুক্ত হয়ে কতকগুলি বস্তুপিণ্ড তৈরী হয়েছে। সেগুলিই এখন গ্রহ হয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী ঐরকম একটি গ্রহ।

শুরুতে পৃথিবী ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত। পৃথিবীর কোনো বায়ুমণ্ডল (atmosphere) ছিল না। কালে কালে পৃথিবী শীতল হল এবং বিভিন্ন স্তরের থেকে নির্গত হওয়া বায়বীয় পদার্থের সাহায্যে নিজস্ব বায়ুমণ্ডল গঠন করল। এই আদিম বায়ুমণ্ডল আমাদের জীবনধারণের উপযুক্ত ছিল না। সে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ছিল না কিন্তু মানুষের পক্ষে বিষাক্ত অনেক গ্যাস ছিল। উদাহরণ: হাইড্রোজেন সালফাইড (পচা ডিমের গন্ধ হয় এই গ্যাসের জন্য)। কিন্তু অন্য কয়েক রকম অদ্ভুত জীব আছে যেগুলি এই পরিবেশে বৃদ্ধি পেতে পারে। সম্ভবত এগুলি প্রথম বিকাশ লাভ করেছিল মহাসমুদ্রে। বোধ হয় কতকগুলি পরমাণুর আকস্মিক সমন্বয়ে কয়েকটি বৃহত্তর অবয়ব সৃষ্টি হয়েছিল। সেগুলির নাম স্থূল অণু (macromolecule)। এগুলি মহাসমুদ্র থেকে অন্যান্য পরমাণু সংগ্রহ করে সমরূপ অবয়ব গঠন করতে পারে। সুতরাং এইভাবে তারা বংশবৃদ্ধি এবং বংশরক্ষা করতে পারত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্তান সৃষ্টিতে ভুল হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুলটা এমন হোত যে নতুন স্থূল অণুগুলি নিজেদের বংশরক্ষা করতে অক্ষম হোত এবং শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু দুয়েকটি এমন ভুল হোত, যার ফলে যে নতুন স্থূল অণু সৃষ্টি হোত সেগুলি বংশরক্ষা এবং বংশবৃদ্ধিতে আরও বেশী পটু। সুতরাং তাদের অবস্থা হোত আর একটু সুবিধাজনক এবং আদিম স্থূল অণুগুলির পরিবর্তে

নিজেদের প্রতিস্থাপন করার (replace) সম্ভাবনা থাকত। এইভাবেই একটি বিবর্তনের ধারা শুরু হল। তার ফলে ক্রমশ আরো জটিল থেকে জটিলতর আত্মজ সৃষ্টি করতে সক্ষম জীব বিকাশ লাভ করল। নানা পদার্থ আদিম জীবের ভক্ষ্য ছিল— হাইড্রোজেন সালফাইড সেগুলির ভিতর একটি। এরা অক্সিজেন পরিত্যাগ করত। এইভাবে ধীরে ধীরে বায়ুমণ্ডল পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক অবস্থায় পৌঁছেছে। এর ফলে উচ্চতর জীবের বিকাশ সম্ভব হয়েছে, যেমন— মাছ, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী জীব এবং পরিশেষে মানবজাতি।

অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থা থেকে প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে শীতলতর হয়েছে: মহাবিশ্বের এই চিত্রের সঙ্গে পর্যবেক্ষণজাত আধুনিক সমস্ত সাক্ষ্যের মিল রয়েছে। তবুও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নি:

(১) আদিম মহাবিশ্ব কেন অত উত্তপ্ত ছিল?

(২) বৃহৎ মানে (large scale) বিচার করলে মহাবিশ্ব এরকম সমরূপ কেন? স্থানের সমস্ত বিন্দু থেকে বিভিন্ন অভিমুখে মহাবিশ্বকে একই রকম দেখায় কেন? বিশেষ করে বিভিন্ন দিকে পর্যবেক্ষণ করলে পশ্চাৎপটের মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের তাপমাত্রা প্রায় একই রকম কেন? ব্যাপারটা অনেকটা পরীক্ষার সময় অনেকগুলি ছাত্রকে একটি প্রশ্ন করার মতো। সবাই যদি একই রকম উত্তর করে তা হলে আপনি মোটামুটি নিশ্চিত হতে পারেন যে ওদের নিজেদের ভিতর যোগাযোগ ছিল। আদিম মহাবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল কাছাকাছি ছিল কিন্তু উপরে বর্ণিত প্রতিরূপ অনুসারে বৃহৎ বিস্ফোরণের পর আলোকের এক অঞ্চল থেকে দূরস্থিত অন্য অঞ্চলে যাওয়ার সময় ছিল না। অপেক্ষবাদ অনুসারে যদি এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে আলোক না যেতে পারে তাহলে কোনো সংবাদই যেতে পারে না। সুতরাং ব্যাখ্যার অতীত কোনো কারণে যদি একই তাপমাত্রা থেকে শুরু না হয়ে থাকে তাহলে মহাবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের একই তাপমাত্রা হওয়ার কোনো কারণ দেখা যায় না।

(৩) মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের হারের যে বিভিন্ন প্রতিরূপ রয়েছে তার কয়েকটিতে মহাবিশ্বের আবার চুপ্‌সে যাওয়ার কথা— আর অন্য কয়েকটি প্রতিরূপে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতেই থাকবে। এই হারকে বলা হয় ক্রান্তিক হার (critical rate)। সম্প্রসারণের এই ক্রান্তিক হার কেন হল— যার জন্য এক হাজার কোটি বছর পরও মহাবিশ্ব প্রায় একই হারে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে? বৃহৎ বিস্ফোরণের এক সেকেণ্ড পর যদি সম্প্রসারণের হার এক লক্ষ মিলিয়ান মিলিয়ান (১০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০) ভাগও কম হোত তাহলে মহাবিশ্ব বর্তমান আয়তনে পৌঁছানোর আগেই চুপ্‌সে যেত।

(৪) বৃহৎ মানে (large scale) বিচার করলে দেখা যায় মহাবিশ্ব খুবই সমরূপ (uniform) এবং সমসত্ত্বসম্পন্ন (homogeneous)। তা সত্ত্বেও স্থানিক অনিয়ম রয়েছে, যেমন— তারকা, নীহারিকা ইত্যাদি। মনে হয় আদিম মহাবিশ্বে ঘনত্বে সামান্য আঞ্চলিক পার্থক্যের জন্যই এগুলি সৃষ্ট হয়েছে। ঘনত্বের এই হ্রাসবৃদ্ধির কারণ কি ছিল?

banglainternet.com

ব্যাপক অপেক্ষবাদ স্বতঃ এই সমস্ত অবয়ব ব্যাখ্যা করতে পারে না— কিম্বা এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারে না। তার কারণ, এই তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মহাবিশ্ব বৃহৎ বিস্ফোরণের অনন্যতার সময় শুরু হয়েছিল অসীম ঘনত্ব দিয়ে। এই অনন্যতার ক্ষেত্রে ব্যাপক অপেক্ষবাদ এবং অন্যান্য ভৌত বিধিগুলি ভেঙে পড়বে: এই অনন্যতার ফলশ্রুতি কি হবে সে সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে না। এর আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বৃহৎ বিস্ফোরণ কিম্বা তার আগেকার যে কোনো ঘটনা এই তত্ত্ব থেকে বাদ দেওয়া চলে। তার কারণ, আমাদের পর্যবেক্ষণফলের উপর সেগুলির কোনো প্রভাব থাকা সম্ভব নয়। স্থান-কালের একটি সীমানা থাকবে। বৃহৎ বিস্ফোরণে তার শুরু।

মনে হয় বিজ্ঞান কয়েকটি বিধির গুচ্ছ আবিষ্কার করেছে। আমরা যদি যে কোনো কালে মহাবিশ্বের অবস্থা জানতে পারি তাহলে এই বিধিগুলির সাহায্যে কালের সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্পর্কে বলা সম্ভব। অবশ্য এই ক্ষমতা অনিশ্চয়তার নীতির দ্বারা সীমিত। শুরুতে এগুলি ঈশ্বরের বিধান হতে পারে কিন্তু মনে হয় তারপর থেকে তিনি মহাবিশ্বকে ওই বিধিগুলি অনুসারে বিবর্তিত হওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তিনি আর এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু তিনি কিভাবে মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা কিম্বা গঠন নির্বাচন করেছিলেন? কালের শুরুতে "সীমান্তের গঠন" (boundary condition) কি রকম ছিল?

একটি সম্ভাব্য উত্তর হল: ঈশ্বর কেন মহাবিশ্বের এই প্রাথমিক গঠন বেছে নিয়েছিলেন আমাদের সেটা বোঝার আশা নেই। সর্বশক্তিমান কোনো জীবের পক্ষে নিশ্চয়ই এটা সম্ভব ছিল কিন্তু কেন তিনি ব্যাপারটা এমনভাবে শুরু করলেন যা কিছুতেই বোঝা সম্ভব নয়, আবার কেনই বা তিনি এমন বিধি অনুসারে এর বিবর্তনের স্বাধীনতা দিলেন যা আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব? বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ ইতিহাস হল ধীরে ধীরে এই বোধ জাগ্রত হওয়া যে ঘটনাগুলি যাদৃচ্ছিকভাবে ঘটে না, সেগুলি অন্তর্নিহিত একটি নিয়মের প্রতিফলন। সে নিয়মগুলি ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় সৃষ্ট হয়ে থাকতে পারে আবার নাও সৃষ্ট হয়ে থাকতে পারে তাঁর অনুপ্রেরণায়। স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, এ নিয়ম শুধু বিধিগুলি সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়। মহাবিশ্বের আদিম অবস্থার বৈশিষ্ট্য যে স্থান-কাল, তার সীমান্তের অবস্থা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থার অনেকগুলি প্রতিরূপ থাকতে পারে এবং সবগুলি প্রতিরূপই বিধি মেনে চলতে পারে। একটি প্রাথমিক অবস্থা বেছে নেওয়ার কারণ হিসাবে একটি নীতি থাকা উচিৎ সুতরাং থাকা উচিৎ একটি প্রতিরূপ যা আমাদের মহাবিশ্বের প্রতীক।

একটি সম্ভাবনার নাম— সীমানার শৃঙ্খলাহীন অবস্থা (chaotic boundary conditions)। এগুলির ভিতরে এই অনুমান নিহিত রয়েছে যে মহাবিশ্ব হয় স্থানিকভাবে অসীম নয়তো অনন্তসংখ্যক মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে। বৃহৎ বিস্ফোরণের ঠিক পর পর বিশৃঙ্খল সীমান্ত অবস্থায় মহাবিশ্বের একটি বিশেষ আকারে (configuration) স্থানের একটি বিশেষ অঞ্চল খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা এবং কোনো কোনো অর্থে অন্য যে কোনো আকারপ্রাপ্ত অবস্থায় খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা একই: মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা নির্বাচিত হয়েছে সম্পূর্ণ অসম্বদ্ধভাবে (randomly)। এর অর্থ আদিম মহাবিশ্ব ছিল সম্ভবত অত্যন্ত বিশৃঙ্খল এবং

নিয়মবিহীন অবস্থায়। তার কারণ মহাবিশ্ব সাপেক্ষ নিয়মবদ্ধ এবং মসৃণ আকারের তুলনায় বিশৃঙ্খল এবং নিয়মবিহীন আকারের সংখ্যা অনেক বেশী। (প্রতিটি আকারের সম্ভাবনা যদি একইরকম হয় তাহলে হয়তো মহাবিশ্ব শুরু হয়েছিল বিশৃঙ্খল এবং নিয়মবিহীন অবস্থায়, তার সহজ সরল কারণ হল : এই রকম সম্ভাব্য আকারেরই সংখ্যা বেশী)। এইরকম বিশৃঙ্খল প্রাথমিক অবস্থা থেকে আমাদের বর্তমান মহাবিশ্ব কি করে সৃষ্ট হল সেটা বোঝা কঠিন, কারণ বৃহৎ মানে (large scale) বিচার করলে দেখা যায় আমাদের আজকের মহাবিশ্ব মসৃণ এবং নিয়মবদ্ধ (regular)। গামা রশ্মি পর্যবেক্ষণ থেকে যে উচ্চতর সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী সংখ্যক আদিম কৃষ্ণগহ্বর গঠিত হওয়া উচিৎ ছিল— ঐ প্রতিরূপে ঘনত্বের যে হ্রাসবৃদ্ধি আশা করা যায় তার ভিত্তিতে।

মহাবিশ্ব যদি সত্যই স্থানিকভাবে অসীম হয় কিম্বা মহাবিশ্বগুলির সংখ্যা যদি অনন্ত হয় তাহলে সম্ভবত কোনো স্থানে এমন কতকগুলি বৃহৎ অঞ্চল থাকবে যেগুলি হয়েছিল মসৃণ সমরূপ ভাবে। ব্যাপারটি অনেকটা সেই বহু পরিচিত বাঁদরের বিরাট দলের মতো। তারা টাইপরাইটারে আঙুল ঠুকে চলেছে— যা ছাপা হচ্ছে তার বেশীর ভাগটাই ভূষিমাল কিন্তু দৈবাৎ তারা শেক্সপিয়ারের একটি সনেটও টাইপ করে ফেলতে পারে। তেমনি ভাবে মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে এমন কি হতে পারে যে আমরা এমন একটি অঞ্চলে রয়েছি যেটা ঘটনাচক্রে মসৃণ এবং নিয়মবদ্ধ? আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা খুবই অসম্ভব বলে মনে হতে পারে কারণ ওই রকম মসৃণ অঞ্চলের চাইতে বিশৃঙ্খল এবং নিয়মবিহীন অঞ্চলের সংখ্যা হবে অনেক বেশী। কিন্তু যদি অনুমান করা যায় মসৃণ অঞ্চলগুলিতেই নীহারিকা এবং তারকা গঠিত হয়েছে এবং এই সমস্ত অঞ্চলেই আমাদের মতো আত্মজ (self replicating) সৃষ্টি করতে সক্ষম জটিল জীব বিকাশের মতো সঠিক পরিস্থিতি রয়েছে এবং এই জীবরাই প্রশ্ন করতে সক্ষম : মহাবিশ্ব এরকম মসৃণ কেন? এটা হল যাকে নরস্থীয় নীতি (anthropic principle) বলে তার প্রয়োগের একটি উদাহরণ। একেই অন্য বাগ্বিধিতে প্রকাশ করা যায়— "মহাবিশ্ব যেমন রয়েছে আমরা সেভাবে দেখতে পাই তার কারণ আমাদের অস্তিত্ব রয়েছে।"

নরস্থীয় নীতির দুরকম প্রকাশ রয়েছে— দুর্বল এবং সবল। দুর্বল নরস্থীয় নীতির বক্তব্য : মহাবিশ্ব যদি স্থানে এবং কালে বৃহৎ কিম্বা/এবং (and/or) অসীম হয় তাহলে বুদ্ধিমান জীবের বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় অবস্থা শুধুমাত্র কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলেই পাওয়া সম্ভব এবং সেই অঞ্চলগুলি স্থানে এবং কালে সীমিত। সুতরাং বুদ্ধিমান জীবেরা যদি দেখতে পান যে মহাবিশ্বে শুধুমাত্র তাদের অঞ্চলেই তাদের নিজেদের অস্তিত্ব সম্ভব করার মতো অবস্থা রয়েছে তাহলে তাঁদের বিস্মিত হওয়া উচিৎ নয়। ব্যাপারটা অনেকটা ধনী লোকের ধনী অঞ্চলে বসবাস করে কোনো দারিদ্র দেখতে না পাওয়ার মতো।

দুর্বল নরস্থীয় নীতির প্রয়োজনীয়তার একটি উদাহরণ— বৃহৎ বিস্ফোরণ কেন এক হাজার কোটি বছর আগে হয়েছিল সেই প্রশ্নের এই উত্তর : বিবর্তনে বুদ্ধিমান জীব সৃষ্টির জন্য প্রায় ঐরকম সময়ই লাগে। এর আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে : প্রথমে প্রয়োজন ছিল পূর্ব প্রজন্মের একটি তারকা গঠন করা। এই তারকাগুলি আদি হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামের কিছু অংশকে কার্বন (অঙ্গার) এবং অক্সিজেনের (অম্লজানের) মতো পরমাণুতে পরিণত করে। এই পরমাণুগুলি

দিয়েই আমরা তৈরী। এরপর তারকাগুলিতে বিস্ফোরণ হয়ে সুপারনোভা (supernovas) সৃষ্টি হয়েছে। তাদের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে তৈরী হয়েছে অন্যান্য তারকা এবং গ্রহ। তার ভিতরে রয়েছে আমাদের সৌরজগৎ। এর বয়স পাঁচশ কোটি বছর। পৃথিবীর অস্তিত্বের প্রথম একশ কিম্বা দুশো কোটি বছর পৃথিবী এত উত্তপ্ত ছিল যে জটিল কিছু সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল না। বাকী প্রায় তিনশ কোটি বছর কেটেছে ধীর গতিতে জৈব বিবর্তন নিয়ে। এর শুরু হয়েছে সরলতম জীব নিয়ে এবং এমন জীব সৃষ্টি পর্যন্ত পৌঁছেছে যারা বৃহৎ বিস্ফোরণ পর্যন্ত অতীত কাল মাপতে পারে।

দুর্বল নরস্থীয় নীতির সত্যতা কিম্বা প্রয়োজনীয়তা নিয়ে খুব কম লোকই প্রশ্ন করবে। কিছু লোক কিন্তু আরো অনেকটা অগ্রসর হয়ে এই নীতির একটি সবল রূপ প্রস্তাব করেছেন। এই তত্ত্ব অনুসারে হয় ভিন্ন ভিন্ন বহু মহাবিশ্ব রয়েছে, নয়তো একই মহাবিশ্বের রয়েছে নানা অঞ্চল এবং তাদের প্রাথমিক আকারও (configuration) নিজস্ব। তাদের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক বিধির গুচ্ছও রয়েছে। এই সমস্ত মহাবিশ্বের অধিকাংশেই জটিল জীবের বিকাশের উপযুক্ত সঠিক অবস্থা নেই। শুধুমাত্র আমাদের মহাবিশ্বের মতো কয়েকটি মহাবিশ্বেই বুদ্ধিমান জীব বিকশিত হতে পারে এবং প্রশ্ন করতে পারে— "আমরা যেমন দেখছি মহাবিশ্ব সেরকম হল কেন?" উত্তরটা খুব সহজ— "মহাবিশ্ব অন্যরকম হলে আমরা এখানে থাকতাম না।"

বর্তমানে জ্ঞাত বৈজ্ঞানিক বিধিগুলিতে কয়েকটি মূলগত সংখ্যা আছে— যেমন ইলেকট্রনের বৈদ্যুতিক আধানের আয়তন (size) এবং প্রোটন আর ইলেকট্রনের ভরের অনুপাত। তত্ত্বের সাহায্যে আমরা এই সংখ্যাগুলি বলতে পারি না। অন্ততঃ এই মুহূর্তে পারি না। এই সংখ্যাগুলি পেতে হবে পর্যবেক্ষণের সাহায্যে। হতে পারে কোনো একদিন আমরা একটি সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আবিষ্কার করব এবং সে তত্ত্ব এগুলি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে কিন্তু এও সম্ভব হতে পারে যে এগুলির কিছু কিছু কিম্বা সবগুলিই এক মহাবিশ্ব থেকে অন্য মহাবিশ্বে পৃথক হবে কিম্বা একই মহাবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক হবে। একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার : মনে হয় এই সংখ্যাগুলির মান এমন সূক্ষ্মভাবে বিন্যস্ত (adjusted) করা হয়েছে যাতে জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়। উদাহরণ : যদি ইলেকট্রনের আধান সামান্য পৃথক হোত তাহলে তারকাগুলি হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম পোড়াতে পারত না কিম্বা তাদের বিস্ফোরণ হোত না। অন্য ধরনের বুদ্ধিমান জীব অবশ্যই থাকতে পারে, এমন জীব যাদের কথা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর লেখকরাও ভাবতে পারেন নি। তাদের হয়তো আমাদের সূর্যের মতো তারকার আলো প্রয়োজন হয় না— প্রয়োজন হয় না যে গুরুভার রাসায়নিক মৌলিক পদার্থগুলি তারকার ভিতরে তৈরী হয় এবং তারকা বিস্ফোরণের সময় স্থানে নিক্ষিপ্ত হয় সেরকম কিছুই। তবুও মনে হয় সংখ্যার মানের অল্পসংখ্যক বিন্যাসই (range) যে কোনো প্রকার বুদ্ধিমান জীব বিকাশ অনুমোদন করত। মূল্যমানের অধিকাংশ গুচ্ছই মহাবিশ্বের জন্ম দিতে পারত, সে মহাবিশ্ব খুবই সুন্দর হলেও যে সৌন্দর্য দেখে অবাক হওয়ার কেউ থাকত না। এই তথ্যকে সৃষ্টির ব্যাপারে এবং বৈজ্ঞানিক বিধি নির্বাচনের ব্যাপারে ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যের সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে কিম্বা গ্রহণ করা যেতে পারে সবল নরস্থীয় তত্ত্বের প্রমাণ হিসাবে।

মহাবিশ্বের পর্যবেক্ষণ করা অবস্থার ব্যাখ্যা হিসাবে সবল নরস্থীয় নীতিকে উপস্থাপনের

বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারে। প্রথমত, বিভিন্ন মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কথা কি অর্থে বলা যায়? তারা যদি সত্যিই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে তাহলে অন্য মহাবিশ্বে যা ঘটছে আমাদের মহাবিশ্বে তার কোনো পর্যবেক্ষণযোগ্য ফল থাকতে পারে না। সুতরাং আমাদের উচিৎ মিতব্যয়িতার নীতি ব্যবহার করে ঐ মহাবিশ্বগুলিকে তত্ত্ব থেকে বাদ দেওয়া। অন্যদিকে তারা যদি একই মহাবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল হয় তাহলে বিজ্ঞানের বিধি প্রত্যেক অঞ্চলেই অভিন্ন হওয়া উচিৎ, কারণ তাছাড়া এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে অবিচ্ছিন্নভাবে যাতায়াত সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে অঞ্চলগুলির ভিতর একমাত্র পার্থক্য হবে তাদের প্রাথমিক আকারে সুতরাং সবল নরত্বীয় নীতি পরিণত হবে দুর্বল নরত্বীয় নীতিতে।

সবল নরত্বীয় নীতির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি হল : এ নীতি বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ ইতিহাসের স্রোতের বিরুদ্ধে। আমরা বিকাশ লাভ করেছি টোলেমী এবং তাঁর পূর্বগামীদের পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাবিশ্ব তত্ত্ব থেকে, কোপারনিকাস এবং গ্যালিলিওর সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্ব তত্ত্বের ভিতর দিয়ে আধুনিক মহাবিশ্ব চিত্রে। এ চিত্রে পৃথিবী একটি সাধারণ সর্পিল (spiral) নীহারিকার প্রান্তিক অঞ্চলে অবস্থিত একটি সাধারণ তারকাকে প্রদক্ষিণরত মাঝারি আকারের গ্রহ। এই নীহারিকাটি পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের এক লক্ষ কোটি নীহারিকার ভিতরে একটি। তবুও সবল নরত্বীয় নীতির দাবী এই বিরাট সংগঠনের অস্তিত্ব শুধু আমাদের জন্যই। এটা বিশ্বাস করা খুবই শক্ত। আমাদের সৌরজগৎ নিশ্চয়ই আমাদের অস্তিত্বের একটি পূর্ব শর্ত এবং পূর্ব প্রজন্মের যে তারকাগুলি ভারী মৌলিক পদার্থগুলি তৈরী করেছিল সেগুলিও প্রয়োজন ছিল। সেইজন্য এই পূর্ব শর্ত আমাদের নীহারিকা অবধি আমরা বিস্তার করতে পারি। কিন্তু অন্য নীহারিকাগুলির কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না কিম্বা মনে হয় না এই মহাবিশ্বের প্রতিটি অভিমুখেই এমন সুষম এবং সমরূপ হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে।

যদি দেখানো যেত যে, আমরা যে মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করছি সেটা সৃষ্টি করার জন্য বিবর্তনে বেশ কয়েক রকম প্রাথমিক আকারের মহাবিশ্ব সৃষ্ট হয়েছিল, তাহলে নরত্বীয় নীতি (অন্ততপক্ষে তার দুর্বল রূপটিকে) মেনে নেওয়া সহজতর হোত। ব্যাপারটি যদি তাই হয় তাহলে, যে মহাবিশ্বের বিবর্তন হয়েছে প্রাথমিক একটি এলোমেলো অবস্থা থেকে, সে ক্ষেত্রে সেখানে এমন কিছু অঞ্চল থাকা উচিৎ ছিল যেগুলি মসৃণ আর সমরূপ এবং বিবর্তনের ধারায় বুদ্ধিমান জীব সৃষ্টির উপযুক্ত। আবার অন্যপক্ষে বলা যায়, আমরা আমাদের চারদিকে যা দেখেছি সেই রকম একটা কিছু সৃষ্টি করার জন্য যদি অত্যন্ত সতর্কভাবে মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা নির্বাচন করা হোত, তাহলে সে মহাবিশ্বে জীবের আবির্ভাব হতে পারে এরকম কোনো অঞ্চলের অস্তিত্বের সম্ভাবনা থাকতে খুবই কম। এর আগে যে উত্তপ্ত বৃহৎ বিস্ফোরণের প্রতিরূপ দেওয়া হয়েছে সেরকম ক্ষেত্রে আদিম মহাবিশ্বে উত্তাপের স্রোতের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সময় থাকত না। এর অর্থ : আমরা যে দিকে তাকাই সর্বত্র মাইক্রোতরঙ্গের তাপমাত্রা একই রকম— এই তথ্য ব্যাখ্যা করতে হলে বলতে হয় আদিম অবস্থায় মহাবিশ্বের সর্বত্রই নিখুঁতভাবে একই তাপমাত্রা ছিল। মহাবিশ্বের আবার চুপসে যাওয়া এড়ানোর জন্য সম্প্রসারণের যে ক্রান্তিক (critical) হার প্রয়োজন, বাস্তবে সম্প্রসারণের হার এখনও তার এত কাছাকাছি যে সম্প্রসারণের প্রাথমিক হার খুবই নিখুঁতভাবে নির্বাচনের

প্রয়োজন ছিল। এর অর্থ হল উত্তপ্ত বৃহৎ বিস্ফোরণের প্রতিরূপ যদি কালের আরম্ভ থেকেই সত্য হয় তাহলে মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা খুবই সতর্কভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। মহাবিশ্ব কেন এভাবে শুরু হয়েছিল এ তথ্য ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে একজন ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করার ইচ্ছায় এভাবে কাজ করেছিলেন।

মাসাচুসেটস্ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির বৈজ্ঞানিক অ্যালান গুথ (Alan Guth)-এর চেষ্টা ছিল মহাবিশ্বের এমন একটি প্রতিরূপ অন্বেষণ করা যে প্রতিরূপে বহু প্রাথমিক আকার বিবর্তনের ফলে আধুনিক মহাবিশ্বের মতো একটি জিনিষ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি ইঙ্গিত করেছেন— আদিম মহাবিশ্ব হয়তো একটি অতিদ্রুত সম্প্রসারণ কালের ভিতর দিয়ে গিয়েছে। এই সম্প্রসারণকে বলা হয় "অতিস্ফীতি" (inflation)। কথাটির অর্থ হল এখন যে রকম সম্প্রসারণের হার হ্রাস পাচ্ছে এক সময় সে রকম না হয়ে সম্প্রসারণের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গুথের মতে, এক সেকেণ্ডের সামান্য মাত্র ভগ্নাংশ কালের ভিতরে মহাবিশ্বের ব্যাসার্ধ মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান (একের পিঠে ত্রিশটি শূন্য) গুণ বেড়েছে।

গুথের প্রস্তাবনা অনুসারে বৃহৎ বিস্ফোরণের পর মহাবিশ্বের শুরু অত্যন্ত উত্তপ্ত কিন্তু বিশৃঙ্খল (chaotic) অবস্থায়। এই উচ্চ তাপমাত্রার অর্থ হোত : মহাবিশ্বের কণাগুলি ছিল অতি দ্রুতগতি, তাদের ভিতরে শক্তিও ছিল বেশী। এর আগে আলোচনা করা হয়েছে এরকম উচ্চ তাপমাত্রায় সবল কেন্দ্রকীয় বল (strong neuclear force), দুর্বল কেন্দ্রকীয় বল (weak neuclear force) এবং বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল একীভূত হয়ে একটি বলে পরিণত হয়। মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতলতর হবে এবং কণাগুলির শক্তিও হ্রাস পাবে। শেষে একটি অবস্থা হবে— তার নাম দশার রূপান্তর (phase transition)। এ অবস্থায় কণাগুলির ভিতরকার সামঞ্জস্য (symmetry) ভেঙে যাবে : সবল বল বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল এবং দুর্বল বল থেকে পৃথক হয়ে যাবে। দশার রূপান্তরের একটি সাধারণ উদাহরণ হল : জল ঠাণ্ডা হলে জমে যাওয়া। তরল জল প্রতিসম (symmetrical)- প্রতিটি বিন্দুতে প্রতিটি অভিমুখেই একরূপ। কিন্তু বরফের ক্রিস্টাল গঠিত হলে তারা কোনো একটি অভিমুখে শ্রেণীবদ্ধ হয়। এর ফলে জলের প্রতিসম অবস্থা ভেঙে পড়ে।

সাবধান হলে জলকে অতি শীতল (super cool) করা সম্ভব। অর্থাৎ তাপমাত্রাকে হিমাঙ্কের (0° সে) নিচে নিয়ে আসা কিন্তু বরফ জমতে না দেওয়া। গুথের প্রস্তাবনা ছিল মহাবিশ্বও একই রকম আচরণ করতে পারে অর্থাৎ তাপমাত্রা ক্রান্তিক মানের নিচে নামলেও বলগুলির ভিতরকার সামঞ্জস্য (symmetry —প্রতিসম অবস্থা) না ভাঙতে পারে। এরকম হলে মহাবিশ্ব সুস্থিত (stable) অবস্থায় থাকবে না এবং প্রতিসম অবস্থা ভেঙে পড়লে যা থাকত তার চাইতে বেশী শক্তি থাকবে। দেখানো যেতে পারে এই বিশেষ বাড়তি শক্তির একটি মহাকর্ষ বিরোধী ক্রিয়া থাকে। আইনস্টাইন যখন মহাবিশ্বের একটি সুস্থিত প্রতিরূপ (static model) গঠন করতে চেষ্টা করেছিলেন তখন তিনি ব্যাপক অপেক্ষবাদে একটি সৃষ্টি তত্ত্ব বিষয়ক ধ্রুবক (cosmological constant- মহাজাগতিক ধ্রুবক) উপস্থিত করেছিলেন।

উপরে লিখিত মহাকর্ষবিরোধী অভিক্রিয়ার আচরণ হতে পারে ঠিক ঐ ধ্রুবকের মতো। উত্তপ্ত বৃহৎ বিস্ফোরণের প্রতিরূপের মতো মহাবিশ্বের প্রসারণ আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক ধ্রুবকের বিকর্ষণী ক্রিয়ার ফলে মহাবিশ্ব ক্রমবর্ধমান হারে প্রসারিত হতে থাকত। এমন কি যে সমস্ত অঞ্চলে পদার্থ কণিকার পরিমাণ গড় পরিমাণের চাইতে বেশী সেখানেও পদার্থের আকর্ষণ সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক ধ্রুবকের কার্যকর বিকর্ষণের চাইতে কম। সুতরাং এই অঞ্চলগুলি একটি ত্বরিত স্ফীতির (accelerated inflationary manner) মতো প্রসারিত হোত। সম্প্রসারিত হওয়া এবং পদার্থ কণিকাগুলির পরস্পর থেকে দূরতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি প্রসারমান মহাবিশ্ব পাওয়া যেত যেখানে পদার্থ কণিকা প্রায় নেই বললেই চলে এবং যে মহাবিশ্ব তখনও অতি শীতল (super cooled) অবস্থায়। ঠিক যেমন একটি বেলুন ফোলালে তার ভাঁজগুলি মসৃণ হয়ে যায় ঠিক তেমনি সম্প্রসারণের ফলে মহাবিশ্বের বর্তমান মসৃণ এবং সমরূপ অবস্থা নানা ধরনের অমসৃণ প্রাথমিক অবস্থা থেকে বিবর্তিত হতে পারে।

যে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ পদার্থের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ দ্বারা মন্দীভূত না হয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক ধ্রুবকের দ্বারা ত্বরিত হয়েছে সেই মহাবিশ্বের আদিম অবস্থায় আলোকের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত সময় থাকবে। এর আগে একটি সমস্যার উল্লেখ করা হয়েছিল : আদিম মহাবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের একই ধর্ম কেন? উল্লিখিত তথ্য সে সমস্যার একটি সমাধান দেখাতে পারে। তাছাড়াও মহাবিশ্বের শক্তির ঘনত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সম্প্রসারণের হার স্বতত ক্রান্তিক হারের খুব নিকটে চলে আসবে। সম্প্রসারণের হার ক্রান্তিক হারের এত নিকট কেন তারও একটি ব্যাখ্যা এ তথ্য থেকে পাওয়া যেতে পারে। তার জন্য এ অনুমানের প্রয়োজন নেই যে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের হার খুব সতর্কতার সঙ্গে বেছে নেওয়া হয়েছিল।

অতিস্ফীতি (inflation) সম্পর্কীয় ধারণা দিয়ে মহাবিশ্বে অত বেশী পরিমাণ পদার্থের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মহাবিশ্বে যে অঞ্চল আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি সে অঞ্চলে প্রায় দশ মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান (একের পিঠে পঁচাশিটা শূন্য) কণিকা রয়েছে। এগুলি এল কোত্থেকে? এর উত্তর : কণাবাদীতত্ত্ব (কোয়ান্টাম তত্ত্ব) অনুসারে শক্তি থেকে কণিকা/বিপরীত কণিকার জোড়া রূপে কণিকা তৈরী হতে পারে। কিন্তু অতপরেই প্রশ্ন আসে শক্তি কোত্থেকে এল? উত্তর হল : মহাবিশ্বে মোট শক্তির পরিমাণ ঠিক শূন্য। মহাবিশ্বের পদার্থ সৃষ্টি হয় পরা (positive) শক্তি থেকে। কিন্তু পদার্থ মহাকর্ষের সাহায্যে নিজেকে সম্পূর্ণ আকর্ষণ করছে। দুটি বস্তুখণ্ড যদি কাছাকাছি থাকে তাহলে তাদের শক্তির পরিমাণ তারা যদি বহু দূরে থাকে তাহলে তাদের শক্তির পরিমাণের চাইতে কম। তার কারণ, যে মহাকর্ষীয় বল তাদের পরস্পরের নিকটে টানছে তার বিরুদ্ধে বস্তুখণ্ড দুটিকে বিচ্ছিন্ন করতে শক্তি ক্ষয় হয়। সেইজন্য এক অর্থে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের একটি অপরা (negative) শক্তি রয়েছে। যে মহাবিশ্ব স্থানে মোটামুটি সমরূপ তার ক্ষেত্রে দেখানো যেতে পারে এই

অপরা মহাকর্ষীয় শক্তি (negative gravitational energy) এবং বস্তু যে পরা শক্তির (positive energy) প্রতিনিধি—এরা পরস্পরকে নির্ভুলভাবে বাতিল (cancel) করে। সুতরাং মহাবিশ্বের মোট শক্তি শূন্য।

শূন্যের দ্বিগুণও শূন্য। তাহলে মহাবিশ্ব তার পরা পদার্থ শক্তি এবং অপরা মহাকর্ষীয় শক্তিকে দ্বিগুণ করতে পারে। সেক্ষেত্রেও শক্তির অক্ষয়ত্ব বিধি লঙ্ঘিত হবে না। মহাবিশ্বের সাধারণ সম্প্রসারণে এরকম ঘটনা ঘটে না। সেক্ষেত্রে মহাবিশ্ব বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বস্তু শক্তির ঘনত্ব হ্রাস পায়। তবে অতিস্ফীতিরূপ সম্প্রসারণে (inflationary expansion) সে রকম হয়, তার কারণ, অতি শীতল অবস্থায় শক্তির ঘনত্ব থাকে অচর (constant) অথচ মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু মহাবিশ্ব যখন সম্প্রসারিত হয় তখন পরা বস্তুশক্তি (positive matter energy) এবং অপরা মহাকর্ষীয় শক্তি দুটিই দ্বিগুণ হয়, ফলে মোট শক্তি শূন্যই থাকে। অতিস্ফীতির দশায় (inflationary phase) মহাবিশ্বের আয়তন খুব বেশী বেড়ে যায়। সুতরাং কণিকা গঠন করার জন্য প্রাপ্তব্য শক্তির পরিমাণও বিরাট বৃদ্ধি পায়। গুথ মন্তব্য করেছেন : "লোকে বলে কোথাও মাগনা খেতে পাওয়া যায় না, কিন্তু মহাবিশ্ব চরম মাগনা খাওয়া।"

আজকের দিনে মহাবিশ্ব আর অতিস্ফীতি রূপে (inflationary way) সম্প্রসারিত হচ্ছে না। সুতরাং এমন কিছু ব্যবস্থা থাকবার কথা যার জন্য কার্যকর বিরাট সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক ধ্রুবক নিষ্ক্রিয় হবে এবং সম্প্রসারণের হার ত্বরিত না হয়ে মহাকর্ষের ফলে বর্তমান কালের মতো মন্থর হবে। ঠিক যেমন অতি শীতল জল শেষ পর্যন্ত জমে যায়, তেমনি অতিস্ফীতিরূপ সম্প্রসারণে আশা করা যেতে পারে শেষ পর্যন্ত বলগুলির প্রতিসাম্য (symmetry) ভেঙে পড়বে। অভগ্ন প্রতিসম অবস্থার বাড়তি শক্তি তাহলে মুক্ত হবে এবং মহাবিশ্বকে উত্তপ্ত করে এমন তাপমাত্রায় নিয়ে আসবে যা বলগুলির ভিতর প্রতিসাম্য রক্ষা করার উপযুক্ত ক্রান্তিক তাপমাত্রার ঠিক নিচে। উত্তপ্ত বৃহৎ বিস্ফোরণের প্রতিরূপের মতোই তখনও মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতে থাকবে এবং শীতল হতে থাকবে, কিন্তু তখন মহাবিশ্ব কেন সঠিক ক্রান্তিক হারে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং কেন মহাবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের একই তাপমাত্রা তার একটি ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে।

গুথের প্রাথমিক প্রস্তাবে দশা রূপান্তর (phase transition) হঠাৎ ঘটে— অনেকটা অতি শীতল জলে স্ফটিক (crystal) দেখা দেওয়ার মতো। চিন্তনটি ছিল : ফুটন্ত জল দিয়ে পরিবৃত বাষ্পের বুদ্বুদের মতো ভগ্ন প্রতিসম অবস্থার নতুন দশার বুদ্বুদ পুরাতন দশার ভিতর গঠিত হয়। অনুমান করা হোত বুদ্বুদগুলি সম্প্রসারিত হয়ে পরস্পর যুক্ত হতে হতে পুরো মহাবিশ্বই নতুন দশা প্রাপ্ত হয়। মুশকিলটা হল : মহাবিশ্ব এত দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছিল যে বুদ্বুদগুলি যদি আলোকের দ্রুতিতেও বৃদ্ধি পায় তাহলেও তারা পরস্পর থেকে দূরে অপসরণ করতে থাকবে, সুতরাং পরস্পর যুক্ত হতে পারবে না। এ বিষয়ে আমি এবং অন্য কয়েকজন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। মহাবিশ্ব থাকবে একটি অসমরূপ অবস্থায় এবং কতকগুলি অঞ্চলে তখনো বিভিন্ন বলের প্রতিসম অবস্থা থাকবে। মহাবিশ্বের এই রকম প্রতিরূপ আমরা মহাবিশ্বকে যে অবস্থায় দেখছি তার সঙ্গে মেলে না।

১৯৮১ সালের অক্টোবর মাসে আমি মস্কোতে একটি কণাবাদী মহাকর্ষ (quantum gravity) সম্পর্কীয় আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছিলাম। সভা শেষ হওয়ার পর আমি স্টার্নবার্গ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইন্সটিট্যুটে একটি সেমিনার করি। অধিকাংশ লোকই আমার কথা বুঝতে পারত না, সেইজন্য এর আগে আমার হয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অন্য একজনকে নিয়োগ করেছিলাম। কিন্তু এবার সেমিনারের জন্য তৈরী হওয়ার সময় ছিল না, সুতরাং বক্তৃতাটি আমি নিজেই দিয়েছিলাম। আমার একজন গ্র্যাজুয়েট ছাত্র আমার কথার পুনরুক্তি করেছিল। ব্যাপারটি ভালই হয়েছিল এবং এর ফলে আমার শ্রোতাদের সঙ্গে যোগাযোগও বেশী হয়েছে। শ্রোতাদের ভিতর মস্কোর লেবেডেভ্ ইন্সটিটিউটের একজন তরুণ রুশ ছিলেন। তাঁর নাম আন্দ্রে লিণ্ডে (Andrei Linde)। তিনি বলেছিলেন, বুদ্বুদগুলি সংযুক্ত না হওয়ার অসুবিধা এড়ানো যায় যদি বুদ্বুদগুলি এত বড় হয় যে মহাবিশ্বে আমাদের অঞ্চলটি সম্পূর্ণই একটি বুদ্বুদের অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্যাপারটা এরকম হতে হলে বুদ্বুদটির ভিতর প্রতিসম অবস্থা থেকে ভগ্ন প্রতিসম অবস্থায় (broken symmetry) উত্তরণ অবশ্যই খুব ধীরে ধীরে হোত। পূর্ণাঙ্গ (Grand) ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বগুলি অনুসারে ব্যাপারটা সত্যিই সম্ভব। ধীরে প্রতিসম অবস্থা ভগ্ন হওয়া বিষয়ক লিণ্ডের ধারণাটি খুবই ভাল। কিন্তু পরে আমার মনে হল— সেক্ষেত্রে বুদ্বুদগুলির যে আয়তন হতে হোত সেটা তদানীন্তন মহাবিশ্বের আয়তনের চাইতে বেশী। আমি দেখিয়েছিলাম শুধুমাত্র বুদ্বুদগুলির ভিতরে না হয়ে একসঙ্গে সর্বত্রই প্রতিসম অবস্থা ভেঙে পড়তে পারে—তাহলে তার ফল হবে আমরা যে রকম দেখছি সেই রকম একটি সমরূপ (uniform) মহাবিশ্ব। এই চিন্তাধারার ফলে আমি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ি এবং আয়ান মস্ (Ian Moss) নামে আমার এক ছাত্রের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করি। প্রকাশের উপযুক্ত কিনা জানবার জন্য লিণ্ডের প্রবন্ধটি একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা আমার কাছে পাঠায়। কিন্তু লিণ্ডে আমার বন্ধু, সেইজন্য আমি একটু বিব্রত বোধ করি। আমি উত্তর দিই—ধীর গতিতে প্রতিসম অবস্থা ভগ্ন হওয়া বিষয়ক চিন্তাধারা মূলত খুবই ভাল, কিন্তু একটিই খুঁত থেকে যায়— সেটা হল বুদ্বুদগুলিকে হতে হয় মহাবিশ্বের চাইতে বড়। আমি সুপারিশ করলাম গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করা হোক, কারণ ওটা সংশোধন করতে লিণ্ডের কয়েক মাস লেগে যাবে। পাশ্চাত্য দেশে যাই আসুক না কেন, তাকে সোভিয়েৎ সেন্সর এড়াতে হবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রের ব্যাপারে তাঁরা খুব কুশলী কিম্বা চটপটে নন। তার বদলে আমি আয়ান মসের (Ian Moss) সঙ্গে একটি ছোট প্রবন্ধ একই পত্রিকায় লিখলাম। সে প্রবন্ধে আমি বুদ্বুদ বিষয়ক সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং কি করে সে সমস্যার সমাধান করা যায় সেটাও দেখাই।

মস্কো থেকে যেদিন ফিরি সেদিনই আমি ফিলাডেলফিয়া রওনা হই। সেখানে ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্সটিট্যুট থেকে আমার একটি পদক পাওয়ার কথা ছিল। আমার সেক্রেটারী জুডি ফেলা (Judy Fella) প্রচারের স্বার্থে কনকর্ডে তাঁর এবং আমার জন্য বিনামূল্যে দুটি আসন সংগ্রহ করার জন্য তাঁর অসামান্য মোহিনীশক্তি ব্যবহার করেন। কিন্তু বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে আমি আটকে যাই, ফলে প্লেনটা আর ধরতে পারিনি। তবুও শেষ পর্যন্ত আমি ফিলাডেলফিয়াতে পৌঁছাই এবং পদক গ্রহণ করি। তখন আমাকে ফিলাডেলফিয়ার ড্রেক্সেল

বিশ্ববিদ্যালয়ে, মস্কোতে যেমন দিয়েছিলাম, সেই রকম অতি স্ফীতিমান মহাবিশ্ব (inflationary universe) সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দিতে বলা হয়।

কয়েক মাস পরে পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পল স্টাইনহার্ড (Paul Steinhardt) এবং অ্যানড্রিয়াস অ্যালব্রেখট্ (Andreas Albrecht) স্বাধীনভাবে লিণ্ডের মতোই একটি ধারণা উপস্থিত করেন। এখন তাঁদের দুজনকে এবং লিণ্ডেকে যুক্তভাবে প্রতিসম অবস্থা ধীরগতিতে ভগ্ন হওয়ার চিন্তনের ভিত্তিতে গঠিত "নব্য স্ফীতিমান প্রতিরূপ" গঠনের কৃতিত্ব দেওয়া হয়। (প্রাচীন অতিস্ফীতিমান প্রতিরূপ ছিল গুথের প্রতিসাম্য ভগ্ন হওয়া এবং বুদ্বুদ সৃষ্টি হওয়া বিষয়ে প্রথম উপস্থাপিত ধারণা)।

নব্য অতিস্ফীতিমান প্রতিরূপ মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থা হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করার একটি উত্তম প্রচেষ্টা। কিন্তু আমি এবং আর কয়েকজন দেখিয়েছিলাম : অন্তত পক্ষে প্রতিরূপের যে প্রাথমিক রূপ ছিল সে রূপ পর্যবেক্ষণ করা মাইক্রোতরঙ্গ পশ্চাৎপট বিকিরণের তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশী হ্রাসবৃদ্ধি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। অতি আদিম মহাবিশ্বে যে রকম প্রয়োজন হতে পারত সে রকম কোনো দশা রূপান্তর (phase transition) হওয়া সম্ভব ছিল কিনা সে সম্পর্কে পরবর্তী অনেক গবেষণাতেই সন্দেহ প্রকাশ পায়। আমার ব্যক্তিগত মতে, নব্য অতিস্ফীতিমান প্রতিরূপের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে মৃত্যু হয়েছে। তবে অনেকেই এর মৃত্যু সংবাদ রাখেন না। অনেকেই এখনো এমনভাবে গবেষণাপত্র লিখে চলেছেন যেন এ তত্ত্ব এখনও জীবিত। ১৯৮৩ সালে লিণ্ডে (Linde) শৃঙ্খলাহীন অতিস্ফীতিমান প্রতিরূপ (chaotic inflationary model) নামে আরো ভাল একটি প্রতিরূপ উপস্থিত করেন। এ প্রতিরূপে কোনো দশা রূপান্তর (phase transition) কিম্বা অতি শীতল হওয়া (super cooling) নেই। তার বদলে রয়েছে একটি O চক্রণ ক্ষেত্র (spin O field), সে ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম হ্রাসবৃদ্ধির দরুন আদিম মহাবিশ্বের কোনো কোনো অঞ্চলে মান (value) হোত বৃহৎ। এই সমস্ত অঞ্চলের ক্ষেত্রের শক্তি একটি মহাজাগতিক ধ্রুবকের মতো আচরণ করবে। এর একটি বিকর্ষণকারী মহাকর্ষীয় অভিক্রিয়া থাকবে। তার ফলে ঐ অঞ্চলগুলি অতি দ্রুত স্ফীত হবে। প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ক্ষেত্রের শক্তিও ধীরে ধীরে কমবে। শেষ পর্যন্ত অতিদ্রুত প্রসারণ (inflationary expansion) হ্রাস পেয়ে উত্তপ্ত বৃহৎ বিস্ফোরণের প্রতিরূপের মতো প্রসারণে রূপান্তরিত হবে। এই অঞ্চলগুলির একটি হবে আমরা যাকে পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বরূপে দেখি সেই অঞ্চল। এই প্রতিরূপের আগেকার দ্রুত স্ফীতিমান প্রতিরূপের সমস্ত সুবিধাই রয়েছে কিন্তু এটি সন্দেহজনক দশা রূপান্তরের (dubious phase transition) উপর নির্ভর করে না। তাছাড়া এ প্রতিরূপে পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মাইক্রোতরঙ্গের পশ্চাৎপটের তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধির একটি যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ পাওয়া যায়।

অতিস্ফীতিমান প্রতিরূপের উপর এই গবেষণা দেখিয়েছে মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থা বহুসংখ্যক পৃথক পৃথক প্রাথমিক আকৃতি (configuration) থেকে উদ্ভূত হতে পারে। এ তথ্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ থেকে বোঝা যায় মহাবিশ্বের যে অংশে আমরা বাস করি সে অংশের প্রাথমিক অবস্থা খুব সযত্নে নির্বাচনের প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং আমরা যদি ইচ্ছা

কবি তাহলে মহাবিশ্বকে এখন যেরকম দেখায় সেটা ব্যাখ্যা করার জন্য দুর্বল নরতীয় নীতি (weak anthropic principle) ব্যবহার করতে পারি। তবে এরকম কখনো হতে পারে না যে, যে কোনো প্রাথমিক আকৃতিই (configuration) আমরা যে রকম মহাবিশ্ব দেখছি তার পথিকৃৎ হতে পারত। বর্তমান কালের মহাবিশ্বের অত্যন্ত অন্যরকম অবস্থা (ধরুন— বিচ্ছিন্ন অত্যন্ত পিণ্ডাকৃতি এবং অসম— very lumpy and irregular) বিচার করে এটা দেখানো যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক বিধিগুলির সাহায্যে কালে মহাবিশ্বের অতীতমুখী বিবর্তন বিচার করে পূর্বতন যুগের আকৃতি নির্ধারণ করা যায়। চিরায়ত ব্যাপক অপেক্ষবাদের অনন্যতা উপপাদ্য (singularity theorem) অনুসারে এসত্ত্বেও একটি বৃহৎ বিস্ফোরণের অনন্যতা থাকতে হোত। আপনি যদি বিজ্ঞানের বিধি অনুসারে এই রকম একটি মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎকালের অভিমুখে বিবর্তন করান তাহলে যে বিচ্ছিন্ন পিণ্ডাকৃতি অসম মহাবিশ্ব নিয়ে আপনি শুরু করেছিলেন সেখানেই এসে পৌঁছে যাবেন। সুতরাং এমন প্রাথমিক আকৃতি নিশ্চয়ই থাকতে পারত যা থেকে আমরা আজ যে মহাবিশ্ব দেখছি সে রকম মহাবিশ্ব উৎপন্ন হোত না। সুতরাং প্রাথমিক আকৃতি কেন এরকম হয়নি, যার ফলে আমরা যা পর্যবেক্ষণ করছি তার চাইতে অত্যন্ত পৃথক কিছু সৃষ্টি হতে পারেনি, সে প্রশ্নের উত্তর অতিস্ফীতিমান প্রতিরূপও দিতে পারে না। তাহলে কি ব্যাখ্যার জন্য আমাদের নরতীয় নীতির আশ্রয় নিতে হবে? এটা কি তবে ছিল সৌভাগ্যজনক দৈব ঘটনা? এ যুক্তি মনে হয় নেহাৎই হতাশার—মহাবিশ্বের মূলগত বিন্যাস (underlying order) বোঝার সমস্ত আশা শেষ হয়ে যাওয়ার।

মহাবিশ্বের কিভাবে শুরু হওয়া উচিৎ ছিল সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে হলে এমন বৈজ্ঞানিক বিধি প্রয়োজন, যে বিধি কালের প্রারম্ভে সত্য ছিল। ব্যাপক অপেক্ষবাদের চিরায়ত তত্ত্ব যদি সত্য হয় তাহলে আমার এবং রজার পেনরোজের প্রমাণিত অনন্যতা উপপাদ্য থেকে দেখা যায় কালের প্রারম্ভ এমন একটি বিন্দু, যে বিন্দুতে ঘনত্ব ছিল অসীম এবং স্থান-কালের বক্রতাও ছিল অসীম। সে বিন্দুতে বিজ্ঞানের জানিত সমস্ত বিধিই ভেঙে পড়বে। অনুমান করা যেতে পারে অনন্যতার সময় নতুন বিধি ছিল কিন্তু যে সমস্ত বিন্দুর আচরণ এমন মন্দ যে সেই সমস্ত বিন্দুর বিধি গঠন করা খুবই কঠিন এবং সে বিধিগুলির কিরকম হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত আমরা পর্যবেক্ষণ থেকেও পাব না। কিন্তু আসলে অনন্যতা উপপাদ্যগুলির ইঙ্গিত হল মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এতই শক্তিশালী হয় যে কোয়ান্টাম মহাকর্ষীয় অভিক্রিয়াগুলি গুরুত্বলাভ করে: চিরায়ত তত্ত্ব আর মহাবিশ্বের বিবরণের পক্ষে উত্তম নয়। সুতরাং মহাবিশ্বের অতি আদিম অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে হলে কণাবাদী মহাকর্ষীয় তত্ত্ব ব্যবহার করতে হবে। আমরা দেখতে পাব কণাবাদী তত্ত্বে বিজ্ঞানের সাধারণ তত্ত্বগুলি সর্বত্র প্রযোজ্য হওয়া সম্ভব অর্থাৎ প্রযোজ্য হওয়া সম্ভব কালের প্রারম্ভেও। অনন্যতার জন্য নতুন বিধি প্রণয়ন প্রয়োজন হয় না কারণ কোয়ান্টাম তত্ত্বে অনন্যতার কোনো প্রয়োজন নেই।

কণাবাদী বলবিদ্যা (quantum mechanics) এবং মহাকর্ষকে যুক্ত করে, সম্পূর্ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ এরকম তত্ত্ব এখন পর্যন্ত আমাদের নেই। কিন্তু এই রকম একটি ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের অবয়বে কি থাকা উচিৎ তার কিছু কিছু সম্পর্কে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত। একটি

হল— ফেনম্যানের (Feynman) প্রস্তাবকে এ তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ প্রস্তাব অনুসারে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে বহু ইতিহাসের যোগফলের বাখিধিতে গঠন করতে হবে। চিরায়ত তত্ত্ব অনুসারে একটি কণিকার একটিই ইতিহাস থাকে কিন্তু ফেনম্যানের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে কণিকার ইতিহাস একটি মাত্র নয়। তার বদলে অনুমান করা হয় কণিকাটি স্থান-কালের সম্ভাব্য সমস্ত পথই অনুসরণ করে এবং এর প্রতিটি ইতিহাসের সঙ্গেই জড়িত রয়েছে দুটি সংখ্যা। একটি প্রকাশ করে তরঙ্গের আয়তন (size), অন্যটি প্রকাশ করে চক্রের ভিতরে (in the cycle) তার অবস্থান (এর দশা- its phase)। ধরুন কোনো বিশেষ বিন্দুর ভিতর দিয়ে কণিকাটি গমন করার সম্ভাব্যতা, এই সম্ভাব্যতা পাওয়া যায় ঐ বিন্দুর ভিতর দিয়ে গমনকারী সম্ভাব্য সমস্ত ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তরঙ্গগুলির যোগফল দিয়ে। কিন্তু এই অঙ্কগুলি করতে গেলে প্রযুক্তির দিক থেকে কঠিন অসুবিধায় পড়তে হয়। অসুবিধা এড়ানোর একমাত্র পথ হল নিম্নলিখিত অদ্ভুত ব্যবস্থাপত্র: সেই সমস্ত কণিকা ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তরঙ্গ যোগফল নিতে হবে যেগুলির অস্তিত্ব আমার আপনার পরিচিত "বাস্তব" (real) কালে নয়। সেগুলির অস্তিত্ব, যাকে বলা হয় কাল্পনিক (imaginary) কাল, সেই কালে। কাল্পনিক কাল কথাটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর মতো শোনাতে পারে, কিন্তু আসলে এটি একটি সুসংজ্ঞিত গাণিতিক চিন্তন। আমরা যদি একটি সাধারণ সংখ্যা (বাস্তব) নিয়ে সংখ্যাটিকে সেই সংখ্যার সঙ্গেই গুণ করি তাহলে গুণফল হবে একটি পরা সংখ্যা (positive number)। (উদাহরণ: দুই দুগুণে চার কিন্তু -২ (-দুই) কে -২ (-দুই) দিয়ে গুণ করলেও চার হয়)। তবে কতকগুলি বিশেষ সংখ্যা আছে (সেগুলিকে বলা হয় কাল্পনিক) সেগুলিকে সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ দিলে অপরা (negative) সংখ্যা হয়। (একটির নাম i, সেটিকে ঐ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণফল হয়—১, ২iকে ২i দিয়ে গুণ করলে গুণফল হয় ৪, এইরকম)। ফেনম্যানের ইতিহাসের যোগফলের প্রযুক্তিভিত্তিক অসুবিধা এড়ানোর জন্য কাল্পনিক কাল ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ কাল বাস্তব সংখ্যা দিয়ে না মেপে মাপতে হবে কাল্পনিক সংখ্যা দিয়েই। স্থান-কালের উপর এর ক্রিয়া আকর্ষণীয়: স্থান এবং কালের ভিতর পার্থক্য সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়। যে স্থান-কালের কালিক স্থানাঙ্ক (time coordinate) কাল্পনিক, তাকে বলা হয় ইউক্লিডীয়। দ্বিমাত্রিক তলের জ্যামিতির প্রতিষ্ঠাতা গ্রীক ইউক্লিডের নামে এই নাম। এখন আমরা যাকে ইউক্লিডীয় স্থান-কাল বলি তার সঙ্গে এর খুবই মিল, শুধুমাত্র দুই মাত্রার বদলে এতে রয়েছে চার মাত্রা (four dimensions)। ইউক্লিডীয় স্থান-কালে কালের অভিমুখ এবং স্থানের অভিমুখগুলির ভিতরে কোনো পার্থক্য নেই। অন্য দিকে বাস্তব স্থান-কালে যেখানে ঘটনাগুলি কালিক স্থানাঙ্কের সাধারণ বাস্তব মান (real values) দিয়ে চিহ্নিত, সেখানে পার্থক্য নির্ধারণ করা সহজ— সমস্ত বিন্দুতেই সময়ের অভিমুখ থাকবে আলোক শঙ্কুর (light cone) ভিতরে এবং স্থানের অভিমুখগুলি থাকবে তার বাইরে। সে যাই হোক, দৈনন্দিন কণাবাদী বলবিদ্যা অনুসারে এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে আমাদের কাল্পনিক সময় এবং ইউক্লিডীয় স্থান-কাল ব্যবহার বাস্তব স্থান-কাল সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার একটি গাণিতিক কৌশল (কিম্বা চালাকি- trick) মাত্র।

আমাদের বিশ্বাস চূড়ান্ত তত্ত্বের দ্বিতীয় একটি অংশ অবশ্যই হবে আইনস্টাইনের এই চিন্তাধারা যে বঙ্কিম স্থান-কাল মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের প্রতিনিধি; বঙ্কিম স্থানে কণাগুলি অনুসরণ করে ঋজুপথের নিকটতম একটা কিছু কিন্তু যেহেতু স্থান-কাল সমতল (flat) নয়, সেইজন্য মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের জন্যই যেন তাদের পথগুলিকে বঙ্কিম দেখায়। মহাকর্ষ সম্পর্কে আইনস্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ফেনম্যানের ইতিহাসগুলির যোগফল প্রয়োগ করলে কণিকার ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় সম্পূর্ণ বঙ্কিম স্থান-কালের সদৃশ (analogue)— সেটাই সমগ্র মহাবিশ্বের ইতিহাসের প্রতিরূপ। কার্যক্ষেত্রে ইতিহাসগুলিকে যোগ করার প্রযুক্তিগত অসুবিধা এড়ানোর জন্য এই বঙ্কিম স্থান-কালকে ইউক্লিডীয় বলে মেনে নেওয়া আবশ্যিক। অর্থাৎ কাল কাল্পনিক এবং স্থানের অভিমুখের সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য করা সম্ভব নয়। একটি বিশেষ ধর্ম সমন্বিত (যথা— প্রতিটি বিন্দুতে এবং প্রতিটি অভিমুখে একই রকম দেখাবে) বাস্তব স্থান-কাল পাওয়ার সম্ভাবনা খুঁজতে গেলে যাদের এই রকম ধর্ম আছে সেই রকম ইতিহাসগুলির সঙ্গে সংযুক্ত সমস্ত তরঙ্গের যোগফল বার করতে হবে।

ব্যাপক অপেক্ষবাদের চিরায়ত তত্ত্বে সম্ভাব্য নানা বিভিন্ন বঙ্কিম স্থান-কাল রয়েছে, এগুলির প্রতিটি, মহাবিশ্বের সম্ভাব্য বিভিন্ন প্রাথমিক অবস্থার অনুরূপ। মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা যদি আমাদের জানা থাকত তাহলে তার সম্পূর্ণ ইতিহাসটিই আমরা জানতাম। অনুরূপ ভাবে মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্বে মহাবিশ্বের সম্ভাব্য বিভিন্ন কোয়ান্টাম অবস্থা রয়েছে। তাছাড়া আমাদের যদি জানা থাকত ইতিহাসগুলির ভিতরে ইউক্লিডীয় বঙ্কিম স্থান-কালের আদিম যুগে আচরণ কি ছিল তাহলে আমরা মহাবিশ্বের কোয়ান্টাম অবস্থা জানতে পারতাম।

চিরায়ত মহাকর্ষীয় তত্ত্বের ভিত্তি বাস্তব স্থান-কাল, সে তত্ত্বে মহাবিশ্বের আচরণের দুটি মাত্র সম্ভাব্য পথ রয়েছে: হয় এর অস্তিত্ব রয়েছে অনন্তকাল থেকে নয়তো অতীতের কোনো সীমিতকালে এক অনন্যতা থেকে এর শুরু। অন্যদিকে মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্বে একটি তৃতীয় সম্ভাবনা দেখা দেয়। যে ইউক্লিডীয় স্থান-কাল ব্যবহার করা হচ্ছে সে স্থান-কালে সময়ের অভিমুখ এবং কালের অভিমুখ একই, সুতরাং স্থান-কালের বিস্তার সীমিত হলেও একটি অনন্যতা দিয়ে তার সীমানা কিম্বা কিনারা না হতে পারে। স্থান-কাল হবে ধরাপৃষ্ঠের মতো, শুধুমাত্র দুটি মাত্রা (dimension) বেশী থাকবে। ধরাপৃষ্ঠ বিস্তারের দিক দিয়ে সীমিত কিন্তু তার কোনো সীমানা কিম্বা কিনারা নেই। আপনি যদি জাহাজে করে সূর্যাস্তের ভিতরে ঢুকে পড়েন তাহলে আপনি পৃথিবীর কিনারা দিয়ে পড়ে যাবেন না কিম্বা একটি অনন্যতায় ঢুকে পড়বেন না (আমি সারা পৃথিবী ঘুরেছি, সেইজন্য আমি জানি!)

ইউক্লিডীয় স্থান-কাল যদি কাল্পনিক সীমাহীন অতীতে বিস্তৃত হয় কিম্বা যদি কাল্পনিক কালের একটি অনন্যতায় শুরু হয়, তাহলেও আমাদের চিরায়ত তত্ত্বের মতো একই সমস্যা দেখা যায় অর্থাৎ মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা নির্দিষ্টরূপে নির্দেশ (specifying) করা: ঈশ্বর হয়তো জানেন মহাবিশ্ব কিভাবে শুরু হয়েছিল কিন্তু মহাবিশ্ব একভাবে শুরু না হয়ে কেন অন্যভাবে শুরু হয়েছিল সেটা বিচার করার বিশেষ কোনো কারণ আমরা দেখাতে পারব না। অন্যদিকে মহাকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্ব একটি নতুন সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে। এ সম্ভাবনায়

স্থান-কালের কোনো সীমানা থাকবে না, সুতরাং সীমানার আচরণ নির্দিষ্ট করারও কোনো প্রয়োজন থাকবে না। সে ক্ষেত্রে এমন কোনো অনন্যতা থাকবে না যেখানে বিজ্ঞানের বিধি ভেঙে পড়েছিল এবং স্থান-কালের এমন কোনো কিনারা (edge) থাকবে না যেখানে স্থান-কালের সীমানা স্থির করার জন্য ঈশ্বর কিম্বা অন্য কোনো বিধির দ্বারস্থ হতে হবে। বলা যেতে পারে "মহাবিশ্বের সীমান্তের অবস্থা হল কোনো সীমান্তের অনস্তিত্ব।" মহাবিশ্ব হবে সম্পূর্ণ আত্মঅন্তর্ভুক্ত (selfcontained) এবং বাইরের কিছু দিয়ে প্রভাবিত নয়। এটা সৃষ্টও হবে না ধ্বংসও হবে না। এটা শুধুমাত্র থাকবে।

ভাটিকানের যে কনফারেন্সের কথা এর আগে উল্লেখ করেছি সেই কনফারেন্সে আমি প্রস্তাব উত্থাপন করি যে, হয়তো স্থান আর কাল মিলিয়ে এমন একটি তল (surface) গঠন করেছে যেটা আয়তনে সীমিত কিন্তু তার কোনো সীমানা কিম্বা কিনারা নেই। আমার গবেষণাপত্রটি ছিল একটু গাণিতিক, সেইজন্য মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে ঈশ্বরের ভূমিকা সম্পর্কে তার ফলশ্রুতি সে সময় সাধারণ ভাবে বোঝানো হয় নি (আমার পক্ষে ভালই হয়েছিল)। ভাটিকান কনফারেন্সের সময় মহাবিশ্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য "সীমানাহীনতার" চিন্তাধারা কি করে ব্যবহার করা যায় সেটা আমার জানা ছিল না। যাই হোক, পরবর্তী গ্রীষ্মকালটা আমি কাটাই ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্টা বারবারায় (Santa Barbara)। সেখানে আমি এবং জিম হার্টল (Jim Hartle) নামে আমার একজন বন্ধু এবং সহকর্মী একসঙ্গে গবেষণা করি। গবেষণার বিষয় ছিল: যদি স্থান-কালের সীমানা না থাকে তাহলে মহাবিশ্বের কি কি সর্ত পালন করতে হবে? কেম্ব্রিজে ফেরার পর জুলিয়ান লুট্রেল (Julian Luttrell) এবং জোনাথান হ্যালিওয়েল (Jonathan Halliwell) নামে আমার দুজন গবেষণাকারী ছাত্রের সঙ্গে আমি এই গবেষণা চালিয়ে যাই।

আমি জোরের সঙ্গে বলতে চাই স্থান এবং কাল সীমিত কিন্তু তার কোনো সীমানা নেই এই ধারণা একটি প্রস্তাব মাত্র: অন্য কোনো নীতি থেকে অবরোহী পদ্ধতিতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। যে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মতোই প্রথমে এ প্রস্তাব হয়তো করা হয়েছিল সৌন্দর্য কিম্বা অধিবিদ্যামূলক কারণে কিন্তু পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে কি না সেটাই তত্ত্বের আসল পরীক্ষা। তবে কোয়ান্টাম মহাকর্ষের ক্ষেত্রে দুটি কারণে এটা নির্ণয় করা কঠিন। প্রথমত (এটা ব্যাখ্যা করা হবে পরের অধ্যায়ে) কোন তত্ত্ব কলাবাদী বলবিদ্যা এবং ব্যাপক অপেক্ষবাদ সাফল্যের সঙ্গে সমন্বয় করে, সে বিষয়ে আমরা এখনও নিশ্চিত নই। কিন্তু সেরকম একটি তত্ত্বের অবয়ব কি রকম হতেই হবে সে সম্পর্কে আমরা অনেকটাই জানি। দ্বিতীয়ত সমগ্র মহাবিশ্বের বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিতে পারে এরকম প্রতিরূপ আমাদের পক্ষে গাণিতিক ভাবে এমন জটিল হবে যে আমরা নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী গণনা করতে পারব না। সুতরাং আমাদের করতে হবে সরলীকরণ করতে পারে এরকম অনুমান এবং আসন্নতা (approximation)। কিন্তু তবুও ভবিষ্যদ্বাণী বার করা হবে অতীব দুরূহ।

ইতিহাসগুলির যোগফলের প্রতিটি ইতিহাস শুধু স্থান-কালের বিবরণই দেবে না—

বিবরণ দেখে তার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি জিনিষেরই। তার ভিতরে মানুষের মতো জটিল জীবও থাকবে অর্থাৎ এমন জীব যারা মহাবিশ্বের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এটা নরস্থীয় নীতির সপক্ষে আর একটি যুক্তি হতে পারে। কারণ যদি সবকটি ইতিহাসই সম্ভব হয় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত ইতিহাসগুলির একটিতে আমাদের অস্তিত্ব রয়েছে– ততক্ষণ পর্যন্ত মহাবিশ্ব যে অবস্থায় রয়েছে সে অবস্থা ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা নরস্থীয় নীতি ব্যবহার করতে পারি। যে ইতিহাসগুলিতে আমাদের অস্তিত্ব নেই সেগুলিতে ঠিক কি অর্থ আরোপ করা যেতে পারে সেটা স্পষ্ট নয়। যদি ইতিহাসগুলির যোগফলের সাহায্যে দেখানো যেত যে আমাদের মহাবিশ্ব শুধুমাত্র সম্ভাব্য ইতিহাসগুলির একটি নয়, এটা সবচাইতে সম্ভাব্যগুলির একটি, তাহলে মহাকর্ষের ফলাবাদী তত্ত্ব সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি আরও অনেক বেশী সন্তোষজনক হোত। এই কাজ করার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত সীমানাবিহীন ইউক্লিডীয় স্থান-কালের ইতিহাসের যোগফল বার করতে হবে।

সীমানাহীনতার প্রস্তাব থেকে জানা যায় মহাবিশ্বের সম্ভাব্য প্রতিটি ইতিহাস অনুসরণ করার সম্ভাবনা অতি সামান্য, তবে ইতিহাসগুলির একটি বিশেষ গোষ্ঠী আছে যার সম্ভাবনা অন্যগুলির তুলনায় অনেক বেশী। এই ইতিহাসগুলিকে অনেকটা কল্পনা করা যায় ভূপৃষ্ঠের মতো– উত্তর মেরু থেকে দূরত্ব কাল্পনিক কালের প্রতিরূপ এবং উত্তর মেরু থেকে স্থির দূরত্ব বিশিষ্ট একটি বৃত্তের আয়তন মহাবিশ্বের স্থানিক আয়তনের প্রতিরূপ। উত্তর মেরুতে একক একটি বিন্দুরূপে মহাবিশ্বের আরম্ভ। সেখান থেকে যত দক্ষিণে যাওয়া যাবে উত্তর মেরু থেকে স্থির দূরত্বে অক্ষাংশের (latitude) বৃত্তগুলি ততই বৃহত্তর হবে। এটা হবে কাল্পনিক সময়ের সঙ্গে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের অনুরূপ (চিত্র–৮.১)। বিষুবরেখায় মহাবিশ্বের আয়তন হবে বৃহত্তম এবং কাল্পনিক সময় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্কুচিত হতে হতে দক্ষিণ মেরুতে এসে একটি মাত্র বিন্দুতে পরিণত হবে। উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুতে মহাবিশ্বের আয়তন শূন্য হলেও এই বিন্দুগুলি অনন্য (singularities) হোত না। পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু যতটা অনন্য তার চাইতে বেশী কিছু নয়। উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু সাপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বিধিগুলি যেমন সত্য, ওগুলি সাপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বিধিগুলি তেমনি সত্য হবে।

কিন্তু বাস্তব কালে মহাবিশ্বের ইতিহাস বেশ অন্যরকম দেখাবে। এক হাজার কিম্বা দু'হাজার কোটি বছর আগে এর আয়তন হত সর্বনিম্ন। সেটি হোত কাল্পনিক কালের ইতিহাসের সর্বোচ্চ ব্যাসার্ধের সমান। পরবর্তী বাস্তব কালে মহাবিশ্ব লিন্ডে (Linde) প্রস্তাবিত শৃঙ্খলাহীন অতি স্ফীতিমান প্রতিরূপের অনুরূপ সম্প্রসারিত হবে (কিন্তু মহাবিশ্ব কোনোক্রমে সঠিক অবস্থায় সৃষ্ট হয়েছিল এরকম অনুমান করার প্রয়োজন এক্ষেত্রে হবে না)। মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতে হতে বিরাট আয়তন প্রাপ্ত হবে এবং তারপর আবার চুপসে যাবে। সেটি দেখাবে অনেকটা বাস্তব কালের অনন্যতার মতো। সুতরাং এক অর্থে, কৃষ্ণগহ্বর থেকে দূরে থাকলেও আমাদের সবারই মৃত্যু অবধারিত। মহাবিশ্ব শুধুমাত্র যদি কাল্পনিক কালের বাস্তিথিতে কল্পিত হয় তাহলেই কোনো অনন্যতা থাকবে না।

মহাবিশ্ব যদি বাস্তবিকই এরকম একটি ফলাবাদী অবস্থায় থাকে তাহলে কাল্পনিক কালে

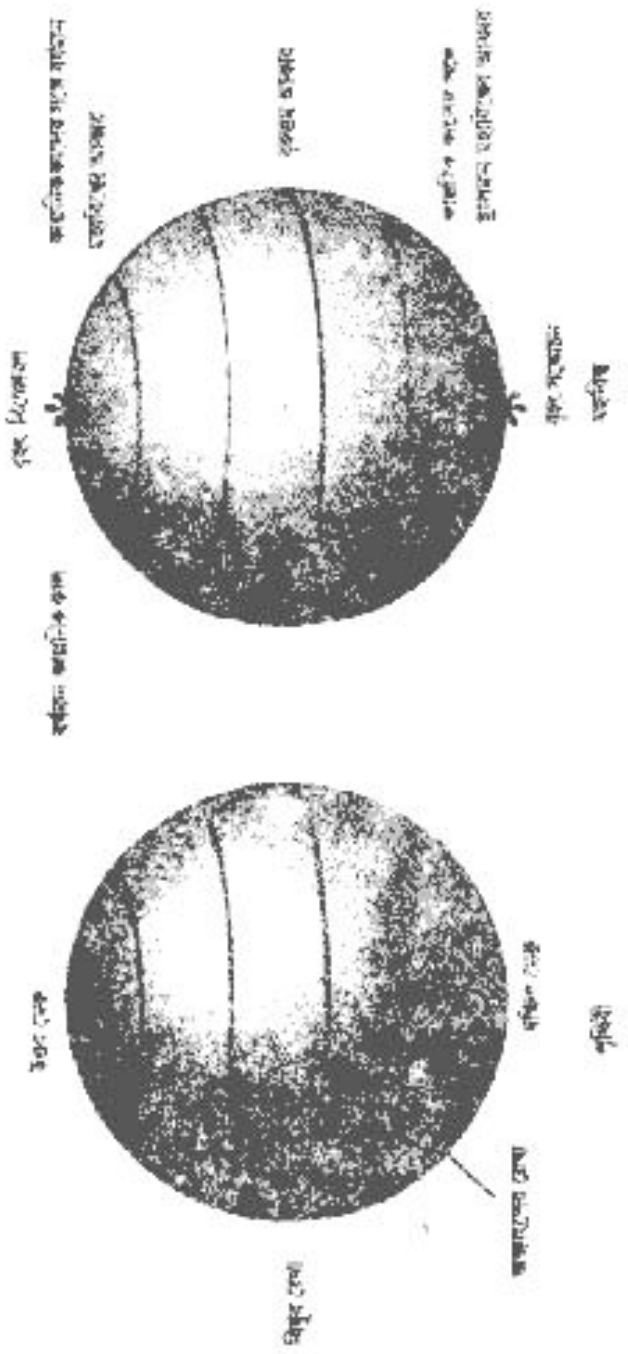

চিত্র - ৮.১

মহাবিশ্বের ইতিহাসে কোনো অনন্যতা থাকবে না। সুতরাং মনে হতে পারে আমার আধুনিকতর গবেষণা আমার অনন্যতা বিষয়ে পূর্বতন গবেষণাগুলিকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু অনন্যতা উপপাদ্যগুলির বাস্তব গুরুত্ব ছিল: তারা দেখিয়েছে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রগুলি অবশ্যই এত শক্তিশালী হোত যে কণাবাদী মহাকর্ষীয় অভিক্রিয়াকে(quantum gravitational effect) অগ্রাহ্য করা যেত না। এরকম ইঙ্গিত আগে দেওয়া হয়েছে। কাল্পনিক কালে মহাবিশ্ব সীমানাহীন কিম্বা অনন্যতাহীন হলেও সীমিত হতে পারে এই ধারণার পথিকৃৎ পূর্বোক্ত চিন্তাধারা। যে বাস্তব কালে আমরা বাস করি সেই বাস্তব কালে ফিরে এলে কিন্তু তখনও অনন্যতার অস্তিত্ব থাকবে বলে মনে হয়। যে মহাকাশচারী বেচারা কৃষ্ণগহ্বরে পড়বে তখনও তার চটচটে (sticky) মৃত্যুই হবে। শুধুমাত্র কাল্পনিক কালে বাস করলেই তার কোনো অনন্যতার সঙ্গে দেখা হবে না।

এ থেকে মনে হতে পারে তথাকথিত কাল্পনিক কালই আসলে বাস্তব কাল যার যাকে আমরা বাস্তব কাল বলি সেটা আমাদের কল্পনার উদ্ভাবন। বাস্তব কালে অনন্যতাগুলির ভিতরে মহাবিশ্বের শুরু আর শেষ রয়েছে। এই অনন্যতাগুলিই স্থান-কালের সীমানা এবং এখানে বিজ্ঞানের বিধিগুলি ভেঙে পড়ে। কিন্তু কাল্পনিক কালে কোনো অনন্যতা কিম্বা সীমানা নেই। সেইজন্য আমরা যাকে কাল্পনিক কাল বলি হয়তো সেটাই আরো বেশী মূলগত (more basic), হয়তো যাকে আমরা বাস্তব বলি সেটা একটি চিন্তন মাত্র। সে চিন্তনকে আমরা আবিষ্কার করি মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের চিন্তনের বিবরণ দেওয়ার জন্য। কিন্তু প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত প্রথম মত অনুসারে– বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব একটি গাণিতিক প্রতিরূপ মাত্র। এগুলি আমরা তৈরী করি আমাদের পর্যবেক্ষণের বিবরণ দেওয়ার জন্য। তত্ত্বের অস্তিত্ব শুধুমাত্র আমাদের মনে। সুতরাং কোনটা বাস্তব কোনটা বাস্তব কাল কিম্বা কোনটা কাল্পনিক কাল—এসমস্ত প্রশ্ন অর্থহীন। কোন বিবরণটি বেশী কার্যকর সেটাই একমাত্র বিচার্য বিষয়।

মহাবিশ্বের কোন কোন ধর্ম একসঙ্গে বর্তমান থাকতে পারে সেটা নির্ধারণ করার জন্য সীমানাহীনতার প্রস্তাবের সঙ্গে ইতিহাসগুলির যোগফল একসঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণ: যখন মহাবিশ্বের ঘনত্বের বর্তমান মূল্যাঙ্ক রয়েছে তখন মহাবিশ্বের প্রায় এক হারে প্রত্যেক বিভিন্ন দিকে যুগপৎ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা গণনা করা যেতে পারে। এ পর্যন্ত যে কটা সরলীকৃত প্রতিরূপ নিয়ে গবেষণা হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এ সম্ভাবনা বেশী। অর্থাৎ মহাবিশ্বের বর্তমান সম্প্রসারণের হার সর্বদিকেই প্রায় সমান হওয়ার সম্ভাবনা অত্যধিক: এই ভবিষ্যদ্বাণীর পথিকৃৎ হল প্রস্তাবিত সীমানাহীনতার অবস্থা। এই সম্ভাবনার সঙ্গে মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের পশ্চাৎপটের সঙ্গতি রয়েছে। এ থেকে দেখা যায়: যে কোনো অভিমুখেই এই বিকিরণের তীব্রতা প্রায় নির্ভুলভাবে সমান। যদি মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ কতগুলি অভিমুখের তুলনায় অন্য কোনো কোনো অভিমুখে দ্রুততর হোত তাহলে ঐ সমস্ত অভিমুখে বিকিরণের তীব্রতা কম হোত। হ্রাসের পরিমাণ হোত একটি বাড়তি লোহিত বিচ্যুতি (by an additional red shift)।

সীমানাহীন অবস্থা সাপেক্ষ অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে বর্তমানে কাজ চলছে। আদিম মহাবিশ্বের একরূপ ঘনত্ব থেকে যে সমস্ত সামান্য বিচ্যুতির ফলে প্রথমে নীহারিকা, তার

পর তারকা এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের উদ্ভব হয়েছে সেগুলির পরিমাণ এক বিশেষ আকর্ষণীয় সমস্যা। আদিম মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ একরূপ হতে পারত না, তার কারণ কণিকাগুলির অবস্থান এবং গতিবেগে (velocity) কিছু অনিশ্চয়তা এবং হ্রাসবৃদ্ধি থাকতেই হোত: অনিশ্চয়তার নীতির ভিতরেই এ তথ্য নিহিত আছে। সীমানাহীন অবস্থা বিচার করে আমরা জানতে পারি– আসলে মহাবিশ্ব নিশ্চয়ই শুরু হয়েছিল অনিশ্চয়তার নীতি অনুমোদিত সম্ভাব্য সর্বনিম্ন বিচ্যুতি দিয়ে। তারপর মহাবিশ্ব কিছুকাল অতিস্ফীতিমান প্রতিরূপে যে রকম অনুমান করা হয়েছে সেই রকম দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছিল। এই যুগে মহাবিশ্বের প্রাথমিক একরূপত্বের অভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে, যা আমাদের সর্বদিকে পর্যবেক্ষণ করা গঠনগুলির উদ্ভব (origin of the structures) ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। যে সম্প্রসারণমান মহাবিশ্বে স্থান থেকে স্থানান্তরে পদার্থের ঘনত্বের সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি হয়, সেখানে মহাকর্ষের ক্রিয়ায় ঘনতর অঞ্চলের সম্প্রসারণ শ্লথতর হবে এবং সে অঞ্চলগুলির সঙ্কোচন শুরু হবে। এর ফলে গঠিত হবে নীহারিকা, তারকা এবং শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি হবে আমাদের মতো নগণ্য জীব! সেইজন্য আমরা যে সমস্ত জটিল গঠন দেখতে পাই সেগুলি মহাবিশ্বের সীমানাহীন অবস্থা এবং কণাবাদী বলবিদ্যার অনিশ্চয়তার নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

স্থান এবং কাল একটি সীমানাহীন বদ্ধ পৃষ্ঠ (closed surface) গঠন করতে পারে: মহাবিশ্বের ব্যাপারে ঈশ্বরের ভূমিকা বিষয়ে এই চিন্তনের ফলশ্রুতি হতে পারে গভীর। ঘটনাবলী ব্যাখ্যায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির সাফল্যের ফলে অধিকাংশ লোকই এখন বিশ্বাস করেন ঈশ্বর একগুচ্ছ বিধি অনুসারে মহাবিশ্বের বিবর্তন অনুমোদন করেন এবং এই বিধি ভঙ্গ করে তিনি মহাবিশ্বে হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু শুরুতে মহাবিশ্বের চেহারা কি রকম ছিল সে বিষয়ে বিধিগুলি কিছুই বলে না। এই ঘড়ির মতো গতি বন্ধ করা ঈশ্বরেরই দায়িত্ব এবং কি করে এটি আবার শুরু করবেন সে পদ্ধতি নির্বাচনের দায়িত্বও ঈশ্বরেরই। যতক্ষণ পর্যন্ত মহাবিশ্বের শুরু ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অনুমান করতে পারতাম মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টাও ছিল। কিন্তু মহাবিশ্ব যদি সত্যিই পূর্ণরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় এবং যদি এর কোনো সীমানা কিম্বা কিনারা না থাকে, তাহলে এর আদিও থাকবে না, অন্তও থাকবে না– থাকবে শুধু অস্তিত্ব। তাহলে স্রষ্টার স্থান কোথায়?

৯

সময়ের তীর

(The Arrow of Time)

আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখেছি কালের ধর্ম সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে সময়ের সঙ্গে বদলেছে। এই শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত লোকের বিশ্বাস ছিল পরম কালে। অর্থাৎ প্রতিটি ঘটনাকেই "কাল" নামক একটি বিশেষ সংখ্যা দ্বারা অনন্য উপায়ে চিহ্নিত করা যায় এবং বিশ্বাস ছিল দুটি ঘটনার অন্তর্বর্তী কাল বিষয়ে প্রতিটি ভাল ঘড়িরই মতৈক্য থাকবে। কিন্তু পর্যবেক্ষক যে ভাবেই চলমান হোন না কেন আলোকের গতি সব সময় প্রতিটি পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ একই মনে হবে—এই আবিষ্কার অপেক্ষবাদের পথ দেখাল এবং তার ফলে অনন্য পরম কাল সম্পর্কিত চিন্তাধারা পরিত্যাগ করতে হল। তার বদলে ধারণা হল প্রতিটি পর্যবেক্ষকেরই কালের মাপন হবে তার নিজস্ব এবং সেটা চিহ্নিত হবে তিনি যে ঘড়ি বহন করছেন তার সাহায্যে। বিভিন্ন পর্যবেক্ষকের বহন করা নিজস্ব ঘড়িতে সব সময় মতৈক্য থাকবে তার কোনো অর্থ নেই। সুতরাং কাল হয়ে দাঁড়াল একটি আরও ব্যক্তিগত ধারণা এবং সে ধারণা যে পর্যবেক্ষক মাপছেন সেই পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ।

মহাকর্ষের সঙ্গে কণাবাদী কলবিদ্যা মেলানোর চেষ্টার ফলে 'কাল্পনিক' কাল সম্পর্কিত চিন্তন উপস্থিত করতে হয়েছে। কাল্পনিক কালের সঙ্গে স্থানে অভিমুখের পার্থক্য করা সম্ভব নয়। কেউ উত্তরে গেলে—অভিমুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তিনি দক্ষিণেও যেতে পারেন। কেউ যদি কাল্পনিক কালে সম্মুখে যেতে পারেন তাহলে অভিমুখ ঘুরিয়ে তাঁর পশ্চাতে যাওয়াও সম্ভব হওয়া উচিত। এর অর্থ, কাল্পনিক কালে অগ্র পশ্চাৎ অভিমুখের ভিতরে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য থাকা সম্ভব নয়। অন্য দিকে 'বাস্তব' কালের অভিমুখে দৃষ্টি দিলে অগ্র পশ্চাৎ অভিমুখের ভিতরে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। আমরা সবাই একথা জানি। অতীত এবং ভবিষ্যতের এই

পার্থক্যের উৎস কি ? কেন আমরা অতীতকে মনে রাখি কিন্তু ভবিষ্যৎকে মনে রাখি না ?

বিজ্ঞানের বিধিগুলি অতীত এবং ভবিষ্যতের ভিতরে কোনো পার্থক্য স্বীকার করে না। আগের ব্যাখ্যা মতো আরও সঠিকভাবে বলা যায় C, P, এবং T-এর সমন্বয় ক্রিয়াতে (কিম্বা প্রতিসাম্যে—symmetries) বিজ্ঞানের বিধিগুলি অপরিবর্তিত থাকে। (C-এর অর্থ কণিকার বিপরীত কণিকায় পরিবর্তন, P-এর অর্থ দর্পণ প্রতিবিম্ব গ্রহণ—অর্থাৎ বাম এবং ডানের পরস্পরে পরিবর্তন, এবং T-এর অর্থ সমস্ত কণিকার গতির অভিমুখ বিপরীত করা : কার্যত কণিকার গতিকে পশ্চাৎমুখী করা)। C এবং P-নামক দুটি ক্রিয়া স্বকৃতভাবে সমন্বিত হলেও সমস্ত স্বাভাবিক অবস্থায় বিজ্ঞানের যে বিধিগুলি পদার্থের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলি অপরিবর্তিত থাকে। অন্যভাবে বলা যায় অন্য একটি গ্রহের অধিবাসীরা যদি আমাদের দর্পণ প্রতিবিম্ব হয় এবং যদি পদার্থ দিয়ে গঠিত না হয়ে বিপরীত পদার্থ দিয়ে গঠিত হয় তাহলেও তাদের জীবন একই রকম হবে।

C এবং P ক্রিয়া আর CP এবং T ক্রিয়ার সমন্বয়ে যদি বিজ্ঞানের বিধিগুলি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে শুধুমাত্র T ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সেগুলি অপরিবর্তিত থাকবে। তবুও সাধারণ জীবনে বাস্তব কালের ক্ষেত্রে অগ্র পশ্চাৎ অভিমুখে একটি বিরাট পার্থক্য থাকে। কল্পনা করুন টেবিল থেকে একটি জলের পেয়ালা মেঝেতে পড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এর একটি আলোকচিত্র নিলে আপনি সহজেই বলতে পারবেন চিত্রটি অগ্রগামী না পশ্চাৎগামী। আপনি অতীতের দিকে চালনা করলে দেখবেন টুকরোগুলি মেঝে থেকে হঠাৎ একত্রিত হয়ে লাফিয়ে টেবিলের উপর উঠে একটি সম্পূর্ণ পেয়ালা হয়ে গিয়েছে। আপনি বলতে পারবেন আলোকচিত্রটি পশ্চাৎগামী, কারণ এরকম আচরণ সাধারণ জীবনে কখনোই দেখা যায় না। এরকম হলে যারা চীনামাটির বাসনপত্র তৈরী করে তাদের ব্যবসা উঠে যেত।

পেয়ালার ভাঙা টুকরোগুলি মেঝেতে একত্র হয়ে কেন আবার টেবিলে ওঠে না, তার কারণ সাধারণত দেখানো হয় : তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় বিধি অনুসারে এটা নিষিদ্ধ। এই বিধি অনুসারে যে কোনো বদ্ধ তন্ত্রে (closed system) কালের সঙ্গে সঙ্গে বিশৃঙ্খল (entropy) সবসময়ই বৃদ্ধি পায়। অন্য কথায় বলা যায়, এটা এক ধরনের মারফির বিধি (Murphy's law)। জিনিষপত্র সব সময়েই গোলমাল হয়ে যেতে চায়। টেবিলের উপরের না ভাঙা পেয়ালাটি একটি সুন্দরের সংগঠিত অবস্থা ; মেঝের উপরের ভাঙা পেয়ালাটি একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা। টেবিলের উপরের অতীতের পেয়ালা থেকে মেঝের উপরের ভবিষ্যতের ভাঙা পেয়ালায় স্বচ্ছন্দেই যাওয়া যায় কিন্তু উল্টো দিকে যাওয়া যায় না।

তথাকথিত কালের তীরের একটি উদাহরণ হল কালের সঙ্গে বিশৃঙ্খলা (এনট্রপি -- entropy) বৃদ্ধি। এই কালের তীর অতীত আর ভবিষ্যতের পার্থক্য আনে, কালকে একটি অভিমুখ দান করে। অন্ততপক্ষে তিনটি বিভিন্ন কালের তীর রয়েছে। প্রথমটি তাপগতীয় (thermo-dynamic) কালের তীর—অর্থাৎ কালের যে অভিমুখে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক কালের তীর (psychological arrow of time) । এটা হল সেই অভিমুখ—যে অভিমুখে আমরা কালের স্রোত বোধ করি— যে অভিমুখে অতীত স্মরণ করি কিন্তু ভবিষ্যৎ স্মরণ করি না। আর অন্তিমে রয়েছে মহাবিশ্বতত্ত্বভিত্তিক

(cosmological) কালের তীর। মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত না হয়ে যে অভিমুখে সম্প্রসারিত হচ্ছে এটা হল সেই অভিমুখ।

মহাবিশ্বের সীমানাহীনতার অবস্থার সঙ্গে দুর্বল নরতীয় নীতি যুক্ত করলে তিনটি তীরের কেন একই অভিমুখ—সেটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তাছাড়া ব্যাখ্যা করা যেতে পারে কেনই বা একটি ভাল সংজ্ঞাবিশিষ্ট কালের তীর থাকবে। এই অধ্যায়ে আমি সেই তথ্যের সমর্থনে যুক্তি দেখাব। আমার যুক্তি হবে তাপগতীয় তীর নির্ধারণ করে মনস্তাত্ত্বিক তীর এবং এই দুটি তীরের অভিমুখ অবশ্যম্ভাবী রূপে সব সময় অভিন্ন। যদি মহাবিশ্বের সীমানাহীন অবস্থা মেনে নেওয়া হয় তাহলে আমরা দেখব সুসংজ্ঞিত তাপগতীয় এবং মহাবিশ্বতত্ত্বভিত্তিক কালের তীর অবশ্যই থাকবে কিন্তু মহাবিশ্বের ইতিহাসের সমগ্রকালে তাদের অভিমুখ এক থাকবে না। কিন্তু আমার যুক্তি হবে—যখন তাদের অভিমুখ অভিন্ন হয় একমাত্র তখনই এই প্রশ্ন করার উপযুক্ত বুদ্ধিমান জীব বিকাশের উপযুক্ত অবস্থা হয় : কালের যে অভিমুখে মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল, সে অভিমুখেই কেন বিশৃঙ্খলা বাড়ে ?

প্রথমে আমি আলোচনা করব তাপবিদ্যুৎ গতীয় কালের তীর। সব সময়ই সুশৃঙ্খল অবস্থার চাইতে বিশৃঙ্খল অবস্থার সংখ্যা অনেক অনেক বেশী। এই তথ্যেরই ফলশ্রুতি তাপগতি বিদ্যার দ্বিতীয় বিধি। বিচার করুন একটি বাক্সের ভিতরের কয়েক টুকরো জিগ্‌স (Jigsaw—করাত দিয়ে কাটা কয়েকটা টুকরো। ঠিকমতো মেলাতে পারলে একটি ছবি হয়)। এগুলির একটি এবং একটিমাত্র বিন্যাসেই সম্পূর্ণ একটি ছবি হয়। কিন্তু টুকরোগুলির এমন বহুসংখ্যক বিন্যাস আছে যেগুলিতে টুকরোগুলি বিশৃঙ্খল থাকে এবং কোনো ছবিই হয় না।

অনুমান করা যাক একটি তন্ত্র খুব অল্প সংখ্যক সুশৃঙ্খল অবস্থার কোনো একটিতে শুরু হয়েছে। কালে কালে বৈজ্ঞানিক বিধি অনুসারে তন্ত্রগুলির বিবর্তন হবে এবং তন্ত্রটির অবস্থারও পরিবর্তন হবে। পরবর্তীকালে তন্ত্রটির সুশৃঙ্খল অবস্থার চাইতে বিশৃঙ্খল অবস্থায় উপনীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তার কারণ বিশৃঙ্খল অবস্থার সংখ্যা বেশী। সুতরাং তন্ত্রটি যদি প্রাথমিক স্তরে উচ্চস্তরের শৃঙ্খলা মেনে চলে তাহলে কালে কালে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধির প্রবণতা থাকবে।

অনুমান করা যাক জিগ্‌স-এর খণ্ডগুলি একটি বাক্সে শুরু করল একটি সুশৃঙ্খল অবস্থায়। এ অবস্থায় তারা একটি চিত্র গঠন করল। বাক্সটিকে একটি ঝাঁকুনি দিলে তারা অন্য বিন্যাস গ্রহণ করবে, সম্ভবত সেটি হবে একটি বিশৃঙ্খল বিন্যাস। সে অবস্থায় খণ্ডগুলি আর সঠিক চিত্রগঠন করতে পারবে না। তার সহজ কারণ হল বিশৃঙ্খল অবস্থার সংখ্যা অনেক বেশী। কিছু কিছু খণ্ড একত্র হয়ে তখনো হয়তো চিত্রটির কিছু অংশ গঠন করতে পারবে। কিন্তু বাক্সটিকে যত ঝাঁকুনি দেবেন— সম্ভাবনা হল ঐ অংশগুলি ততই ভেঙে তালগোল পাকিয়ে যাবে। এ অবস্থায় তারা আর কোনো রকম চিত্রই গঠন করতে পারবে না। সুতরাং খণ্ডগুলি যদি প্রথমে উচ্চস্তরের সুশৃঙ্খল অবস্থা নিয়ে শুরু করে তাহলেও সম্ভাবনা হল কালে খণ্ডগুলির বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু অনুমান করা যাক, ঈশ্বর স্থির করেছিলেন মহাবিশ্বের শুরু যে ভাবেই হোক না কেন এর পরিণতি হবে উচ্চস্তরের সুশৃঙ্খল অবস্থা। আদিমকালে মহাবিশ্ব হয়তো বিশৃঙ্খল

অবস্থায় থাকবে। তার অর্থ কালের সঙ্গে বিশৃঙ্খলা হ্রাস পাবে। আপনি ভাঙা পেয়ালার টুকরোগুলির একত্র হয়ে টেবিলের উপর লাফিয়ে ওঠা দেখতে পাবেন। কিন্তু টুকরোগুলিকে পর্যবেক্ষণ করছেন এরকম যে কোনো মানুষ এমন মহাবিশ্বে বসবাস করবেন যেখানে কালের গতির সঙ্গে বিশৃঙ্খলা হ্রাস পায়। আমার যুক্তি হবে সেই সমস্ত মানুষের কালের মনস্তাত্ত্বিক তীর হবে পশ্চাৎমুখী। অর্থাৎ তারা ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি মনে রাখবে, অতীতের ঘটনাগুলিকে মনে রাখবে না। পেয়ালাটি যখন ভেঙে যাবে তখন তারা মনে রাখবে ওটা টেবিলের উপর ছিল। আবার ওটা যখন টেবিলের উপর থাকবে তখন ওরা মনে রাখবে না যে, ওটা মেঝের উপর ছিল।

মানবিক স্মৃতিশক্তি বিষয়ে আলোচনা করা শক্ত, কারণ মস্তিষ্ক কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা বিস্তৃতভাবে জানি না। কিন্তু কমপিউটারের স্মৃতিশক্তি কিভাবে কাজ করে তার সবটাই আমরা জানি। সেইজন্য আমি কমপিউটার সাপেক্ষ কালের মনস্তাত্ত্বিক তীর নিয়ে আলোচনা করব। আমার মনে হয় কমপিউটারের তীর এবং মানবিক তীর অভিন্ন : এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত। তা যদি না হোত তাহলে আগামীকালের মূল্য মনে রাখে এরকম কোনো কমপিউটারের মালিক হলে শেয়ার বাজারে বিরাট লাভ করা যেত।

একটি কমপিউটারের স্মৃতিশক্তি মূলত একটি কৌশল যার এমন কতগুলি উপাদান আছে যেগুলি দুটি অবস্থার যে কোনো একটি অবস্থায় থাকতে পারে। সবচাইতে সরল উদাহরণ হল একটি অ্যাবাকাস্ (Abacus)।* এর যে সরলতম রূপ তাতে থাকে কয়েকটি তার। প্রতিটি তারে একটি করে গুটি থাকে। গুটিটিকে যে কোনো দুটি অবস্থানের একটি অবস্থানে রাখা যায়। কমপিউটারের স্মৃতিতে একটি জিনিষ নথিভুক্ত করার আগে তার স্মৃতি থাকে বিশৃঙ্খল অবস্থায়। দুটি সম্ভাব্য অবস্থার যে কোনো একটি অবস্থার সম্ভাবনা থাকে সমান। (অ্যাবাকাসের গুটিগুলি তারের উপর এলোমেলো ভাবে ছড়ানো থাকে।) স্মৃতিশক্তি এবং স্মরণীয়ের পারস্পরিক ক্রিয়ার পর গুটিগুলি নিশ্চিত ভাবে দুটি অবস্থার একটি অবস্থায় থাকবে আর সেটা নির্ভর করবে তন্ত্রটির অবস্থার উপর। (অ্যাবাকাসের প্রতিটি গুটি থাকে তারের বাঁ দিকে কিম্বা ডান দিকে)। সুতরাং স্মৃতিটি বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে সুশৃঙ্খল অবস্থায় পৌঁছেছে, কিন্তু স্মৃতিটি সঠিক অবস্থায় রয়েছে সেটা নিশ্চিত করার জন্য একটি বিশেষ পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করা প্রয়োজন। (উদাহরণ : গুটিটিকে চালানো কিম্বা কমপিউটারে শক্তি সরবরাহ করা)। এই শক্তি ক্ষয় হয়ে তাপের রূপ নেয় এবং মহাবিশ্বে বিশৃঙ্খলার পরিমাণ বৃদ্ধি করে। বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি সবসময়ই স্মৃতির শৃঙ্খলা বৃদ্ধির চাইতে বেশী : এটা সর্বদাই দেখানো যেতে পারে। সুতরাং কমপিউটার শীতল রাখার পাখা যে তাপ বহিষ্কার করে তার অর্থ হল কমপিউটার যখন একটি জিনিষ স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত করে তখনও মহাবিশ্বের মোট বিশৃঙ্খলার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সময়ের যে অভিমুখে কম্পিউটার অতীতকে স্মরণ করে সেই অভিমুখ এবং বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধির অভিমুখ অভিন্ন।

সুতরাং কালের অভিমুখ সম্পর্কে আমাদের ব্যক্তিনিষ্ঠ (subjective) বোধ অর্থাৎ

* একধরনের সরল গণনাযন্ত্র — অনুবাদক।

কালের মনস্তাত্ত্বিক তীর আমাদের মস্তিষ্কের ভিতর স্থির হয় কালের তাপগতীয় তীর দিয়ে। ঠিক একটি কমপিউটারের মতো— যে ক্রমে বিশৃঙ্খলা (entropy) বাড়ে, সেই ক্রমেই আমাদের বিভিন্ন বিষয় স্মরণে রাখতে হবে। এর ফলে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় বিধি প্রায় তুচ্ছ হয়ে দাঁড়ায়। কালের গতির সঙ্গে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায় তার কারণ যে অভিমুখে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায় সেই অভিমুখেই আমরা কাল মাপি। এর চাইতে ভাল বাজি ধরার বিষয় আপনি খুঁজে পাবেন না।

কিন্তু কালের তাপগতীয় তীরের অস্তিত্ব কেন থাকবে? কিম্বা অন্য কথায় বলা যায়— কালের একটি প্রান্তে (অর্থাৎ যে প্রান্তকে আমরা অতীত বলি) মহাবিশ্ব কেন উচ্চস্তরের সুশৃঙ্খল অবস্থায় থাকবে? কেন সবসময় সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকবে না? আসলে এ সম্ভাবনাই সবচাইতে বেশী বলে মনে হতে পারে এবং কেন সময়ের যে অভিমুখে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায় এবং যে অভিমুখে মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল সেই দুটি অভিমুখ অভিন্ন?

মহাবিশ্ব কিভাবে শুরু হোত সে বিষয়ে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা চিরায়ত ব্যাপক অপেক্ষবাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ বৃহৎ বিস্ফোরণের অনন্যতায় বিজ্ঞানের সমস্ত জানিত বিধি ভেঙে পড়ে। মহাবিশ্ব অত্যন্ত মসৃণ এবং সুশৃঙ্খল অবস্থায় শুরু হতে পারত। সে অবস্থা হতে পারত আমাদের পর্যবেক্ষণ করা কালের সুসংজ্ঞিত তাপগতীয় এবং মহাবিশ্বতত্ত্বভিত্তিক কালের তীরের পথিকৃৎ। কিন্তু এটা একই রকম ভালভাবে শুরু হতে পারত পিণ্ডপিণ্ড (lumpy) এবং বিশৃঙ্খল অবস্থায়। সেক্ষেত্রে মহাবিশ্ব থাকত সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল অবস্থায়, সুতরাং কালের গতির সঙ্গে বিশৃঙ্খলা আর বাড়তে পারত না : হয় স্থির থাকত, নয়তো বিশৃঙ্খলা হ্রাস পেত। স্থির থাকলে কালের কোনো সুসংজ্ঞিত তাপগতীয় তীর থাকত না। হ্রাস পেলে কালের তাপগতীয় তীরের অভিমুখ এবং মহাবিশ্বতত্ত্বভিত্তিক তীরের অভিমুখ হোত বিপরীত। আমাদের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে এ দুটি সম্ভাবনার কোনোটিই মেলে না। আমরা কিন্তু দেখেছি চিরায়ত ব্যাপক অপেক্ষবাদ ভবিষ্যদ্বাণী করে নিজের পতনের। স্থান-কালের বক্রতা বৃহৎ হলে কণাবাদী মহাকর্ষীয় অভিক্রিয়া (quantum gravitational effect) গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং মহাবিশ্বের উত্তম বিবরণরূপে চিরায়ত তত্ত্বের অস্তিত্ব আর থাকবে না। মহাবিশ্বের আরম্ভ বুঝতে হলে কণাবাদী মহাকর্ষীয় তত্ত্ব ব্যবহার করতে হবে।

আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি কণাবাদী মহাকর্ষীয় তত্ত্বে মহাবিশ্বের অবস্থার বিবরণ দিতে হলেও বলতে হবে মহাবিশ্বের সম্ভাব্য ইতিহাসগুলির অতীতের স্থান-কালের সীমান্তে কিরকম আচরণ হোত। ইতিহাসগুলি যদি সীমানাহীনতার শর্ত পূরণ করে অর্থাৎ তারা যদি আয়তনে সসীম হয় কিন্তু তাদের কোনো সীমানা, কিনারা কিম্বা অনন্যতা যদি না থাকে তাহলে আমরা যা জানি না এবং যা জানা সম্ভব নয় তার বিবরণ দেওয়ার অসুবিধা এড়াতে পারি। সেক্ষেত্রে কালের আরম্ভ হবে স্থান-কালের একটি নিয়মানুগ (regular) মসৃণ বিন্দু এবং মহাবিশ্ব তার সম্প্রসারণ শুরু করবে অত্যন্ত মসৃণ এবং নিয়মানুগ অবস্থায়। সে ক্ষেত্রে মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ সমরূপ হোত না কারণ তাহলে কণাবাদী তত্ত্বের অনিশ্চয়তাবাদ লঙ্ঘিত হোত। কণাগুলির গতিবেগ এবং ঘনত্বে সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি হতে হোত। কিন্তু সীমানাহীন অবস্থার নিহিতার্থ হল : এই হ্রাসবৃদ্ধি হোত যতটা সম্ভব অল্প তবে অনিশ্চয়তাবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

মহাবিশ্বের শুরুতে কিছুকাল অতি দ্রুত সম্প্রসারণ হোত (exponential or inflationary)– আয়তনে মহাবিশ্ব বৃদ্ধি পেত বহুগুণ। এই সম্প্রসারণের সময় ঘনত্বের হ্রাসবৃদ্ধি প্রথমে কম থাকত কিন্তু পরে বৃদ্ধি পেতে শুরু করত। যে অঞ্চলের ঘনত্ব গড় ঘনত্বের চাইতে সামান্য বেশী সেই সমস্ত অঞ্চলে অধিক ভরের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের জন্য সম্প্রসারণের হার হ্রাস পেত। পরিণামে ঐ সমস্ত অঞ্চলের সম্প্রসারণ বন্ধ হোত এবং চুপ্‌সে গিয়ে তৈরী হোত নীহারিকা, তারকা এবং আমাদের মতো জীব। মহাবিশ্ব শুরু হোত মসৃণ এবং নিয়মানুগ অবস্থায় এবং কালের গতির সঙ্গে পিণ্ড পিণ্ড এবং বিশৃঙ্খল হোত। এটাই হোত কালের তাপগতীয় তীরের ব্যাখ্যা।

কিন্তু যদি মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে সঙ্কোচন শুরু হোত, তখন কি হোত? তাহলে কি কালের তাপগতীয় তীর বিপরীতমুখী হোত? এবং কালের গতির সঙ্গে কি বিশৃঙ্খলা হ্রাস পেত? যারা সম্প্রসারণশীল অবস্থা থেকে সঙ্কোচনশীল অবস্থা পর্যন্ত বেঁচে থাকত তাদের সম্পর্কে নানা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর মতো সম্ভাবনার পথিকৃৎ হোত এরকম ঘটনা। তারা কি শেয়ালার ভাঙা টুকরোগুলির মেঝেতে একত্র হয়ে লাফিয়ে টেবিলে ফিরে যাওয়া দেখত? তারা কি শেয়ার বাজারে পরের দিনের দাম মনে রেখে অনেক টাকা রোজগার করে নিত? মহাবিশ্ব যখন আবার চুপ্‌সে যাবে তখন কি হবে তা নিয়ে মাথা ঘামানো একটু বেশী পণ্ডিতীয় (academic) ব্যাপার হয়ে যাবে কারণ অন্তত এক হাজার কোটি বছরের আগে মহাবিশ্বের সঙ্কোচন শুরু হবে না। কিন্তু কি হবে সেটা জানবার একটি দ্রুততর পদ্ধতি আছে: কৃষ্ণগহ্বরে ঝাঁপ দেওয়া। একটি তারকা চুপ্‌সে গিয়ে কৃষ্ণগহ্বর তৈরী হওয়া অনেকটা সমগ্র মহাবিশ্বের চুপ্‌সে যাওয়ার শেষের অবস্থার মতো। সুতরাং যদি মহাবিশ্বের সঙ্কোচনশীল অবস্থায় বিশৃঙ্খলা হ্রাস পায় তাহলে আশা করা যেতে পারে কৃষ্ণগহ্বরের ভিতরেও বিশৃঙ্খলা হ্রাস পাবে। সুতরাং একজন মহাকাশচারী কৃষ্ণগহ্বরের ভিতর পড়ে গেলে হয়তো তিনি রুলেট (roulette– এক ধরনের জুয়া– ছোট ছোট বল দিয়ে খেলা হয়) খেলায় বলটা কোথায় গিয়েছে বাজি ধরার আগেই সেটি মনে রেখে অনেক টাকা করতে পারবেন। (কিন্তু তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে বেশীক্ষণ খেলতে পারবেন না– তার আগেই তিনি স্প্যাগেটি (এক ধরনের সেমাই) হয়ে যাবেন। তিনি কালের তাপগতীয় তীরের বিপরীতমুখী হওয়ার সংবাদও আমাদের দিতে পারবেন না কিম্বা বাজিতে জেতা টাকা ব্যাঙ্কে দিতেও পারবেন না। তার কারণ তিনি কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্তের আড়ালে আটকে যাবেন)।

প্রথমে আমার বিশ্বাস ছিল মহাবিশ্ব পুনর্বার চুপ্‌সে গেলে বিশৃঙ্খলা হ্রাস পাবে। কারণ আমার ধারণা ছিল মহাবিশ্ব যখন আবার ক্ষুদ্র হবে তখন তাকে মসৃণ আর নিয়মানুগ অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। এর অর্থ হোত সঙ্কোচনের দশা সম্প্রসারণের দশার কালিক বৈপরীত্যের মতো হবে। সঙ্কোচনের অবস্থায় মানুষ তার জীবন যাপন করবে পশ্চাৎমুখী হয়ে: জন্মের আগেই মৃত্যু হবে এবং মহাবিশ্ব যেমন সঙ্কুচিত হবে তারাও তেমন তরুণতর হবে।

এ চিন্তনের আকর্ষণ আছে কারণ এর অর্থ হবে সঙ্কোচন দশা এবং সম্প্রসারণ দশার ভিতরে একটি চমৎকার প্রতিসাম্য (symmetry)। কিন্তু মহাবিশ্ব সম্পর্কিত অন্যান্য চিন্তন থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই চিন্তনকে শুধুমাত্র তার নিজস্বতা দিয়ে গ্রহণ করা যায় না। প্রশ্নটা

হল: এ ধারণা কি সীমানাহীন অবস্থার ভিতরে নিহিত আছে? না কি ঐ অবস্থার সঙ্গে এ ধারণা সঙ্গতিহীন? আমি আগে বলেছি– আমি ভেবেছিলাম সীমানাহীন অবস্থার ভিতরে এই চিন্তন নিহিত আছে যে সঙ্কোচনের দশায় বিশৃঙ্খলা হ্রাস পাবে। আমার ভুল হয়েছিল অংশত ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে উপমার (analogy– উপমা) ফলে। যদি মহাবিশ্বের আরম্ভকে উত্তর মেরুর অনুরূপ বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে অন্তিম অবস্থায় মহাবিশ্বের হওয়া উচিৎ আরম্ভের অনুরূপ, ঠিক যেমন দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরুর অনুরূপ। উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর সঙ্গে মহাবিশ্বের শুরু এবং শেষের সাদৃশ্য কিন্তু কাল্পনিক কালে। বাস্তব কালে শুরু এবং শেষের ভিতরে খুবই পার্থক্য থাকতে পারে। মহাবিশ্বের একটি সরল প্রতিরূপ নিয়ে গবেষণায় চুপ্‌সে যাওয়া অবস্থাকে মনে হয়েছিল সম্প্রসারণশীল দশার কালিক বৈপরীত্যের মতো। আমার ভুল হওয়ার একটি কারণ এই গবেষণা। কিন্তু সীমানাহীন অবস্থা হলেই যে সঙ্কোচনশীল দশা সম্প্রসারণশীল দশার কালিক বৈপরীত্য হবে এরকম কোনো আবশ্যিকতা নেই। এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আমার সহকর্মী পেনসেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডন পেজ (Don Page)। রেমণ্ড লাফ্লাম (Raymond Laflamme) নামে আমার একজন ছাত্র তাঁর গবেষণায় দেখলেন অন্য একটি সামান্য জটিল প্রতিরূপে মহাবিশ্বের চুপ্‌সে যাওয়া এবং মহাবিশ্বের সম্প্রসারণে অনেকটা পার্থক্য। আমি বুঝতে পারলাম নিজের ভুল: সীমানাহীন অবস্থার ভিতরে নিহিত অর্থ রয়েছে। সে অর্থ: সঙ্কোচনশীল দশায় বিশৃঙ্খলা বাড়তেই থাকবে। মহাবিশ্বের পুনর্বার সঙ্কোচনের সময় কিম্বা কৃষ্ণগহ্বরের ভিতরে, কালের তাপগতীয় কিম্বা মনস্তত্ত্বভিত্তিক তীরের বৈপরীত্য (reverse) হবে না।

নিজের এরকম একটি ভুল আবিষ্কার করলে আপনি কি করবেন? কিছু লোক কখনোই ভুল স্বীকার করেন না এবং তাঁরা নিজেদের মত সমর্থন করার জন্য নতুন নতুন যুক্তি খুঁজে বার করেন আর অনেক সময়ই যুক্তিগুলি হয় পরস্পর সামঞ্জস্যহীন। কৃষ্ণগহ্বর তত্ত্বের বিরোধিতা করার জন্য এডিংটন এককমই করেছিলেন। আবার অনেকে দাবী করেন প্রথমত তাঁরা কখনোই আসলে এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেননি কিম্বা করলেও করেছেন ঐ দৃষ্টিভঙ্গি কতটা সামঞ্জস্যহীন সেটা দেখানোর জন্য। আমার মনে হয় যদি আপনি ছাপার অক্ষরে মেনে নেন যে আপনি ভুল করেছিলেন তাহলে ব্যাপারটা অনেক ভাল দেখায় আর বিভ্রান্তিও কমে। এর একজন ভাল উদাহরণ ছিলেন আইনস্টাইন। তিনি যখন মহাবিশ্বের একটি স্থির প্রতিরূপ গঠন করার চেষ্টা করছিলেন তখন তিনি মহাবিশ্বতত্ত্বভিত্তিক ধ্রুবক উপস্থিত করেছিলেন। শেষে তিনি বলেছেন এটা ছিল তাঁর জীবনের সব চাইতে বড় ভুল।

কালের তীরের প্রসঙ্গে ফিরে এলে একটি প্রশ্ন থেকে যায়: আমাদের পর্যবেক্ষণে কেন কালের তাপগতীয় তীর এবং মহাবিশ্বতত্ত্বভিত্তিক তীরের অভিমুখ অভিন্ন হয়? কিম্বা অন্য কথায় বলা যায়: যে অভিমুখে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হয়, কেন সেই অভিমুখেই বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়? যদি একথা বিশ্বাস করা যায় যে সীমানাহীনতার প্রস্তাবে যে অর্থ নিহিত আছে বলে মনে হয় সেই অনুসারে মহাবিশ্ব প্রথমে সম্প্রসারিত হবে এবং পরে সঙ্কুচিত হবে, তাহলে একটি প্রশ্ন আসবে: কেন আমাদের অবস্থান সঙ্কোচনশীল দশায় না থেকে সম্প্রসারণশীল দশায় থাকবে?

দুর্বল নরহীয় নীতির ভিত্তিতে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেতে পারে। সঙ্কোচনশীল দশার অবস্থা এমন বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্বের উপযুক্ত হবে না যারা প্রশ্ন করতে পারে: যে অভিমুখে মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল কেন সেই অভিমুখেই বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাচ্ছে? সীমানাহীনতার প্রস্তাব যে ভবিষ্যদ্বাণী করে তার অর্থ: আদিম মহাবিশ্বের স্ফীতির হার ছিল ক্রান্তিক হারের (critical rate) খুব কাছাকাছি। সেই হারে পুনর্বার চুপ্‌সে যাওয়া এড়ানো সম্ভব হবে এবং বহুকাল পর্যন্ত মহাবিশ্ব পুনর্বার চুপ্‌সে যাবে না। ততদিনে তারকাগুলি পুড়ে শেষ হয়ে যাবে এবং সেগুলির ভিতরকার প্রোটন এবং নিউট্রনগুলির অবক্ষয় হয়ে সম্ভবত তারা লঘু কণিকা প্রোটন, প্যাজিটন এবং নিউট্রিনো এবং বিকিরণে (radiation) রূপান্তরিত হবে। তখন মহাবিশ্ব থাকবে প্রায় সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল অবস্থায়। কালের শক্তিশালী তাপগতীয় তীর থাকবে না। বিশৃঙ্খলা আর বাড়তে পারবে না। তার কারণ, মহাবিশ্ব তখন প্রায় সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল অবস্থায়। কিন্তু বুদ্ধিমান জীবের ক্রিয়াকর্মের জন্য কালের শক্তিশালী তাপগতীয় তীর প্রয়োজন। বেঁচে থাকবার জন্য মানুষের খাদ্যগ্রহণ প্রয়োজন। খাদ্য শক্তির একটি সুশৃঙ্খল রূপ। সেটি রূপান্তরিত হয় তাপে। তাপ শক্তির একটি বিশৃঙ্খল রূপ। সুতরাং মহাবিশ্বের সঙ্কোচনশীল দশায় বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কালের তাপগতীয় তীর এবং মহাবিশ্বতত্ত্বভিত্তিক তীরের একই অভিমুখ আমরা কেন দেখতে পাই তার ব্যাখ্যা এটাই। ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয় যে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের ফলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়, বরং সীমানাহীন অবস্থাই বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি করে এবং সম্প্রসারণশীল দশাই শুধুমাত্র বুদ্ধিমান জীবের উপযুক্ত অবস্থা।

সংক্ষেপে বলা যায় বিজ্ঞানের বিধি, কালের অগ্রগতি এবং পশ্চাৎগতির ভিতরে কোনো পার্থক্য করে না। কিন্তু কালের অন্তত এমন তিনটি তীর রয়েছে যেগুলি অতীত এবং ভবিষ্যতের ভিতর পার্থক্য করে। সেগুলি হল তাপগতীয় তীর অর্থাৎ যে অভিমুখে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়, মনস্তাত্ত্বিক তীর অর্থাৎ কালের যে অভিমুখে আমরা অতীত স্মরণ করি কিন্তু ভবিষ্যৎ স্মরণ করি না এবং মহাবিশ্বতত্ত্বভিত্তিক তীর অর্থাৎ যে অভিমুখে মহাবিশ্ব সঙ্কুচিত না হয়ে সম্প্রসারিত হয়। আমি দেখিয়েছি মনস্তাত্ত্বিক তীর এবং তাপগতীয় তীর মূলত অভিন্ন, সুতরাং এই দুটি তীরের অভিমুখ সব সময়ই অভিন্ন হবে। মহাবিশ্বের সীমানাহীনতার প্রস্তাব কালের একটি সুসংজ্ঞিত তাপগতীয় তীরের অস্তিত্ব রয়েছে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করে, কারণ মহাবিশ্বের আরম্ভ মসৃণ এবং সুশৃঙ্খল অবস্থায় হওয়া আবশ্যিক। এবং আমাদের পর্যবেক্ষণে তাপগতীয় তীর এবং মহাবিশ্বতত্ত্ব ভিত্তিক তীরের ঐক্যের কারণ: বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব শুধুমাত্র সম্প্রসারণশীল দশায়ই থাকতে পারে। সঙ্কোচনশীল দশা অনুপযুক্ত হবে, তার কারণ সে দশায় কালের কোনো শক্তিশালী তাপগতীয় তীর থাকে না।

মহাবিশ্ব বোঝার প্রচেষ্টায় মানবজাতির প্রগতি– যে মহাবিশ্বে বিশৃঙ্খলা বর্ধমান সেই মহাবিশ্বে একটি সুশৃঙ্খল কোণ (corner– ? নীড়) সৃষ্টি করেছে। এ বইয়ের প্রতিটি শব্দ যদি আপনি মনে রাখেন তাহলে আপনার স্মৃতি প্রায় দু'মিলিয়ান (১০,০০,০০০ = এক মিলিয়ান) খণ্ড সংবাদ নথিভুক্ত করেছে, আপনার মস্তিষ্কের শৃঙ্খলা বেড়েছে দু'মিলিয়ান একক। তবে এই বই পড়বার সময় অন্তত এক হাজার ক্যালরি খাদ্যরূপ সুশৃঙ্খল শক্তিকে আপনি

তাপরূপ বিশৃঙ্খল শক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। এই পরিমাণ শক্তি ঘর্ম এবং পরিচলনের (পরিচলন—convection) ফলে দেহ থেকে আপনার চার পাশের বায়ুতে হারিয়েছেন। এর ফলে মহাবিশ্বের বিশৃঙ্খলা বাড়বে প্রায় কুড়ি মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান একক অর্থাৎ আপনার মস্তিষ্কে যে শৃঙ্খলা বেড়েছে, তার দশ মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান গুণ, অবশ্য আপনি যদি এ বইয়ের সবটাই মনে রাখেন। এতক্ষণ আমি যে সমস্ত আংশিক তত্ত্বের বিবরণ দিয়েছি কি করে লোকে সেগুলি সংযুক্ত করে মহাবিশ্বের সবকিছু ব্যাখ্যা করে এরকম সম্পূর্ণ একটি ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব গঠন করার চেষ্টা করছেন পরের অধ্যায়ে সেটা ব্যাখ্যা করে আমাদের পরিবেশের শৃঙ্খলা আর একটু বাড়াতে চেষ্টা করব।

পদার্থবিদ্যাকে ঐক্যবদ্ধ করা

(The Unification of Physics)

প্রথম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল— মহাবিশ্বের সবকিছু নিয়ে সম্পূর্ণ একটি ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব একবারে গঠন করা খুবই কঠিন হোত। তার বদলে আমরা একাধিক আংশিক তত্ত্ব আবিষ্কার করে অগ্রসর হয়েছি। এই তত্ত্বগুলি ঘটনাবলীর একটি সীমিত অঞ্চল ব্যাখ্যা করে। এই কাজে তারা অন্যান্য অভিক্রিয়া (effects) অগ্রাহ্য করে কিম্বা কিছু কিছু সংখ্যার সাহায্যে সেগুলির আসন্নতায় (approximating them) পৌঁছাতে চেষ্টা করে। (উদাহরণ: রসায়ন শাস্ত্র পরমাণুগুলির কেন্দ্রকের গঠন না জেনে তাদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া গণনা অনুমোদন করে)। শেষ পর্যন্ত কিন্তু একটি সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্ব আবিষ্কার আশা করা যায়। সমস্ত আংশিক তত্ত্বই আসন্নতারূপে সে তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে। সেই আংশিক তত্ত্বগুলির প্রয়োজন হবে না, ঘটনাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য তত্ত্বে কয়েকটি যাদৃচ্ছিক সংখ্যার মূল্য বেছে নেওয়া। এই রকম একটি তত্ত্ব অনুসন্ধানের নাম "পদার্থবিদ্যা ঐক্যবদ্ধ করা।" আইনস্টাইন জীবনের শেষ ক' বছরের অধিকাংশ সময়ই ব্যয় করেছেন এরকম একটি তত্ত্বের সন্ধানে। কিন্তু সফল হননি। কারণ তখনো এরকম তত্ত্ব আবিষ্কারের সময় হয়নি। মহাকর্ষ এবং বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল সম্পর্কে আংশিক তত্ত্ব ছিল কিন্তু কেন্দ্রকীয় বল (nuclear forces) সম্পর্কে তখন সামান্যই জানা ছিল। তাছাড়া কণাবাদী বলবিদ্যা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও আইনস্টাইন এই বলবিদ্যার (quantum mechanics) বাস্তবতা স্বীকার করতেন না। তবুও মনে হয় যে মহাবিশ্বে আমরা বসবাস করি তার একটি মূলগত অবয়ব অনিশ্চয়তার নীতি। সুতরাং আবশ্যিক ভাবেই এই নীতিকে একটি সফল ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এরকম একটি তত্ত্ব আবিষ্কারের সম্ভাবনা এখন অনেক বেশী, তার কারণ এখন আমরা মহাবিশ্ব সম্বন্ধে অনেক বেশী জানি। এখন আমি এ বিষয়ের বিবরণ দেব কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস সম্পর্কে আমাদের সাবধান হতে হবে– আগেও এরকম মিথ্যা প্রভাত (false dawn) আমাদের হয়েছে। উদাহরণ: এই শতাব্দীর প্রথমে মনে হয়েছিল অবিচ্ছিন্ন পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা এবং তাপ পরিবহনের মতো ধর্মের বাহ্যিকতে সমস্তই ব্যাখ্যা করা যাবে। পারমাণবিক গঠন এবং অনিশ্চয়তার নীতি আবিষ্কারের ফলে সে আশা সজোরে ভেঙে পড়ে। তারপর আবার ১৯২৮ সালে পদার্থবিদ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ম্যাক্স বর্ণ (Max Born) গয়েটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে (Gottingen University) একদল সাক্ষাৎকারীকে বলেছিলেন "আমরা যাকে পদার্থবিদ্যা বলি ছ'মাসেই তার সমাপ্তি ঘটবে"। তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল অনতিকাল পূর্বে ডিরাকের (Dirac) আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রনের আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সমীকরণ। তখন মনে হয়েছিল এরকম আর একটি সমীকরণ প্রোটনের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করবে। তখন পর্যন্ত প্রোটনই (proton) ছিল অন্য একটিমাত্র জ্ঞানিত কণিকা। সুতরাং এই সমীকরণ জানা হয়ে গেলেই তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা শেষ হবে। কিন্তু তারপর নিউট্রন এবং কেন্দ্রকীয় বল আবিষ্কার সে আশারও মাথায় আঘাত করে। একথা আমি বলছি, তবুও আমি বিশ্বাস করি– সতর্ক আশাবাদের যুক্তি রয়েছে, আমরা হয়তো প্রকৃতির চূড়ান্ত বিধি অনুসন্ধানের শেষ প্রান্তের কাছাকাছি এসে গিয়েছি।

আগের অধ্যায়গুলিতে আমি ব্যাপক অপেক্ষবাদ, মহাকর্ষের আংশিক তত্ত্ব এবং দুর্বল, সবল ও বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল নিয়ন্ত্রণকারী আংশিক তত্ত্বের বিবরণ দিয়েছি। তথাকথিত মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বে (grand unified theory কিংবা GUT) শেষের তিনটির সমন্বয় করা যেতে পারে, তবে এগুলি খুব সন্তোষজনক নয়। তার কারণ মহাকর্ষ তার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং বিভিন্ন কণিকার আপেক্ষিক ভরের মতো এমন কতকগুলি সংখ্যা সেগুলির ভিতর রয়েছে, যেগুলি তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে বলা যায় না, পর্যবেক্ষণফলের সঙ্গে খাপ খাওয়ার মতো করে বেছে নিতে হয়। মহাকর্ষকে অন্যান্য বলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করা বিষয়ে প্রধান অসুবিধা হল ব্যাপক অপেক্ষবাদ একটি "চিরায়ত" (classical) তত্ত্ব অর্থাৎ কণাবাদী বলবিদ্যার অনিশ্চয়তার নীতি এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অন্যদিকে অন্যান্য আংশিক তত্ত্বগুলি অপরিহার্যভাবে কণাবাদী বলবিদ্যার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং প্রথম ধাপ হল ব্যাপক অপেক্ষবাদের সঙ্গে অনিশ্চয়তাবাদের সমন্বয় করা। আমরা দেখেছি এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি হতে পারে–যেমন কৃষ্ণগহ্বরগুলি কালো নয়, মহাবিশ্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ তবে কোনো অনন্যতাহীন এবং সীমানাহীন। অসুবিধাটি সপ্তম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে– অনিশ্চয়তার নীতির অর্থ হল, এমন কি "শূন্য" (empty) স্থানও জোড়া জোড়া কল্পিত কণিকা এবং কল্পিত বিপরীত কণিকায় পূর্ণ। এই জোড়গুলিতে শক্তি থাকবে অসীম, সুতরাং আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E = mc^2$ অনুসারে তাদের ভর (mass) হবে অসীম। তাদের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ মহাবিশ্বকে বক্র করে অসীম ক্ষুদ্র আকারে নিয়ে আসবে।

অন্যান্য আংশিক তত্ত্বেও দৃষ্টত অবিশ্বাস্য অনেকটা একইরকম বহু অসীম (infinite)

দেখা যায় কিন্তু পুনঃস্বাভাবিকীকরণ পদ্ধতির (renormalization) সাহায্যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে অসীমগুলিকে বাতিল করা সম্ভব। এ পদ্ধতিতে অন্যান্য অসীম উপস্থিত করে অসীমগুলিকে বাতিল করতে হয়। যদিও এই পদ্ধতি গাণিতিকভাবে সন্দেহজনক তবুও কার্যক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ফলপ্রদ। এই সমস্ত তত্ত্বে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলির পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলের নির্ভুলতা অসাধারণ। একটি সম্পূর্ণ তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টার দিক থেকে কিন্তু পুনঃস্বাভাবিকীকরণ পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি আছে। তার কারণ এর অর্থ: তত্ত্ব থেকে ভর এবং বলগুলির শক্তি সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া যায় না। পর্যবেক্ষণফলের সঙ্গে খাপ খাওয়ার মতো করে বেছে নিতে হয়।

অনিশ্চয়তার বিধিকে ব্যাপক অপেক্ষবাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হলে মাত্র দুটি সংখ্যার সঙ্গে সমন্বয় (adjust) করতে হবে: মহাকর্ষের শক্তি এবং মহাবিশ্বতত্ত্বের ধ্রুবকের মূল্যাঙ্ক

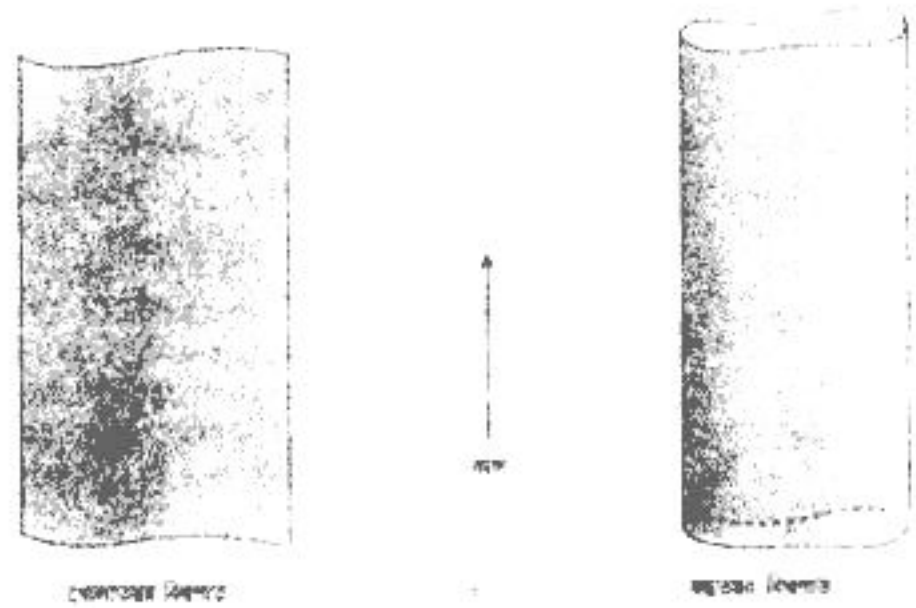

চিত্র - ১০.১ এবং চিত্র - ১০.২

(value of cosmological constant)। কিন্তু এই দুটি সংখ্যার সমন্বয়ই সমস্ত অসীম দূর করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুতরাং এমন একটি তত্ত্ব পাওয়া গেল যে তত্ত্বে স্থান-কালের বক্রতার মতো কয়েকটি পরিমাণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী হল: সেগুলি অসীম কিন্তু এই পরিমাণগুলি

পর্যবেক্ষণ করা এবং মাপা সম্ভব। তার ফলে দেখা যায় সেগুলি সসীম--তাতে কোনো ভুল নেই। ব্যাপক অপেক্ষবাদ এবং অনিশ্চয়তার নীতির এই সমন্বয়ে এই সমস্যার অস্তিত্ব রয়েছে এরকম সন্দেহ কিছুদিন ধরেই ছিল কিন্তু বিস্তৃত গণনা দ্বারা এ সন্দেহের সত্যতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় ১৯৭২ সালে। চার বছর পর "অতিমহাকর্ষ" (supergravity) নামে একটি সম্ভাব্য সমাধান উপস্থিত করা হয়। গ্র্যাভিটন নামে চক্রণ-২ কণিকা মহাকর্ষীয় বল বহন করে। সম্ভাব্য সমাধানের কল্পন ছিল গ্র্যাভিটনের সঙ্গে চক্রণ $\frac{3}{2}$, ১, $\frac{1}{2}$ এবং ০ বিশিষ্ট কয়েকটি নতুন কণিকা সংযুক্ত করা। এক অর্থে এই সমস্ত কণিকাকে একই "অতিকণিকার" (superparticle) বিভিন্ন অবয়ব বলে বিচার করা যায়। এইভাবে ঐক্যবদ্ধ করা যায় চক্রণ $\frac{1}{2}$ এবং $\frac{3}{2}$ পদার্থ কণিকা এবং চক্রণ ০, ১ এবং ২ বলবাহী (force carrying) কণিকা। চক্রণ $\frac{1}{2}$ এবং $\frac{3}{2}$ বিশিষ্ট কল্পিত (virtual) কণিকা/বিপরীত কণিকার জোড়ের তাহলে অপরা (negative) শক্তি থাকবে, সুতরাং চক্রণ ২, ১ এবং ০ বিশিষ্ট কল্পিত জোড়ের পরা শক্তিকে বাতিল করতে চাইবে। এর ফলে সম্ভাব্য অনেক অসীম বাতিল হয়ে যাবে কিন্তু সন্দেহ ছিল কিছু অসীম বোধ হয় তখনও থেকে যাবে। কিন্তু বাতিল না করা কোনো অসীম থেকে গেল কিনা সেই গণনা ছিল এত জটিল এবং দীর্ঘ যে কেউই সে দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিল না। গণনায় দেখা গিয়েছিল একটি কমপিউটার ব্যবহার করলেও সময় লাগবে প্রায় চার বছর এবং অন্তত একটি ভুলের সম্ভাবনা থাকবে খুবই বেশী এমন কি তার চাইতে বেশী ভুলের সম্ভাবনাও থাকতে পারে। সুতরাং উত্তরটি ঠিক হয়েছে জানতে হলে অন্য একজনকে গণনা করে একই উত্তর পেতে হবে। সে সম্ভাবনাও খুব বেশী ছিল না।

এই সমস্ত সমস্যা এবং অতিমহাকর্ষ তত্ত্বগুলির কণিকার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা কণিকাগুলির মিল নেই মনে হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই বিশ্বাস করতেন অতিমহাকর্ষই সম্ভবত পদার্থবিদ্যাকে ঐক্যবদ্ধ করার সমস্যার সঠিক সমাধান। মহাকর্ষকে অন্যান্য বলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করার এটিই মনে হয়েছিল সবচাইতে ভাল উপায়। কিন্তু ১৯৮৪ সালে যে তত্ত্বগুলিকে তন্তুতত্ত্ব (string theories) বলা হয় সেই তত্ত্বগুলির সপক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। কণিকাগুলির অবস্থান স্থানে একক একটি বিন্দুতে কিন্তু এই তত্ত্বগুলিতে মূলগত বস্তু (basic objects) কণিকা নয়। এই তত্ত্বের মূলগত বস্তুর দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু অন্য কোনো মাত্রা (dimension) নেই। এগুলি অসীম কৃশ (thin) তন্তুর মতো। এই তন্তুগুলির তথাকথিত মুক্ত (open) তন্তুর মতো প্রান্ত (ends) থাকতে পারে কিম্বা নিজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বদ্ধ ফাঁস (loop) হতে পারে (বদ্ধতন্তু) (চিত্র-- ১০.১ এবং ১০.২)। একটি কণিকা কালের প্রতিটি ক্ষণে স্থানের একটি বিন্দু অধিকার করে থাকে। সুতরাং স্থান-কালে একটি রেখা (বিশ্বরেখা--world line) কণিকার ইতিহাসের প্রতিনিধি হতে পারে। অন্য দিকে একটি তন্তু কালের প্রতিক্ষণে স্থানের একটি রেখা অধিকার করে থাকে। সুতরাং স্থান-কালে এর ইতিহাস একটি দ্বিমাত্রিক পৃষ্ঠ (two dimensional surface)। এর নাম বিশ্বপাত (world sheet) (এইরকম একটি বিশ্বপাতের যে কোনো একটি বিন্দুর বিবরণ দেওয়া যায় দুটি সংখ্যা দিয়ে-- একটি নির্দেশ করে কাল, অন্যটি নির্দেশ করে তন্তুর উপর বিন্দুটির অবস্থান)। একটি

মুক্ত তন্তুর বিশ্বপাত একটি ফালি (strip)। এর কিনারাগুলি তন্তুর প্রান্তগুলির স্থান-কালের ভিতর দিয়ে পথের প্রতিরূপ (represent) (চিত্র ১০.২)। একটি বদ্ধতন্তুর বিশ্বপাত (world

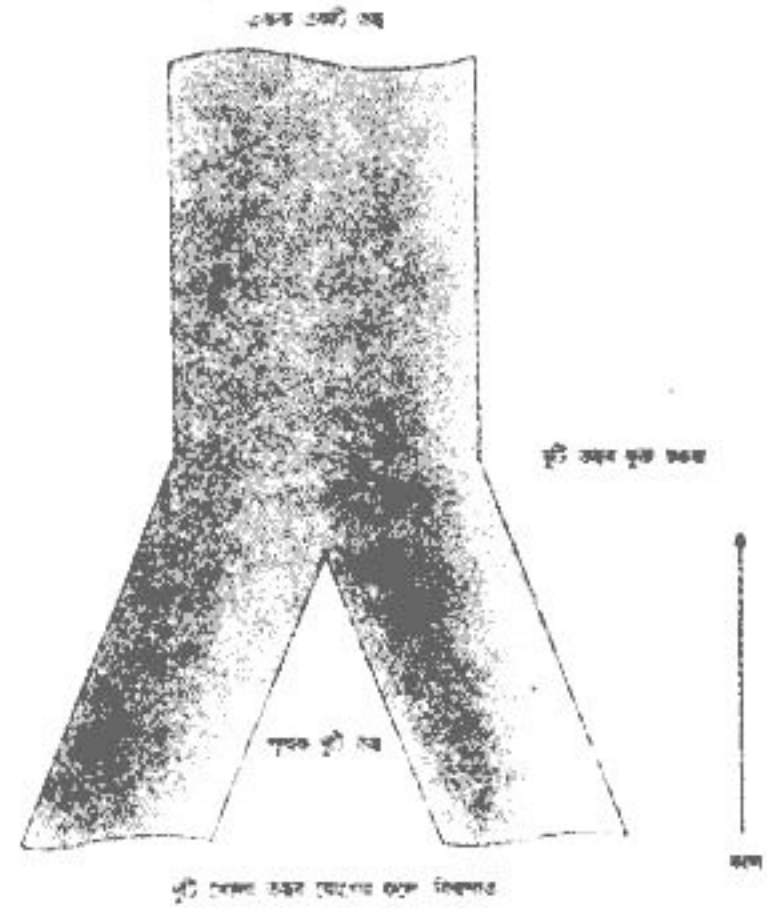

চিত্র - ১০.৩

sheet) একটি সিলিন্ডার কিম্বা একটি নল (cylinder or tube) (চিত্র ১০.২)। নলের ফালি (slice) একটি বৃত্ত। সে বৃত্ত একটি বিশেষ কালে তন্তুর অবস্থানের প্রতিরূপ (represents)।

দুই খণ্ড তার (string) যুক্ত হয়ে একক একটি তন্তু গঠন করতে পারে। যুক্ত তন্তুগুলির ক্ষেত্রে তাদের প্রান্তগুলি শুধুমাত্র যুক্ত হয় (চিত্র-- ১০.৩)। আবার বদ্ধতন্তুগুলির ক্ষেত্রে ব্যাপারটি অনেকটা পায়জামার দুটি পায়ের জোড়া লাগার মতো (চিত্র-- ১০.৪)। একই ভাবে একখণ্ড তন্তু বিভক্ত হয়ে দুটি তন্তু হতে পারে। আগে যেগুলিকে কণিকা ভাবা হোত আজকাল সেগুলির চিত্রন তন্তু দিয়ে প্রবাহিত তরঙ্গের মতো, এর তুলনা করা যায় ঘুড়ির সুতো দিয়ে প্রবাহিত তরঙ্গের সঙ্গে। একটি কণিকা থেকে অন্য একটি কণিকা নির্গত হওয়া কিম্বা একটি কণিকার দ্বারা অন্য একটি কণিকা বিশোষিত হওয়া তন্তুর বিভক্ত হওয়া কিম্বা যুক্ত হওয়ার অনুরূপ। উদাহরণ: সূর্যের পৃথিবীর প্রতি মহাকর্ষীয় বলের ব্যাপার চিত্র ছিল সূর্যের একটি কণিকা থেকে একটি গ্র্যাভিটন (graviton) নির্গত হওয়া এবং পৃথিবীর একটি কণিকা কর্তৃক

সেটি বিশোষিত হওয়া (চিত্র– ১০.৫)। তন্তুতত্ত্বে এই পদ্ধতি H আকারের নলের (tube or pipe) অনুরূপ (চিত্র– ১০.৬) [অতএব অনেকটা জল কিম্বা গ্যাসের জন্য নল বসানোর

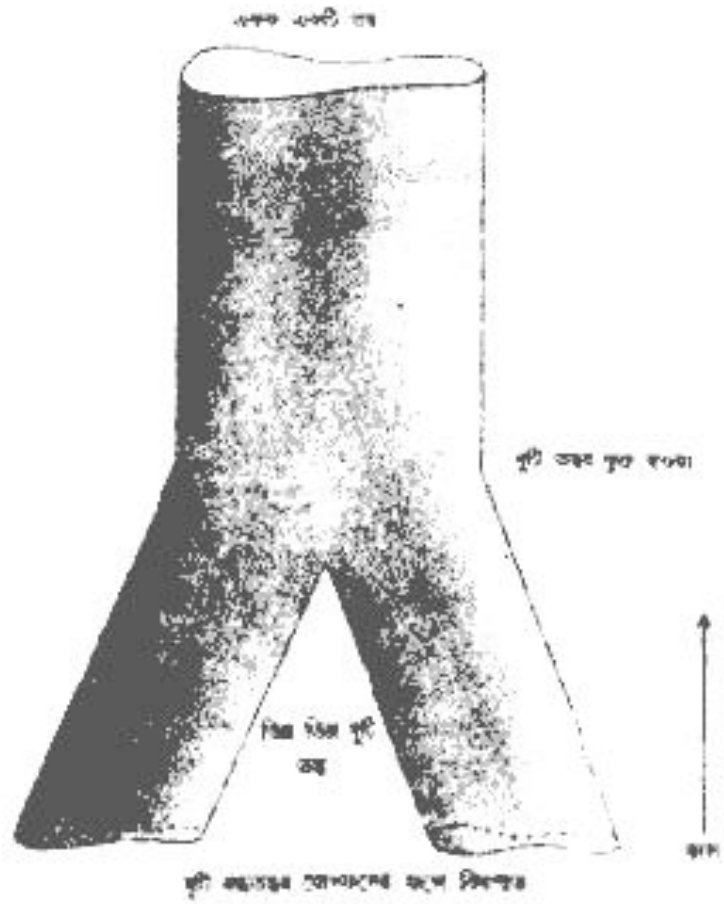

চিত্র - ১০.৪

কাজের মতো (plumbing)]। দুটি H-এর দুটি উল্লম্ব বাহু সূর্য এবং পৃথিবীর কণিকাগুলির অনুরূপ এবং আনুভূমিক (horizontal), আড়াআড়িভাবে অবস্থিত দণ্ড সূর্য এবং পৃথিবীর ভিতরে গমনাগমনশীল গ্রাভিটনের অনুরূপ।

তন্তুতত্ত্বের ইতিহাস অদ্ভুত। এ তত্ত্ব ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে আবিষ্কৃত হয়েছিল সবল (strong) বল ব্যাখ্যার জন্য একটি তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টার ফলে। চিন্তনটি ছিল: প্রোটন কিম্বা নিউট্রনের মতো কণিকাগুলিকে তন্তুর উপর তরঙ্গরূপে কল্পনা করা যায়। কণিকাগুলির অন্তর্বর্তী সবল বলগুলি (strong forces) হবে অন্যান্য তন্তুখণ্ডের ভিতর দিয়ে গতিশীল একাধিক তন্তুখণ্ডের অনুরূপ– মাকড়সার জালের মতো। এই তত্ত্ব অনুসারে কণিকাগুলির অন্তর্বর্তী সবল বলের পর্যবেক্ষণ করা মাপনের সমকক্ষ হতে হলে তন্তুগুলিকে রবার ব্যাণ্ডের মতো হতে হবে এবং তার আকর্ষণ (pull) হতে হবে দশ টন।

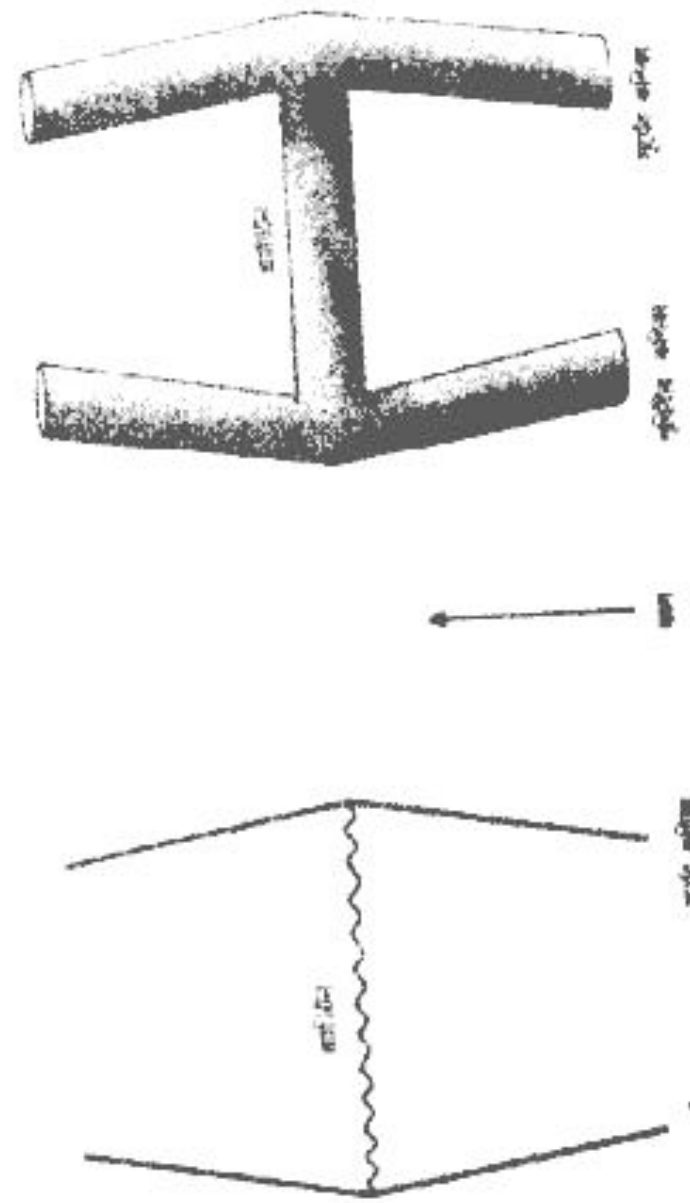

চিত্র - ১০.৫ এবং চিত্র - ১০.৬

১৯৭৪ সালে প্যারিসের জোল শার্ক (Joel Scherk) এবং ক্যালিফোর্নিয়ার ইন্সটিট্যুট অব টেকনোলজির জন শোয়ার্জ (John Schwarz) একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। সেই পত্রে তাঁরা দেখিয়েছিলেন তন্তুতত্ত্ব মহাকর্ষীয় বলের বিবরণ দিতে পারে শুধুমাত্র যদি তন্তুর বিততি (টান– tension) অনেক বেশী হয়– প্রায় এক হাজার মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান (একের পিঠে উনচল্লিশটা শূন্য) টন হয় তাহলে। স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের মানে তন্তুতত্ত্ব এবং ব্যাপক অপেক্ষবাদের ভবিষ্যদ্বাণী একেবারেই অভিন্ন হবে কিন্তু পার্থক্য হবে অত্যন্ত স্বল্প দূরত্বে অর্থাৎ এক সেন্টিমিটারের এক হাজার মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান ভাগের এক ভাগের কম হলে (এক সেন্টিমিটারকে একের পিঠে তেত্রিশটি শূন্য দিলে যে সংখ্যা হয় সেটি দিয়ে ভাগ করলে)। কিন্তু তাঁদের গবেষণা বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেনি, তার কারণ প্রায় সেই সময়ই অধিকাংশ লোক সবল বলের সপক্ষে মূল তন্তুতত্ত্ব পরিত্যাগ করেন। তাঁরা সমর্থন করেন কার্ক (quark) এবং গ্লুয়ন (Gluon) ভিত্তিক তত্ত্ব। মনে হয়েছিল পর্যবেক্ষণের ফলের সঙ্গে এই তত্ত্বেরই সামঞ্জস্য বেশী। শার্কের মৃত্যুর ব্যাপারটি বড়ই দুঃখের (তাঁর ডায়াবেটিস অর্থাৎ মধুমেহ ছিল। তিনি অজ্ঞান হয়ে যান– অর্থাৎ তাঁর হয় ডায়াবেটিক কোমা। তাঁকে ইনসুলিন ইঞ্জেকশন দেওয়ার মতো কেউ কাছাকাছি ছিল না)। সুতরাং শোয়ার্জ একলা পড়ে গেলেন। বোধহয় তিনিই ছিলেন তন্তুতত্ত্বের একমাত্র সমর্থক কিন্তু তখন তন্তুর প্রস্তাবিত বিততির মান অনেক বেশী।

১৯৮৪ সালে তন্তুর উপর আকর্ষণ হঠাৎ পুনরুজ্জীবিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে তার কারণ ছিল দুটি একটি ছিল: অতিমহাকর্ষ সীমিত কিন্তু আমরা যে কণিকাগুলি পর্যবেক্ষণ করি সেগুলি অতিমহাকর্ষ ব্যাখ্যা করতে পারে: এই দুটি বিষয় প্রদর্শনের ব্যাপারে আসলে কোনো অগ্রগতি হয়নি। অন্য কারণ ছিল: লন্ডনের কুইন মেরী কলেজের জন শোয়ার্জ (John Schwarz) এবং মাইক গ্রীন (Mike Green) একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এই গবেষণাপত্রে দেখানো হয়েছিল তন্তুতত্ত্ব হয়তো আমরা যে কণিকাগুলি পর্যবেক্ষণ করি সেগুলির ভিতরে যেগুলির গঠনগতভাবে বামমুখীতা আছে (built in left-handedness) সেরকম কণিকার অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। কারণ যাই হোক না কেন, অনতিবিলম্বে অনেকেই তন্তু নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন এবং এ তত্ত্বের একটি নতুন রূপ বিকাশ লাভ করে–তার নাম তথাকথিত হেটারোটিক তন্তু (heterotic string)। মনে হয়েছিল এ তন্তু আমাদের পর্যবেক্ষণ করা বিভিন্ন ধরনের কণিকা হয়তো ব্যাখ্যা করতে পারবে।

তন্তুতত্ত্বগুলিও অসীমের পূর্বগামী কিন্তু মনে হয় হেটারোটিক তন্তুর মতো বাঁকিবিতে এ তত্ত্বে সমস্ত অসীমই বাতিল হয়ে যাবে (যদিও এ ব্যাপারটা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায় না)। কিন্তু তন্তুগুলির একটি বৃহত্তর সমস্যা রয়েছে: তন্তু তত্ত্বগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে শুধুমাত্র যদি সাধারণ চারমাত্রা না থেকে স্থান-কালের দশ কিম্বা ছাব্বিশ মাত্রা থাকে। অবশ্য বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে স্থান-কালের অতিরিক্ত মাত্রা হামেশাই দেখা যায়। আসলে এই অতিরিক্ত মাত্রা এই কাহিনীগুলির প্রয়োজনীয় উপাদানের ভিতর প্রায় এসে যায়। আপেক্ষবাদের অন্তর্নিহিত অর্থ: আলোকের চাইতে দ্রুতগতিতে গমনাগমন সম্ভব নয়। সুতরাং অতিরিক্ত

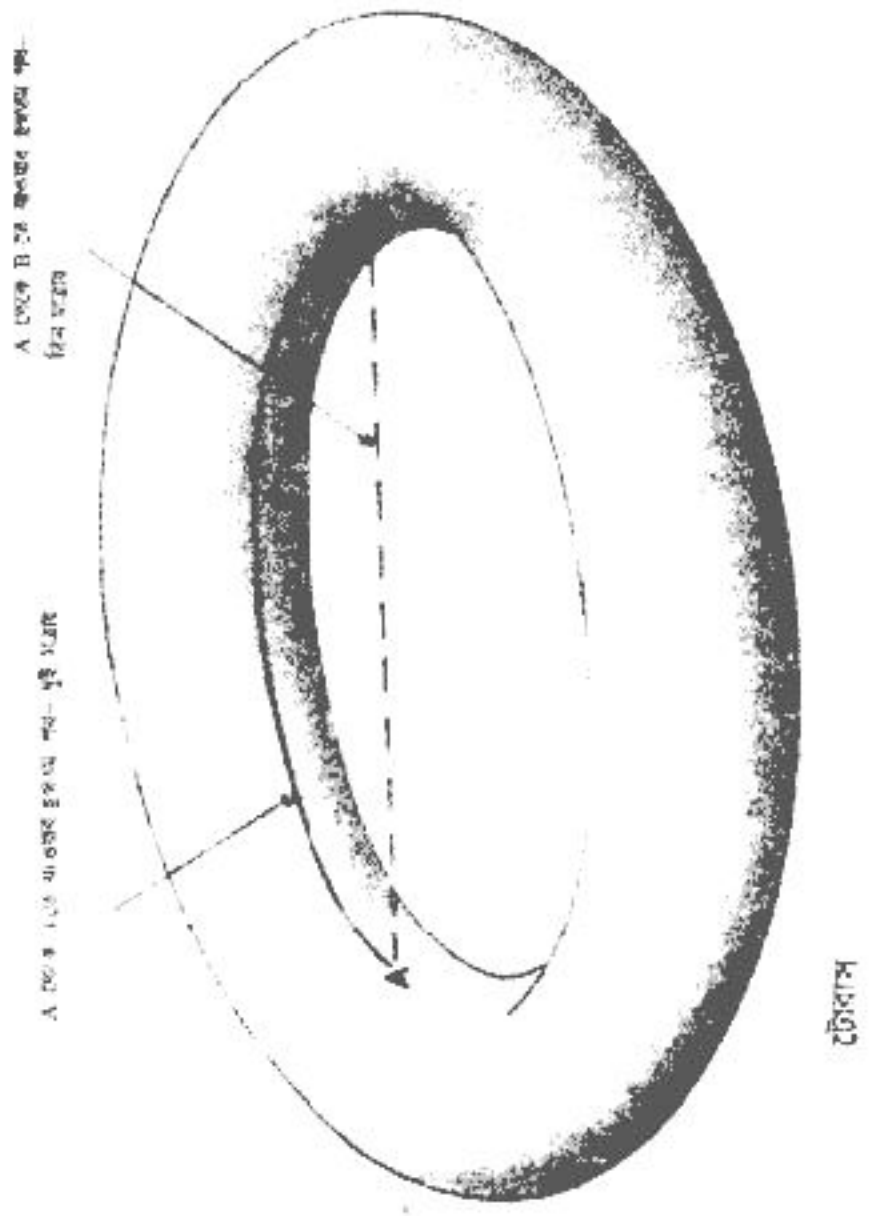

চিত্র - ১০.৭

মাত্রা না থাকলে তারকা এবং নীহারিকাগুলিতে যাতায়াত করতে বড় বেশী সময় লাগবে। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীগুলির চিন্তাধারা হল : হয়তো উচ্চতর মাত্রা (dimension) দিয়ে একটি সহজ হ্রস্ব পথ (short cut) পাওয়া যেতে পারে। ব্যাপারটা কল্পনা করা যেতে পারে নিম্নলিখিত রূপে : মনে করুন যে স্থানে আমরা বসবাস করি তার মাত্র দুটি মাত্রা আছে এবং সেটি নোঙর ফেলার আংটা কিম্বা টোরাসের (torus) পৃষ্ঠের মতো বঙ্কিম (চিত্র - ১০.৭)। আপনি যদি আংটার ভিতর দিকের কিনারার একপাশে থাকেন এবং অন্যদিকের কোনো এক বিন্দুতে যেতে চান তাহলে আপনার আংটার ভিতরের কিনারা দিয়ে ঘুরে যেতে হবে কিন্তু আপনার যদি তৃতীয় মাত্রায় (third dimension) ভ্রমণ সম্ভব হয় তাহলে আপনি সোজাসুজি অন্যদিকে যেতে পারেন।

এই সমস্ত অতিরিক্ত মাত্রার অস্তিত্ব যদি সম্ভব হয় তাহলে কেন সেগুলি আমাদের নজরে আসে না? কেন আমরা শুধুমাত্র স্থানের তিনটি এবং কালের একটি মাত্রা দেখতে পাই? ইঙ্গিতটি হল : অন্য মাত্রাগুলি বক্র হয়ে অত্যন্ত ক্ষুদ্র আয়তনের স্থানে রয়েছে। সেই স্থানের আয়তন প্রায় এক ইঞ্চির এক মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান ভাগের এক ভাগ। এগুলি এত ক্ষুদ্র যে আমাদের নজরেই আসে না। আমরা দেখতে পাই শুধুমাত্র একটি কালিক এবং তিনটি স্থানিক মাত্রা— সেক্ষেত্রে স্থান-কাল যথেষ্ট মসৃণ (fairly flat)। এটা প্রায় একটি কমলালেবুর বাইরের দিকটির মতো— কাছে থেকে দেখলে সবটাই বঙ্কিম এবং কুঞ্চিত কিন্তু দূর থেকে দেখলে উঁচু নিচু দেখতে পাওয়া যায় না; মনে হয় মসৃণ। স্থান-কালের ব্যাপারটাও সেইরকম— অত্যন্ত ক্ষুদ্র মাত্রায় দেখলে দশ মাত্রিক এবং অত্যন্ত বঙ্কিম কিন্তু বৃহত্তর মাত্রায় বক্রতা কিম্বা অতিরিক্ত মাত্রা দেখতে পাওয়া যায় না। এই চিত্রন সঠিক হলে সেটা হবে মহাকাশচারীদের কাছে একটি দুঃসংবাদ : অতিরিক্ত মাত্রাগুলি এত বেশী ক্ষুদ্র যে মহাকাশযান তার ভিতর দিয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু এই ব্যাপারটা আর একটি বৃহৎ সমস্যা উত্থাপন করছে। সব কটি মাত্রা না হয়ে শুধু কয়েকটি মাত্র মাত্রা কেন বক্র হয়ে ক্ষুদ্র গোলকের আকার ধারণ করবে? বোধ হয় মহাবিশ্বের অতি আদিমকালে সমস্ত মাত্রাই অত্যন্ত বক্র ছিল। কিন্তু কেন একটি কালিক মাত্রা এবং তিনটি স্থানিক মাত্রা সমতল হয়ে গেল অথচ অন্য মাত্রাগুলি কঠিন ভাবে বক্র হয়ে রইল?

একটি সম্ভাব্য উত্তর নরতন্ত্রীয় নীতি। দুটি স্থানিক মাত্রা আমাদের মতো জটিল জীব বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট মনে হয় না। উদাহরণ : যদি দ্বিমাত্রিক জীবরা এক মাত্রিক পৃথিবীতে বাস করে তাহলে অন্য কাউকে অতিক্রম করতে হলে তাদের অন্য জন্তুটির গায়ের উপর উঠে পার হতে হবে। দ্বিমাত্রিক জীব যদি এমন কিছু খায় যা সে সম্পূর্ণ হজম করতে পারবে না তাহলে খাদ্যের অবশিষ্টাংশ (মল - অনুবাদক) তাকে যে মুখে সে খেয়েছে সেই মুখ দিয়েই বের করে দিতে হবে। যদি দেহের ভিতরে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পথ থাকে তাহলে জন্তুটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। আমাদের দ্বিমাত্রিক জীব ভেঙে পড়বে। (চিত্র— ১০.৮) একইভাবে বলা যায় একটি দ্বিমাত্রিক জীবের রক্ত চলাচল কিভাবে হবে বোঝা কঠিন।

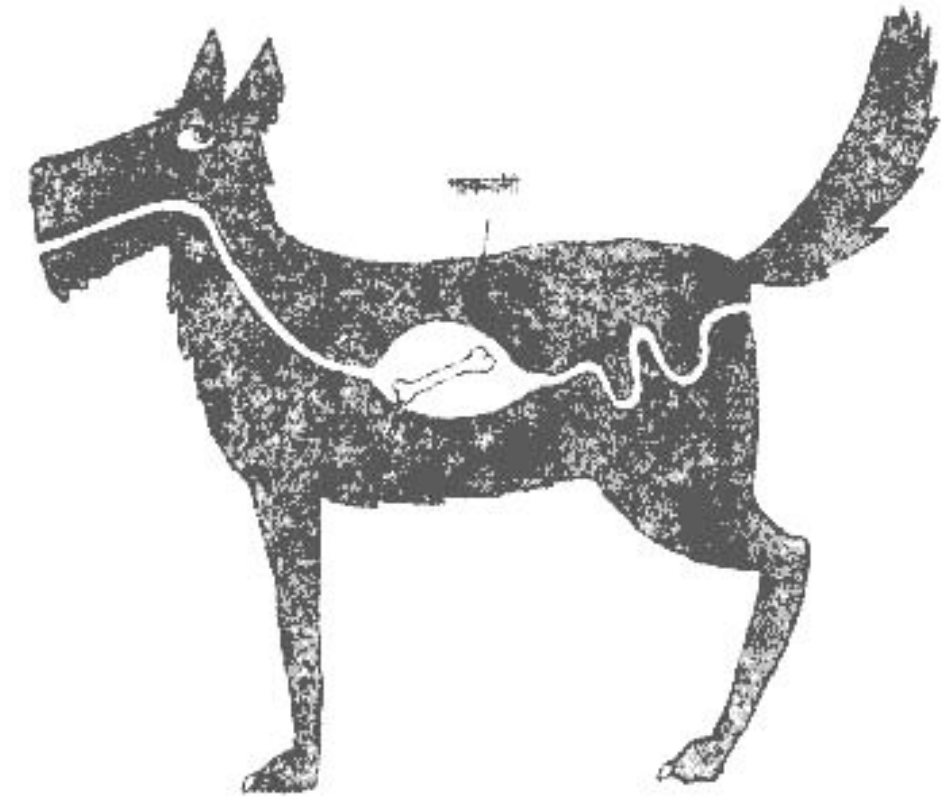

দ্বিমাত্রিক জীব

চিত্র - ১০.৮

তিনটির বেশী স্থানিক মাত্রা হলেও সমস্যা দেখা দেবে। দুটি বস্তুপিণ্ডের দূরত্বের বৃদ্ধির সঙ্গে অন্তর্বর্তী মহাকর্ষ বলের হ্রাসপ্রাপ্তি ত্রিমাত্রিক স্থানে মহাকর্ষীয় বলের ঐ অবস্থায় হ্রাস প্রাপ্তির তুলনায় অনেক বেশী হবে (দূরত্ব দ্বিগুণ হলে ত্রিমাত্রিক স্থানে মহাকর্ষীয় বল হ্রাস পেয়ে এক চতুর্থে পরিণত হয়, কিন্তু চারমাত্রিকে পরিণত হয় $\frac{1}{8}$ এ, পাঁচমাত্রিকে পরিণত হয় $\frac{1}{16}$ এ, এবং মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে মহাকর্ষীয় বলের হ্রাস প্রাপ্তি এভাবেই চলতে থাকে)। এই তথ্যের অর্থ হল : পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহের সূর্যের প্রদক্ষিণ করার কক্ষের স্থিরত্ব হ্রাস পাবে অর্থাৎ বৃত্তাকার কক্ষের সামান্যতম অস্থিরতা হলে (অন্যান্য গ্রহের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের ফলে যা হতে পারে) পৃথিবী সর্পিল গতিতে হয় সূর্য থেকে দূরে সরে যাবে নয়তো সূর্যের ভিতরে গিয়ে পড়বে। হয় আমরা ঠাণ্ডায় জমে যাব নয়তো পুড়ে যাব। আসলে তিনটির অধিক মাত্রা হলে দূরত্ব সাপেক্ষ মহাকর্ষের ঐ একই আচরণের অর্থ হবে চাপের সঙ্গে মহাকর্ষের ভারসাম্যের ফলে সূর্য যে স্থির অবস্থায় থাকে সেই স্থির অবস্থায় আর থাকতে পারবে না। হয় টুকরো টুকরো হয়ে যাবে নয়তো চুপসে কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হবে। যাই হোক না কেন পার্থিব জীবনের আলোক এবং তাপের উৎস হিসাবে সূর্য আর কোনো কাজে লাগবে না।

ক্ষুদ্রতর মনে বিচার করলে যে বৈদ্যুতিক বল ইলেক্ট্রনগুলিকে পরমাণুর কেন্দ্রককে আবর্তন করে ঘূর্ণায়মান রাখে সেই বলের আচরণও মহাকর্ষীয় বলের মতো হবে। ফলে হয় ইলেক্ট্রনগুলি পরমাণু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে পরমাণু থেকে নির্গত হবে কিম্বা সর্পিল গতিতে কেন্দ্রকে পতিত হবে। যাই হোক না কেন, যে পরমাণুকে আমরা চিনি সে পরমাণু আর আমরা পাব না।

সুতরাং স্পষ্টতই মনে হয় স্থান-কালের যে সমস্ত অঞ্চলে একটি কালিক এবং তিনটি স্থানিক মাত্রা কুঞ্চিত হয়ে ক্ষুদ্র হয়ে যায় নি একমাত্র সেই সমস্ত অঞ্চলেই প্রাণ অর্থাৎ আমরা প্রাণ বলতে যা বুঝি সেই রকম প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব। এর অর্থ হবে দুর্বল নরতীয় নীতির আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে তবে সে ক্ষেত্রে এ তত্ত্বতত্ত্ব যে অন্ততপক্ষে মহাবিশ্বে ঐরকম অঞ্চলের অস্তিত্ব অনুমোদন করে সেটি দেখাতে হবে— মনে হয় তত্ত্বতত্ত্ব এরকম অনুমোদন করে। মহাবিশ্বের অন্যান্য এরকম অঞ্চল কিম্বা এমন একাধিক মহাবিশ্ব (তার অর্থ যাই হোক না কেন) থাকার যথেষ্টই সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে সমস্ত মাত্রাই কুঞ্চনের ফলে ক্ষুদ্র কিম্বা যেখানে চারটি মাত্রাই প্রায় সমতল (flat), কিন্তু সেই সমস্ত অঞ্চলে দ্বিতীয় সংখ্যক কার্যকর মাত্রাগুলি পর্যবেক্ষণ করার মতো বুদ্ধিমান জীব থাকবে না।

স্থান-কালের প্রতীয়মান মাত্রার সংখ্যার প্রশ্ন ছাড়াও তন্ত্রতত্ত্বের আরো অনেকগুলি সমস্যা রয়েছে। তন্ত্রতত্ত্ব পদার্থবিদ্যার চূড়ান্ত ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বরূপে ঘোষিত হওয়ার আগে এই সমস্যাগুলি সমাধান করতে হবে। আমরা এখনও জানি না সমস্ত অসীম পরস্পরকে বাতিল করে কিনা। আমাদের পর্যবেক্ষণ করা বিশেষ ধরনের কণিকার সঙ্গে তন্ত্রর উপরের তরঙ্গগুলিকে কিভাবে সম্পর্কিত করতে হবে তাও আমরা জানি না। তবুও এই প্রশ্নগুলির উত্তর আগামী কয়েক বছরের ভিতরে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় এবং এ শতাব্দীর শেষাশেষি আমরা জানতে পারব তন্ত্রতত্ত্ব সত্যিই বহু আকাঙ্ক্ষিত পদার্থবিদ্যার ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব কি না।

কিন্তু এরকম ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব থাকা কি সত্যিই সম্ভব? না কি আমরা শুধুই মরীচিকার পিছনে ছুটছি? তিনটি সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয়:

(১) একটি সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব সত্যিই রয়েছে এবং আমরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান হলে কোনো না কোনোদিন সে তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারব।

(২) মহাবিশ্ব সম্পর্কে চূড়ান্ত কোনো তত্ত্ব নেই। শুধু রয়েছে বহু তত্ত্বের অসীম পরম্পরা, সে তত্ত্বগুলি ক্রমশই অধিকতর নির্ভুলভাবে মহাবিশ্বের বিবরণ দান করে।

(৩) মহাবিশ্বের কোনো তত্ত্ব নেই। একটি বিশেষ সীমার বাইরে ঘটনাবলী সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। ঘটনাগুলি ঘটে যাদৃচ্ছিক ভাবে, এলোমেলো ভাবে।

অনেকে হয়তো তৃতীয় সম্ভাবনার সপক্ষে বলবেন। তাঁদের যুক্তি, এরকম সম্পূর্ণ এক কেতা বিধি থাকলে সেগুলি ঈশ্বরের নিজের মনের পরিবর্তন করে বিশ্বে হস্তক্ষেপ করার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করত। এ ব্যাপারটি অনেকটা সেই প্রাচীন স্ববিরোধিতার মতো: ঈশ্বর কি এমন একটি পাথর তৈরী করতে পারেন যেটা এত ভারী যে তিনি নিজেই সেটা তুলতে পারেন না? ঈশ্বর তাঁর মনের পরিবর্তন করতে চাইতে পারেন এই চিন্তাধারা একটি হেত্বাভাসের

(fallacy) উদাহরণ। এদিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সেন্ট অগাস্টিন (Saint Augustine)। এই হেত্বাভাসটি হল ঈশ্বর কালে অবস্থান করেন এই কল্পন। আসলে ঈশ্বর যে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন কাল তার একটি ধর্ম মাত্র। অনুমান করা যেতে পারে তিনি যখন মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তখন নিজের মনের বাসনা তাঁর জানা ছিল।

কণাবাদী বলবিদ্যার (quantum mechanics) আবির্ভাবের পর আমরা মেনে নিয়েছি সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে ঘটনাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না এবং কিছু মাত্রায় অনিশ্চয়তা সব সময়ই থাকে। পছন্দ হলে এলোমেলো অনিশ্চয়তার দায়িত্ব ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের উপর আরোপ করা যেতে পারে। কিন্তু এই হস্তক্ষেপ হবে অদ্ভুত, কারণ এই হস্তক্ষেপ কোনো উদ্দেশ্যের অভিমুখে এরকম প্রমাণ নেই। যদি থাকত তাহলে সংজ্ঞা অনুসারেই একে এলোমেলো বলা যেত না। আধুনিক যুগে আমরা উপরে উল্লিখিত তৃতীয় সম্ভাবনাটি কার্যকর ভাবে দূর করেছি। এ সম্ভাবনা দূর করেছি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নতুনভাবে নির্দেশ করে: বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এমন এক কেতা বিধি গঠন করা যে বিধি আমাদের অনিশ্চয়তার নীতি দ্বারা নির্ধারিত সীমা অবধি ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা দান করবে।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল সংখ্যায় অসীম তত্ত্ব পরম্পরা রয়েছে এবং সে তত্ত্বগুলি ক্রমশই অধিকতর সংস্কৃত (refined) হয়ে চলেছে। এর সপক্ষে আমাদের এ পর্যন্ত সঞ্চিত সমস্ত অভিজ্ঞতার ঐক্য রয়েছে। অনেক সময় আমরা নিজেদের মাপনের সূক্ষ্মতা (sensitivity) বাড়িয়েছি কিম্বা নতুন শ্রেণীর পর্যবেক্ষণ করেছি, ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে নতুন এমন পরিঘটনা যেগুলি বর্তমান তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীতে নেই। এই পরিঘটনাগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের আবিষ্কার করতে হয়েছে অধিকতর অগ্রগামী তত্ত্ব। আধুনিক প্রজন্মের বৃহৎ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের দাবী: প্রায় ১০০ GeV এর বৈদ্যুতিক দুর্বল (electroweak) ঐক্যকারী শক্তি (unification energy) এবং এক হাজার মিলিয়ান মিলিয়ান GeV এর বৃহৎ ঐক্যকারী শক্তির (grand unified energy) মধ্যবর্তী অঞ্চলে নতুন কিছু ঘটবে না। এ দাবী যদি ভুল হয় তাহলে বিস্মিত হওয়ার কিছু থাকবে না। যে কর্ক (quark) এবং ইলেক্ট্রনকে আমরা এখন মৌলকণা বলে মনে করি, সত্যিই হয়তো আমরা তার চাইতে মূলগত গঠনের কয়েকটি নতুন স্তর আবিষ্কার করতে পারি।

কিন্তু মনে হয় "বাক্সের ভিতরে বাক্সের" এই পরম্পরাকে সীমিত করতে পারে মহাকর্ষ। যদি কোনো কণিকার শক্তি, যাকে প্লাঙ্ক শক্তি বলে, তার চাইতে অর্থাৎ দশ মিলিয়ান, মিলিয়ান, মিলিয়ান GeV (একের পিঠে উনিশটি শূন্য) এর চাইতে বেশী হয় তাহলে তার ভর এত ঘনীভূত (concentrated) হবে যে সে নিজেকে অবশিষ্ট মহাবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি ক্ষুদ্র কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হবে। সুতরাং অবশ্যই মনে হয় আমাদের উচ্চ থেকে উচ্চতর শক্তিতে গমনের ফলে ক্রমশ অধিকতর সংস্কৃত (refined) তত্ত্বের এই পরম্পরা সীমিত হওয়া উচিৎ এবং তাহলে উচিৎ মহাবিশ্ব সম্পর্কে একটি চূড়ান্ত তত্ত্বের অস্তিত্ব থাকাও। বর্তমানে আমরা গবেষণাগারে খুব বেশী হলে ১০০ GeV-এর কাছাকাছি শক্তি উৎপাদন করতে পারি। এই পরিমাণ শক্তির সঙ্গে প্লাঙ্ক শক্তির পার্থক্য অবশ্য বিরাট। নিকট ভবিষ্যতে আমরা কণিকা

তরুণ যন্ত্রের সাহায্যেও এই পার্থক্য দূর করতে পারব না। কিন্তু মহাবিশ্বের অতি আদিম অবস্থা এমন একটি ক্ষেত্র (arena) যেখানে এরকম শক্তির অস্তিত্ব ছিল। আমার মনে হয় আমাদের ভিতরকার কয়েকজনের জীবন কালের ভিতরেই আদিম মহাবিশ্ব বিষয়ক গবেষণা এবং গাণিতিক সামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয় উপাদানের সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের পথিকৃৎ হওয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য অনুমান করছি তার আগে আমরা নিজেদের সামগ্রিক ধ্বংস ডেকে আনব না।

যদি সত্যিই আমরা মহাবিশ্ব বিষয়ক চূড়ান্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করি তাহলে তার অর্থ কি হবে? প্রথম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল— এ বিষয়ে আমরা কখনোই নিশ্চিত হতে পারব না যে আমরা সত্যিই সঠিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছি, তার কারণ তত্ত্ব প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু তত্ত্বটি যদি গাণিতিক ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং সবসময়ই যদি সে তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে পর্যবেক্ষণের ঐক্য দেখা যায় তাহলে আমরা সঠিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছি এরকম বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত হবে। এই আবিষ্কার মহাবিশ্বকে বুঝবার প্রচেষ্টায় মানব জাতির বৌদ্ধিক সংগ্রামের দীর্ঘ এবং গৌরবময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটাবে। তাছাড়া এই আবিষ্কার সাধারণ মানুষের মহাবিশ্বের শাসনবিধি সম্পর্কিত বোধেও বিপ্লব নিয়ে আসবে। নিউটনের সময় একজন শিক্ষিত লোকের পক্ষে মানবজাতির সমগ্র জ্ঞান ভাণ্ডার সম্পর্কে একটি ধারণা থাকা সম্ভব ছিল, অন্ততপক্ষে সম্ভব ছিল সে ধারণার সাধারণ রূপরেখা (outline) সম্পর্কে ধারণা করা। কিন্তু তার পর থেকে বিজ্ঞানের বিকাশের গতির ফলে এরকম সম্ভাবনা আর নেই। নতুন নতুন পর্যবেক্ষণ ফলের কারণ দর্শানোর জন্য তত্ত্বগুলি সব সময়েই পরিবর্তিত হচ্ছে। সে তত্ত্বগুলি সাধারণ মানুষের বুঝবার মতো করে সঠিকভাবে হজম হয় না, সরলীকৃতও হয় না। বুঝতে হলে আপনাকে বিশেষজ্ঞ হতে হবে। কিন্তু তা হলেও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির অতি সামান্য অংশ সম্পর্কেই সম্যক জ্ঞানের আশা আপনি করতে পারেন। তাছাড়া বিকাশের গতি এত দ্রুত যে স্কুলে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যা শেখানো হয় সেগুলি সবসময়ই একটু সেকেলে। জ্ঞানের দ্রুত অগ্রসরমান সীমান্তের সঙ্গে সামান্য কয়েকজনই তাল রাখতে পারেন কিন্তু তাঁদেরও সমস্ত সময় ব্যয় করতে হয় এই কাজে এবং তাঁদের বিশেষজ্ঞ হতে হয় একটি ক্ষুদ্র বিষয়ে। যে অগ্রগতি হচ্ছে অথবা অগ্রগতির ফলে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে জনগণের অবশিষ্ট অংশের সে সম্পর্কে ধারণা থাকে অতি সামান্য। এডিংটনকে যদি বিশ্বাস করা যায় তাহলে বলতে হয় সত্তর বছর আগে ব্যাপক অপেক্ষবাদ বুঝতেন মাত্র দু'জন। এখনকার দিনে বহু অযুত (দশ হাজার) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এই তথ্য বোঝেন এবং বহু নিযুত (মিলিয়ান— দশ লক্ষ) মানুষের এই চিন্তন সম্পর্কে অন্ততপক্ষে একটি ধারণা আছে। যদি সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আবিষ্কার হয় তাহলে কালে কালে সে তত্ত্ব হজমও হবে আর সরলীকৃতও হবে এবং স্কুলেও পড়ানো হবে। অন্ততপক্ষে তার রূপরেখা তো পড়ানো হবেই। যে বিধি মহাবিশ্ব শাসন করে এবং আমাদের অস্তিত্বের জন্য দায়ী, আমরা সবাই সে বিধিগুলির কিছু কিছু বুঝতে পারব।

যদি আমরা সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব আবিষ্কারও করি তাহলে তার অর্থ এই হবে না

যে সাধারণভাবে আমরা ঘটনাগুলি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারব। তার দুটি কারণ। প্রথম কারণ কণাবাদী বলবিদ্যা আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতার উপর একটি সীমা আরোপ করে। এই সীমা অতিক্রম করার কোনো উপায় আমাদের নেই। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রথম গণ্ডি (সীমা) দ্বিতীয় গণ্ডির চাইতে কম অনতিক্রম্য। দ্বিতীয় গণ্ডির উৎস একটি সত্য(fact)। সেই সত্য অনুসারে খুব সহজ সরল পরিস্থিতি ছাড়া কোনো পরিস্থিতিতেই আমরা নির্ভুলভাবে সমীকরণগুলির সমাধান (solve the equation) করতে পারিনি (এমন কি আমরা নিউটনের মহাকর্ষীয় তত্ত্ব অনুসারে তিনটি বস্তুপিণ্ডের গতি সম্পর্কীয় সমীকরণ নির্ভুলভাবে সমাধান করতে পারি না, বস্তুপিণ্ডের সংখ্যা এবং তত্ত্বের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সমাধানের অসুবিধাও বৃদ্ধি পায়)। অত্যন্ত চরম পরিস্থিতি ছাড়া অন্যান্য সমস্ত পরিস্থিতিতেই পদার্থের আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী বিধিগুলি আমাদের এখন জানা। বিশেষ করে আমরা জানি সম্পূর্ণ রসায়ন শাস্ত্র এবং জীববিজ্ঞানের মৌলিক বিধিগুলির ভিত্তি। তবুও আমরা এই বিষয়গুলিকে সমাধান করা সমস্যার স্তরে নিশ্চয়ই নামিয়ে আনতে পারিনি। এখন পর্যন্ত গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে মানবিক আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার ব্যাপারে আমাদের সামান্যই সাফল্য হয়েছে। সুতরাং যদি আমরা সম্পূর্ণ এক কেতা বিধি আবিষ্কারও করি তাহলেও তার পরবর্তী কালের জন্য থেকে যাবে আমাদের বুদ্ধিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করার মতো কর্মের দায়িত্ব। সে কর্ম হল জটিল এবং বাস্তব পরিস্থিতিগুলির সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কার্যকর ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা লাভের জন্য উন্নততর আসন্নতা (approximation) লাভের পদ্ধতি আবিষ্কার (better approximation methods)। একটি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব শুধুমাত্র প্রথম ধাপ : আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল : আমাদের নিজস্ব অস্তিত্ব এবং আমাদের সর্বপার্শ্বের ঘটনাবলী সম্পূর্ণ বোঝা।

১১

উপসংহার

(Conclusion)

আমরা দেখতে পাই একটি বিভ্রান্তিকর জগতে আমাদের বাস। আমাদের সবদিকে আমরা যা দেখতে পাই আমরা চাই তার একটি অর্থ খুঁজতে আর প্রশ্ন করতে চাই : এই মহাবিশ্বের ধর্ম (nature) কি ? এখানে আমাদের স্থান কি ? কোথা থেকে এটা এল ? আমরাই বা এলাম কোথা থেকে ? পৃথিবীটা যেমন, কেন তেমন হল ?

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা একটি "বিশ্বচিত্র" (world picture) গ্রহণ করি। বহু কচ্ছপ দিয়ে তৈরী অসীম উচ্চ একটি স্তম্ভের উপর সমতল পৃথিবী স্থাপিত রয়েছে যেমন, সেরকম একটি চিত্র, অতিতন্ত্র (super string) তত্ত্বও তেমনি একটি চিত্র। দুটিই মহাবিশ্ব বিষয়ক তত্ত্ব তবে প্রথম তত্ত্বটির তুলনায় শেষেরটি অনেক বেশী গাণিতিক এবং স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট (precise)। দুটি তত্ত্বের কোনোটির সপক্ষেই পর্যবেক্ষণলব্ধ সাক্ষ্য নেই ; বিরাট একটি কচ্ছপ পৃথিবীকে পিঠে করে রয়েছে এরকম কেউ কখনো দেখেনি কিন্তু একটি অতিতন্ত্রও কেউ দেখেনি। তবে কচ্ছপতত্ত্ব একটি উত্তম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হয়ে উঠতে পারেনি, তার কারণ এ তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে পৃথিবীর কিনারা থেকে পড়ে যাওয়া সম্ভব। এ ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে অভিজ্ঞতা মেলেনি অবশ্য যাঁরা বারমুডা ত্রিভুজে (Bermuda Triangle) অদৃশ্য হয়েছেন বলে অনুমান করা হয় তাঁদের সেই অদৃশ্য হওয়ার ব্যাখ্যা যদি পৃথিবীর কিনারা থেকে পড়ে যাওয়া না হয়।

মহাবিশ্বের বিবরণ দেওয়া এবং মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার প্রাচীনতম প্রচেষ্টা ছিল যে চিন্তাধারা– সে চিন্তাধারা অনুসারে ঘটনাবলী এবং স্বাভাবিক পরিঘটনা কয়েকটি সত্তার (spirit) নিয়ন্ত্রণে। তাদের ভাবাবেগ ছিল মানুষেরই মতো এবং মানুষেরই মতো ছিল তাদের ক্রিয়াকর্ম। তাদের সে ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা ছিল অসম্ভব। এই সত্তাগুলি নদী, পাহাড়,

অন্তরীক্ষের বস্তুপিণ্ড (celestial bodies) ইত্যাদি স্বাভাবিক বস্তুতে অধিষ্ঠান করতেন—এর ভিতরে চন্দ্র সূর্যও ছিল। ঋতুর আবর্তন এবং জমির উর্বরতা নিশ্চিত করার জন্য তাঁদের শান্ত করা এবং তাঁদের আনুকূল্য ভিক্ষা করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ক্রমশ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করা গিয়েছিল কিছু কিছু নিয়মের অস্তিত্ব। যেমন: সূর্য সবসময়ই পূর্ব দিকে ওঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। সূর্যদেবতাকে পূজা করা হোক কি না হোক তাতে কিছু এসে যায় না। তাছাড়া সূর্য, চন্দ্র এবং বিভিন্ন গ্রহ আকাশে স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট পথে চলে এবং তাদের চলন সম্পর্কে যথেষ্ট নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। তা সত্ত্বেও চন্দ্র, সূর্য দেবতা হতে পারেন কিন্তু সে দেবতারা কঠোর নিয়মানুবর্তী বিধি মেনে চলেন— মেনে চলেন আপাতদৃষ্টিতে কোনো রকম ব্যতিক্রম ছাড়াই। অবশ্য যদি জোসুয়ার (Joshua) জন্য সূর্যের থেমে যাওয়ার কাহিনী বিশ্বাস না করা যায়।

প্রথমে এই নিয়ম এবং বিধিগুলি শুধুমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং অন্যান্য কয়েকটি পরিস্থিতিতে সুস্পষ্ট ছিল। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে গত তিনশ বছরে, ক্রমশ বেশী বেশী নিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সমস্ত বিধির সাফল্যের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লাপ্লাস (Laplace) বৈজ্ঞানিক নিমিত্তবাদ (scientific determinism)* নামক স্বীকার্য (postulate) মেনে নেন। তাঁর বক্তব্যের ইঙ্গিত ছিল: যে কোনো এক সময়ে মহাবিশ্বের গঠন জানা থাকলে মহাবিশ্বের বিবর্তন নির্দিষ্ট স্পষ্টরূপে (precisely) নির্ধারণ করে এরকম এক কেতা বিধির (set of laws) অস্তিত্ব থাকবে।

লাপ্লাসের নিমিত্তবাদের দুটি অসম্পূর্ণতা ছিল। এই নিমিত্তবাদ বলেনি কি ভাবে বিধিগুলি বেছে নেওয়া হবে, তাছাড়া পৃথিবীর প্রাথমিক গঠন (configuration) কি রকম ছিল সেটাও নির্দিষ্টভাবে বলেনি। এগুলি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ঈশ্বরের উপর। ঈশ্বরই ঠিক করবেন পৃথিবী কিভাবে শুরু হয়েছিল এবং কি কি বিধি মহাবিশ্ব মেনে নিয়েছিল কিন্তু মহাবিশ্ব একবার শুরু হওয়ার পর তিনি আর হস্তক্ষেপ করবেন না। কার্যত যে সমস্ত অঞ্চল উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের বোঝার ক্ষমতার অতীত ছিল সেই সমস্ত অঞ্চলেই ঈশ্বরকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

আমরা এখন জানি লাপ্লাসের নিমিত্তবাদের আশা বাস্তবায়িত হতে পারে না। অন্ততপক্ষে যে শর্তাবলী তাঁর মনে মনে ছিল সে শর্তাবলী অনুসারে তো নয়ই! কণাবাদী বলবিদ্যার অনিশ্চয়তার নীতির নিহিতার্থ হল: একটি কণার অবস্থান এবং গতিবেগের মতো কয়েকটি সংখ্যার জোড়ের (pairs of quantities) দুটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়।

কণাবাদী বলবিদ্যা এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করে এক শ্রেণীর কণাবাদী তত্ত্বের মাধ্যমে। এই তত্ত্বগুলিতে কণাগুলির যথাযথ ভাবে নির্ধারিত অবস্থান এবং গতিবেগ থাকে না, এগুলির প্রতিনিধিত্ব করে একটি তরঙ্গ। এই কণাবাদী তত্ত্বগুলি নিমিত্তবাদী (deterministic) অর্থাৎ তারা কালের সঙ্গে তরঙ্গের বিবর্তনের বিধি প্রদান করে। সুতরাং একটি কালে তরঙ্গটিকে জানা থাকলে অন্য একটি কালে সেটিকে গণনা করা যেতে পারে। ভবিষ্যদ্বাণীর

*Scientific Determinism: সব ঘটনাই মানুষের ইচ্ছাবহির্ভূত কোনো না কোনো নিমিত্ত হইতে উদ্ভূত—এই দার্শনিক মতবাদ।— অনুবাদক

অতীত এলোমেলো উপাদান তখনই আসে যখন আমরা চেষ্টা করি কণিকার অবস্থান এবং গতিবেগের বাহ্যিকতে তরঙ্গকে ব্যাখ্যা করতে। হয়তো সেটা আমাদেরই ভুল: হয়তো কণিকার অবস্থান এবং গতিবেগ বলে কিছু নেই, আছে শুধু তরঙ্গ। আমরা তরঙ্গগুলিকে শুধুমাত্র আমাদের পূর্বকল্পিত অবস্থান এবং গতিবেগের ধারণার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করি। তার ফলে খাপ খাওয়ানোতে যে গোলমাল হয় সেটাই ভবিষ্যদ্বাণীর অতীত হওয়ার আপাতদৃষ্ট কারণ।

কার্যত আমরা বিজ্ঞানের কর্তব্য পুনর্নির্ধারণ করেছি। সে কর্তব্য হল এমন বিধি আবিষ্কার করা যার সাহায্যে আমরা অনিশ্চয়তার বিধি দ্বারা নির্ধারিত সীমান্ত পর্যন্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারব। কিন্তু প্রশ্নটি থেকে যায়: মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা এবং বিধিগুলি বেছে নেওয়া হয়েছিল কি করে এবং কেন?

যে বিধিগুলি মহাকর্ষ নিয়ন্ত্রণ করে এই বইয়ে সেই বিধিগুলির উপর আমি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। তার কারণ, চার জাতীয় বলের ভিতরে মহাকর্ষ সবচাইতে দুর্বল হলেও মহাকর্ষই বৃহৎ মানে (large scale) মহাবিশ্বের গঠন নির্ধারণ করে। প্রায় আধুনিক কাল পর্যন্ত ধারণা ছিল কালের সঙ্গে মহাবিশ্বের কোনো পরিবর্তন হয় না। এই চিন্তাধারার সঙ্গে মহাকর্ষীয় বিধি খাপ খায় না। মহাকর্ষ যে সবসময়ই আকর্ষণ করে এই ঘটনার অর্থ: মহাবিশ্ব হয় প্রসারিত হচ্ছে নয়তো সঙ্কুচিত হচ্ছে। ব্যাপক অপেক্ষবাদ অনুসারে অতীতে একটি অসীম ঘনত্বের অবস্থা নিশ্চয়ই ছিল এবং ছিল বৃহৎ বিস্ফোরণ (Big Bang)। সেটা হোত কালের কার্যকর আরম্ভ। একইভাবে বলা যায় সমগ্র মহাবিশ্ব আবার চুপসে গেলে ভবিষ্যতে আর একটি অসীম ঘনত্বের অবস্থা আসবে। সেটা হবে বৃহৎ সঙ্কোচন (big crunch) এবং সেটাই হবে সময়ের অন্ত। যদি সমগ্র বিশ্ব আবার নাও চুপসে যায় তাহলে যে কোনো স্থানিক অঞ্চলে অনন্যতা দেখা দেবে এবং সেটা চুপসে গিয়ে কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি করবে। এই কৃষ্ণগহ্বরগুলির ভিতরে যারা পড়বে তাদের ক্ষেত্রে সেই পতন হবে কালের অন্তিম। বৃহৎ বিস্ফোরণে এবং অন্যান্য অনন্যতাগুলিতে সমস্ত বিধি ভেঙে পড়ে সুতরাং কি ঘটেছিল এবং কিভাবে মহাবিশ্ব শুরু হয়েছিল সে ব্যাপারে ঈশ্বরের তখনো সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে।

কণাবাদী বলবিদ্যার সঙ্গে ব্যাপক অপেক্ষবাদ সংযুক্ত করলে এমন একটি সম্ভাবনা মনে আসে যে সম্ভাবনা আগে ছিল না। যেমন: স্থান এবং কাল একত্রে অনন্যতাবিহীন এবং সীমানাবিহীন অথচ সীমিত এবং চারমাত্রিক স্থান গঠন করতে পারে। সেটা হবে পৃথিবী পৃষ্ঠের মতো কিন্তু তার মাত্রা (dimension) হবে বেশি। মহাবিশ্বে যে সমস্ত অবয়ব পর্যবেক্ষণ করা যায় তার অনেকগুলিই মনে হয় সেই চিন্তন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়— যেমন বৃহৎ মাত্রায় (large scale) সমরূপত্ব এবং স্বল্পতর মাত্রায় (small scale) সমরূপত্ব থেকে বিচ্যুতি—যেমন নীহারিকা, তারকা এবং মানুষ। আমরা যে কালের তীর দেখতে পাই সেটাও হয়তো এই চিন্তন ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু মহাবিশ্ব যদি সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, যদি কোনো অনন্যতা (singularities) কিম্বা সীমানা না থাকে এবং যদি একটি ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের সাহায্যে তার বিবরণ দেওয়া যায়, তাহলে স্রষ্টা ঈশ্বরের ভূমিকা সম্পর্কে তার নিহিতার্থ হয় গভীর।

আইনস্টাইন একবার প্রশ্ন করেছিলেন– "মহাবিশ্ব গঠনে ঈশ্বরের কতটুকু স্বাধীনতা (choice) ছিল?" যদি সীমানাহীনতার প্রস্তাব নির্ভুল হয় তাহলে প্রাথমিক অবস্থা নির্বাচনে প্রায় কোনো স্বাধীনতাই তাঁর ছিল না। তা সত্ত্বেও অবশ্য যে বিধিগুলি মহাবিশ্ব মেনে চলবে সে বিধিগুলি নির্বাচনের স্বাধীনতা তাঁর থাকত কিন্তু বাস্তবে বেছে নেওয়ার এ স্বাধীনতাও হয়তো খুব বেশী একটা কিছু হোত না। হয়তো হেটারোটিক (heterotic) তত্ত্বের মতো শুধুমাত্র একটি কিম্বা সমানা কয়েকটি সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব থাকত, সেগুলিও হয়তো অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য থাকত এবং সে তত্ত্ব হয়তো মানুষের মতো জটিল গঠনের জীবের অস্তিত্ব অনুমোদন করত। সে মানুষ এমন জীব যে তারা মহাবিশ্বের বিধি অনুসন্ধান করতে পারে এবং ঈশ্বরের ধর্ম (nature of God) নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে।

যদি একটিই সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব থাকে তাহলে সেটাও হবে কয়েক কোটা নিয়ম এবং সমীকরণ (set of rules and equations)। কি এই সমীকরণগুলিকে জীবনদান করে এবং তাদের জীবন দান করার জন্য মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে? বিজ্ঞানের সাধারণ পদ্ধতি হল একটি গাণিতিক প্রতিরূপ গঠন করা। কিন্তু সে প্রতিরূপ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না: প্রতিরূপ বিবরণ দেবে সেইজন্য একটি মহাবিশ্ব থাকবে কেন? অস্তিত্বের ঝামেলা মহাবিশ্ব কেন নিতে গেল? ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব কি এমনই ক্ষমতাশালী (compelling) যে সে নিজেরই অস্তিত্ব নিয়ে আসতে পারে? না কি এর জন্য একটি স্রষ্টা দরকার? তাই যদি হয় তাহলে মহাবিশ্বের উপর তাঁর আর কি অভিক্রিয়া থাকতে পারে? তাছাড়া তাঁকে কে সৃষ্টি করেছিল?

এখন পর্যন্ত অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকরা মহাবিশ্বের প্রকৃতি নিয়ে তত্ত্ব গঠনে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু কেন এই মহাবিশ্ব– এ প্রশ্ন করার সময় তাঁদের হয়নি। অন্যদিকে এ প্রশ্ন করা যাঁদের কাজ সেই দার্শনিকরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে পারেন নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দার্শনিকরা ভাবতেন বিজ্ঞান তথা সমগ্র মানব জ্ঞান ভাণ্ডারই তাঁদের কর্মক্ষেত্র। তাঁরা এই ধরনের প্রশ্ন করতেন: মহাবিশ্বের কি কোনো আরম্ভ ছিল? কিন্তু উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়াল অতিরিক্ত গাণিতিক এবং বিশেষ ধরন প্রযুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক। সেইজন্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ছাড়া দার্শনিক কিম্বা অন্য যে কোনো মানুষের কাছেই সে বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়াল অনধিগম্য। দার্শনিকরা তাঁদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র এতই কমিয়ে আনলেন যে এই শতাব্দীর সত্তরে বিখ্যাত দার্শনিক উইটগেনস্টাইন (Wittgenstein) বলছেন– "দর্শনের কর্মক্ষেত্রের ভিতরে একমাত্র অবশিষ্ট ক্ষেত্র ভাষা বিশ্লেষণ"। অ্যারিস্টোটল ও কান্টের বিরাট ঐতিহ্যের কি অধঃপতন!

কিন্তু আমরা যদি সম্পূর্ণ একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করি তাহলে শুধুমাত্র কয়েকজন বৈজ্ঞানিকেরই নয়, কালে কালে সে তত্ত্ব বোধগম্য হওয়া উচিৎ সবার, অন্ততপক্ষে বোধগম্য হওয়া উচিত সে তত্ত্বের মূল দেখাগুলি। তাহলে আমরা, দার্শনিকরা, বৈজ্ঞানিকরা, এমন কি সাধারণ মানুষরাও এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারব: আমাদের এবং মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কারণ কি? আমরা যদি এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই তাহলে সেটাই হবে মানবিক যুক্তির চূড়ান্ত জয়– তার কারণ তখন আমরা জানতে পারব ঈশ্বরের মন।

ঝগড়া বেড়ে চলছিল। সেই সময় লীবনিজ একটি ভুল করলেন। তিনি ঝগড়া মেটানোর জন্য আপীল করলেন রয়্যাল সোসাইটির কাছে। প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিউটন অনুসন্ধানের জন্য একটি 'নিরপেক্ষ' কমিটি গঠন করেন। ঘটনাচক্রে কমিটির সবাই ছিলেন নিউটনের বন্ধু। কিন্তু এটাই সব নয়। তারপর নিউটন কমিটির রিপোর্টটি নিজেই লেখেন এবং রয়্যাল সোসাইটিকে দিয়ে প্রকাশ করান। সরকারীভাবে লীবনিজকে কুম্ভীলক* (plagiarist) বলে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। এতেও খুশী না হয়ে নিউটন রয়্যাল সোসাইটির নিজস্ব পত্রিকায় লেখকের নাম না দিয়ে ঐ রিপোর্টের একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন। শোনা যায়, লীবনিজের মৃত্যুর পর নিউটন বলেছিলেন-- "লীবনিজের মন ভেঙে দিয়ে (breaking his heart) তিনি খুব খুশী হয়েছেন।"

এই দুটি দ্বন্দ্বের আগেই নিউটন কেম্ব্রিজ এবং পণ্ডিত সমাজ ত্যাগ করেছেন। তিনি কেম্ব্রিজে এবং পরবর্তীকালে পার্লামেন্টে ক্যাথলিক বিরোধী রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে রাজকীয় টাঁকশালের (Royal Mint) ওয়ার্ডেন (Warden) পদ দেওয়া হয়। এই পদে প্রচুর অর্থাগমের সুযোগ ছিল। এই পদে থাকার সময় তিনি তাঁর কুটিলতা এবং তীব্র বিদ্বেষের প্রতিভা সামাজিকভাবে অনেক গ্রহণীয় কর্মে নিয়োগ করেন। এখানে তিনি সাফল্যের সঙ্গে জালিয়াতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এবং বেশ কয়েকজনকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

---

*কুম্ভীলক— যে অন্যের লেখা নিজের নামে চালায়, Plagiarist.

শব্দকোষ

(Glossary)

Absolute Zero	:	চরম শীতলতা-- সম্ভাব্য সর্বনিম্ন তাপমাত্রা— এ অবস্থায় বস্তুতে কোনো তাপশক্তি থাকে না।
Acceleration	:	ত্বরণ— যে হারে একটি বস্তুপিণ্ডের গতিবেগের পরিবর্তন হয়।
Anthropic Principle	:	নরতীয় নীতি— আমরা মহাবিশ্বকে যেভাবে দেখি সেভাবে দেখার কারণ এটা যদি অন্যরকম হোত তাহলে পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমরা এখানে থাকতাম না।
Ant particle	:	বিপরীত কণিকা— প্রত্যেক ধরনের পদার্থকণিকার অনুরূপ একটি বিপরীত কণিকা আছে। কণিকার সঙ্গে বিপরীত কণিকার সংঘর্ষ হলে তারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অবশিষ্ট থাকে শুধুমাত্র শক্তি।
Atom	:	পরমাণু-- সাধারণ পদার্থের মূলগত একক— অতিক্ষুদ্র একটি কেন্দ্রক (তাতে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন) এবং সেটাকে প্রদক্ষিণরত কয়েকটি ইলেক্ট্রন দিয়ে এগুলি তৈরী।
Big Bang	:	বৃহৎ বিস্ফোরণ- মহাবিশ্বের আরম্ভের অনন্যতা।
Big Crunch	:	বৃহৎ সঙ্কোচন-- মহাবিশ্বের অস্তিত্বের অনন্যতা।
Black hole	:	কৃষ্ণগহ্বর-- স্থান-কালের এমন অঞ্চল যেখানে মহাকর্ষ এত বেশী শক্তিশালী যে সেখান থেকে কিছুই নির্গত হতে পারে না— এমনকি আলোকও নির্গত হয় না (ষষ্ঠ অধ্যায়)।
Chandrashekhar limit	:	চন্দ্রশেখর সীমা— একটি স্থিতিশীল শীতল তারকার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ভর। ভর এর চাইতে বেশী হলে তারকাটি চুপসে কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হবে।

Conservation of energy : শক্তির নিত্যতা— বিজ্ঞানের সেই বিধি যে বিধি অনুসারে শক্তি (কিম্বা তার তুল্যমানের ভর) সৃষ্টিও করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না।

Coordinates : মাত্রা— যে সংখ্যাগুলি স্থানে এবং কালে একটি বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করে।

Cosmological constant : মহাবিশ্বতাত্ত্বিক ধ্রুবক— স্থান-কালকে একটি অন্তর্নিহিত সম্প্রসারণ প্রচেষ্টা দান করার জন্য আইনস্টাইন ব্যবহৃত একটি গাণিতিক কৌশল।

Cosmology : মহাবিশ্বতত্ত্ব— সমগ্র মহাবিশ্ব সম্বন্ধীয় তত্ত্ব-গবেষণা।

Electric charge : বৈদ্যুত আধান— কণিকার এমন একটি ধর্ম যার জন্য কণিকাটি সমরূপ (similar) (কিম্বা বিপরীত) চিহ্নযুক্ত আধানকে বিকর্ষণ (কিম্বা আকর্ষণ) করে।

Electromagnetic force : বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল— বৈদ্যুত আধানসম্পন্ন একাধিক কণিকার মধ্যবর্তী যে বলের উদ্ভব হয়। চারটি মূলগত শক্তির ভিতরে শক্তিমত্তায় দ্বিতীয়।

Electron ইলেক্ট্রন— অপরা (negative) বৈদ্যুতিক আধান (negative charge) যুক্ত একরকম কণিকা। এগুলি পরমাণুর কেন্দ্রককে প্রদক্ষিণ করে।

Electroweak unification energy : বৈদ্যুৎ দুর্বল ঐক্যকারী শক্তি— যে বলের তুলনায় (প্রায় ১০০ Ge V) বৃহত্তর হলে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল এবং দুর্বল বলের ভিতরকার পার্থক্য লুপ্ত হয়।

Elementary particle : মৌলকণা— বিশ্বাস করা হয়, এই কণাগুলির আর বিভাজন সম্ভব নয়।

Event : ঘটনা— স্থান এবং কাল দিয়ে নির্দিষ্ট স্থান-কালের একটি বিন্দু।

Event horizon : ঘটনা দিগন্ত— কৃষ্ণগহ্বরের সীমানা।

Exclusion principle : অপবর্জন তত্ত্ব— দুটি সমরূপ চক্রণ $\frac{১}{২}$ কণিকার দুটিরই একই অবস্থান এবং একই গতিবেগ থাকতে পারে না (অনিশ্চয়তার নীতি দ্বারা নির্ধারিত সীমার ভিতরে)।

Field : ক্ষেত্র— এমন একটি জিনিষ যার স্থান-কালে সর্বব্যাপী অস্তিত্ব থাকে। কণিকা এর বিপরীত—এককালে একটি মাত্র বিন্দুতে এর অস্তিত্ব।

Frequency : স্পন্দাঙ্ক— প্রতি সেকেণ্ডে সম্পূর্ণ স্পন্দনের সংখ্যা।

Gamma ray : অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য সম্পন্ন বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ—তেজস্ক্রিয় অবক্ষয় কিম্বা মৌলকণাগুলির সংঘর্ষের ফলে এগুলি তৈরী হয়।

General relativity : ব্যাপক অপেক্ষবাদ— আইনস্টাইনের তত্ত্ব। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে রয়েছে এই চিন্তন : প্রতিটি পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ (তাঁরা যেভাবেই চলমান হোন না কেন) বিজ্ঞানের বিধিগুলি অভিন্ন থাকবে। চারমাত্রিক স্থান-কালের বক্রতার বাধিধির সাহায্যে এই তত্ত্ব মহাকর্ষীয় বলকে ব্যাখ্যা করে।

Geodesic : হ্রস্ব ব্যবধান কিম্বা অল্পান্তরী— দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী হ্রস্বতম (কিম্বা দীর্ঘতম) পথ।

Grand unification energy : মহান ঐক্যকারী শক্তি— এমন শক্তি যার চাইতে বৃহত্তর শক্তি হলে (বিশ্বাস করা হয়) বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল, দুর্বল বল, এবং সবল বলের পরস্পরের ভিতরকার পার্থক্য বোঝা যায় না।

Grand Unified Theory (GUT) : মহান ঐক্যবদ্ধ তত্ত্ব— যে তত্ত্ব বৈদ্যুৎচুম্বকতত্ত্ব, সবল বল এবং দুর্বল বলকে ঐক্যবদ্ধ করে।

Imaginary time : কাল্পনিক কাল— কাল্পনিক সংখ্যা ব্যবহার করে যে কাল মাপা হয়।

Light cone : আলোক শঙ্কু— স্থান-কালের এমন একটি পৃষ্ঠ যে পৃষ্ঠ একটি বিশেষ ঘটনার মধ্য দিয়ে চলমান আলোকরশ্মির সম্ভাব্য অভিমুখ নির্দেশ করে।

Light-second (Year) : আলোক এক সেকেণ্ডে (বছরে) যে দূরত্ব অতিক্রম করে।

Magnetic field : চৌম্বক ক্ষেত্র— যে ক্ষেত্র চৌম্বক বলের জন্য দায়ী। ইদানীং বৈদ্যুৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে একত্রে বৈদ্যুৎ চুম্বক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

Mass : ভর– একটি বস্তুপিণ্ডে পদার্থের পরিমাণ। তার জড়ত্ব (inertia) কিম্বা ত্বরণের (acceleration) প্রতিবন্ধ (resistance)।

Microwave background radiation : পশ্চাৎপট মাইক্রোতরঙ্গ বিকিরণ– আদিম উত্তপ্ত মহাবিশ্বের দীপ্তি থেকে বিকিরণ। এত বেশী লোহিত বিচ্যুতি হয়েছে যে এখন আর আলোককণে প্রতিভাত হয় না। প্রকাশ পায় মাইক্রো তরঙ্গরূপে (কয়েক সেন্টিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রেডার তরঙ্গ)।

Naked singularity : নগ্ন অনন্যতা– কৃষ্ণগহ্বর দিয়ে পরিবেষ্টিত নয় স্থান-কালের এই রকম অনন্যতা।

Neutrino : নিউট্রিনো– চরম লঘু (সম্ভবত ভরহীন) মৌলপদার্থ কণা। শুধুমাত্র দুর্বল বল এবং মহাকর্ষই এগুলিকে প্রভাবিত করে।

Neutron : বৈদ্যুতিক আধানশূন্য কণিকা– প্রোটনের সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুবই বেশী। অধিকাংশ পরমাণুর কেন্দ্রকের কণিকাগুলির প্রায় অর্ধেকই নিউট্রন (Neutron)।

Neutron star : নিউট্রন তারকা– বিভিন্ন নিউট্রনের মধ্যবর্তী অপবর্জন তত্ত্বভিত্তিক বিকর্ষণ (exclusion principle repulsion) দ্বারা রক্ষিত একটি শীতল তারকা।

No boundary condition : সীমানাহীনতার অবস্থা– মহাবিশ্ব সীমিত (কাল্পনিক কালে) কিন্তু সীমানাহীন এই চিন্তাধারা।

Neuclear fusion : কেন্দ্রকীয় সংযোজন– যে পদ্ধতিতে দুটি কেন্দ্রকের সংঘর্ষ হয় এবং তারা সংযোজিত হয়ে একটি অধিক গুরুভার কেন্দ্রক সৃষ্টি করে– সেই পদ্ধতির নাম।

Neucleus : কেন্দ্রক– পরমাণুর কেন্দ্রীয় অংশ। এতে থাকে শুধু প্রোটন এবং নিউট্রন। এগুলি সবল বলের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে।

Particle accelerator : কণিকাত্বরক যন্ত্র– এমন একটি যন্ত্র যা বিদ্যুৎ চুম্বকের সাহায্যে বিদ্যুৎ আধান যুক্ত চলমান কণিকাগুলিকে অধিকতর শক্তি দান করে ত্বরিত করতে পারে।

Phase : দশা– তরঙ্গের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কালে তার নিজস্ব জীবন চক্রের (cycle) অবস্থান : তরঙ্গটি তার শীর্ষে (crest), না পাদে (trough- পাদ—তরঙ্গপাদ), না তার মাঝামাঝি কোনো একটি বিন্দুতে।

Photon : আলোককণা– আলোকের একটি কণিকা বা কোয়ান্টাম।

Planck's quantum principle : প্লাঙ্কের কণিকানীতি– যে চিন্তাধারা অনুসারে আলোক [কিম্বা যে কোনো চিরায়ত তরঙ্গ (classical wave] শুধুমাত্র বিবিক্ত কণিকারূপে (in discrete quanta) নির্গত হতে পারে কিম্বা বিশোষিত হতে পারে। সে কণিকার শক্তি তার কম্পন সংখ্যার (frequency) আনুপাতিক (proportional)।

Positron : পজিট্রন– ইলেকট্রনের বিপরীত কণিকা (পরা আধান যুক্ত)।

Primordial black hole : আদিম কৃষ্ণগহ্বর– মহাবিশ্বের অতি আদিম অবস্থায় সৃষ্ট গহ্বর।

Proportional : আনুপাতিক– "x-yএর আনুপাতিক"– এ কথার অর্থ y কে কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে x কেও সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হবে। "x, y-এর বিপরীত আনুপাতিক (inversely proportional)" কথার অর্থ y কে কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে x কে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে।

Proton : প্রোটন– পরা (positive) আধানসম্পন্ন কণিকা। অধিংকাশ পরমাণুর কেন্দ্রকের প্রায় অর্ধেক প্রোটন দিয়ে গঠিত।

Quantum mechanics : কণাবাদী বলবিদ্যা– প্লাঙ্কের কণাবাদী নীতি এবং হাইজেনবার্গের (Heisenberg) অনিশ্চয়তার নীতি দিয়ে গঠিত তত্ত্ব (চতুর্থ অধ্যায়)।

Quark : কার্ক– একটি (আধানযুক্ত) মৌলকণিকা। এই কণিকা সবল বল বোধ (feels) করে। প্রোটন এবং নিউট্রন তিনটি করে কার্ক দিয়ে গঠিত।

Radar : রাডার— এই তন্ত্র রেডিও তরঙ্গ স্পন্দন (pulsed radio waves) ব্যবহার করে বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করে। পদ্ধতি : একক একটি স্পন্দন বস্তুটিতে পৌঁছে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে যে সময় লাগে সেই সময় মাপা।

Radioactivity : তেজস্ক্রিয়তা— এক প্রকারের পারমাণবিক কেন্দ্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে অন্য প্রকারের পারমাণবিক কেন্দ্র তৈরী হওয়া।

Red shift : লোহিত বিচ্যুতি— যে তারকা আমাদের কাছ থেকে দূরে অপসরণ করছে সেই তারকা থেকে নির্গত আলোকের লোহিত বর্ণ হওয়া। এর কারণ ডপ্লার অভিক্রিয়া (Doppler effect)।

Singularity : অনন্যতা— স্থান-কালের এমন একটি বিন্দু যেখানে স্থান-কালের বক্রতা অসীম হয়।

Singularity theorem : অনন্যতা উপপাদ্য— এই উপপাদ্যে দেখানো হয়েছে কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতিতে অনন্যতা অবশ্যই থাকবে। বিশেষ করে মহাবিশ্ব অবশ্যই শুরু হয়েছিল অনন্যতা দিয়ে।

Space-time : স্থান-কাল— যে চারমাত্রিক স্থানের বিন্দুগুলি ঘটনা।

Spatial dimension : স্থানিক মাত্রা— স্থান-কালের স্থানের মতো তিনটি মাত্রার যে কোনো একটি মাত্রা অর্থাৎ কালিক মাত্রা ছাড়া যে কোনো একটি মাত্রা।

Special relativity : বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ— বৈজ্ঞানিক বিধিগুলি অবাধে চলমান সমস্ত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষই অভিন্ন হবে— তাদের গতি যাই হোক না কেন, এই চিন্তাধারার ভিত্তিতে গঠিত আইনস্টাইনের তত্ত্ব।

Spectrum : বর্ণালী— একটি বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গকে তার উপাদানের বিভিন্ন স্পন্দাঙ্কে ভাগ করা।

Spin : চক্রণ— মৌল কণাগুলির একটি অন্তর্নিহিত ধর্ম। এর সঙ্গে চক্রণ শব্দের দৈনন্দিন অর্থবোধের একটি সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু দুটি অর্থ অভিন্ন নয়।

Stationary State : যে অবস্থা কালের সঙ্গে পরিবর্তনশীল নয়— স্থির হারে চক্রণশীল একটি গোলক স্থিতিশীল। তার কারণ, যে কোনো মুহূর্তেই এর রূপ অভিন্ন হবে, যদিও এটা স্থির নয়।

Strong force : সবল বল— চারটি মূলগত বলের ভিতরে সব চাইতে শক্তিশালী, কিন্তু এর বিস্তারের (পাল্লা) অঞ্চল হ্রস্বতর। এই বল কার্কগুলিকে প্রোটন এবং নিউট্রনের ভিতরে ধরে রাখে এবং প্রোটন ও নিউট্রনকে একত্রিত করে পরমাণু গঠন করে।

Uncertainty principle : অনিশ্চয়তার নীতি— একটি কণিকার অবস্থান এবং গতিবেগ সম্পর্কে নির্ভুলভাবে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। একটি সম্পর্কে জ্ঞান যত নির্ভুল হবে অন্যটি সম্পর্কে জ্ঞান তত কম নির্ভুল হবে।

Virtual particle : কল্পিত কণিকা—কণাবাদী বলবিদ্যায় যে কণিকাকে কখনোই প্রত্যক্ষভাবে সনাক্ত করা যায় না, কিন্তু যার অস্তিত্বের মাপনযোগ্য ক্রিয়া রয়েছে।

Wavelength : একটি তরঙ্গের ক্ষেত্রে সন্নিহিত দুটি তরঙ্গের শীর্ষ কিম্বা পাদের দূরত্ব।

Wave/particle duality : তরঙ্গ/কণিকা দ্বৈততা— কণাবাদী বলবিদ্যায় তরঙ্গ এবং কণিকার ভিতরে কোনো পার্থক্য নেই—এই চিন্তন। কণিকা অনেক সময় তরঙ্গের মতো আচরণ করে, আবার তরঙ্গ অনেক সময় কণিকার মতো আচরণ করে।

Weak force : দুর্বল বল—চারটি মূলগত বলের ভিতরে দুর্বলতার দিক থেকে দ্বিতীয়। এর বিস্তারের (পাল্লা) অঞ্চল খুবই কম। সমস্ত পদার্থকণাকেই এই বল প্রভাবিত করে কিন্তু বল বহনকারী কণিকাগুলিকে প্রভাবিত করে না।

Weight : ওজন—একটি বস্তুপিণ্ডের উপরে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র দ্বারা প্রযুক্ত বল। ওজন ভরের আনুপাতিক কিন্তু ভর আর ওজন অভিন্ন নয়।

White dwarf : শ্বেত বামন—একটি সুস্থিত শ্বেত তারকা। ইলেক্ট্রনগুলির অন্তর্বর্তী অপবর্জন তত্ত্বের বিকর্ষণের দ্বারা পোষিত।